ভাষার অভিমুখ

সুভাষ ভট্টাচার্য

ভাষার অভিমুখ

সুভাষ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০০৯

Bhashar Abhimukh *A Collection Of Essays On Language by Subhas Bhattyacharya & Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, January 2010, Rs. 150.00*

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ২০১০

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
এ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন
১০৫/৩ নৈনান পাড়া লেন,
কলকাতা : ৭০০০৩৬

মুদ্রক ঃ
পি. এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কো. প্রা. লি
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

ISBN : 978-8-8982-24-3

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

অধ্যাপক দিলীপ সাহা
স্নেহভাজনেষু

প্রাক্‌কথন

ভাষার আলোচনা এবং বাংলা ভাষার আলোচনা এখন চালিত হচ্ছে নানা দিকে। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় এবং উৎসাহী গবেষকদের পরিক্রমণে ভাষার তথা বাংলা ভাষার নানা দিক ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে, আলোকিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় চলে আসছে আলোচনার বৃত্তে। আলোচনার রীতিও হচ্ছে বিচিত্র রকমের। ভাষার তত্ত্বগত দিক যেমন আলোকিত হচ্ছে, তেমনি আলোচনায় আসছে নানা ব্যাবহারিক প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ।

এই বইটিতে যে নিবন্ধগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যেও পাওয়া যাবে কিছু নতুন ভাবনাচিন্তার ইঙ্গিত। নতুন বিষয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যে বিনা বিচারে গৃহীত হয়ে যাবে তেমন মনে করার কারণ নেই। এই বইয়ের করপাস-সংক্রান্ত আলোচনা এবং 'পরমা ভাষা' সংক্রান্ত আলোচনা এখনও নিশ্চয় কোনো নির্দিষ্টতা পায়নি। তবু আলোচনা তো চলতেই থাকবে।

এই বইয়ের নিবন্ধগুলো ইতিপূর্বে যেসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো হল আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, বইয়ের দেশ, অহর্নিশ, প্রতিক্ষণ, জলার্ক, কোরক, কাটোয়ার কলম, ধারাবাহিক।

এই বইটির প্রকাশে লেখকের চেয়ে প্রকাশক দেবাশিষ ভট্টাচার্যের আগ্রহই ছিল বেশি। তাঁকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানানোই যথেষ্ট হবে না। তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ডিসেম্বর ২০০৯

বল্মীক আবাসন কলকাতা-৭০০০৫৯

সূচিপত্র

বাংলায় ইংরেজি ভাষার প্রভাব

এক : কথাসূত্র

১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর The Literature of Bengal গ্রন্থে উনিশ শতকের সূচনাকালে বাংলা সাহিত্যের নবোন্মেষের কথা বলতে গিয়ে ভারতে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শের কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন— The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature and profited by it. The Hindu mind was to some extent trained under the influence of European thoughts and ideas, and benefited by it.[১] এই কথাগুলোকে কেউ-কেউ সেকালের বাঙালির তথা ভারতীয়ের অহেতুক ব্রিটিশ আনুগত্যের নমুনা হিসাবে দেখবেন হয়তো। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়টাতে যে দিক্‌পরিবর্তন ঘটেছিল তা যে বহুলাংশে ইয়োরোপীয়দের জন্য ঘটতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এই সময়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা যত বলেন, বাংলা ভাষার অবয়বেও যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তার উল্লেখ তেমন করেন না। [২]

দুই : বাংলা ভাষায় ইংরেজির প্রভাব—কখন থেকে, কোন সূত্রে

সমাজভাষাবিজ্ঞানে acculturation বা সংস্কৃতিসঞ্চার বলে একটা কথা আছে যার মূল অর্থ হল দুটি সংস্কৃতির পারস্পরিক অভিঘাতে দুর্বলতর সংস্কৃতিতে প্রবলতর সংস্কৃতির প্রভাব বসে যাওয়া। বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রভাবের আলোচনায় এই উপাত্তটির একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। কিছুটা হলেও সংস্কৃতির সঞ্চারের এই তত্ত্বটিকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসংগত হবে না। বাণিজ্য প্রসারের জন্য ষোড়শ শতকে যদিও পোর্তুগিজরা বাংলায় আসতে শুরু করে, কিন্তু বাংলা ভাষা শিখে নিয়ে কিছু ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা এবং ধীরে ধীরে অভিধান প্রভৃতি রচনা করে বাংলা ভাষায় পোর্তুগিজ প্রভাবের ছাপ মুদ্রিত করে দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছে আরও অন্তত এক শতক পরে। আর তার পরে পরেই ঘটেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজদের আবির্ভাব। সংস্কৃতিসঞ্চারের কথাটা ওঠে এই কারণে যে, বাংলা ভাষায় পোর্তুগিজ বা ইংরেজি ভাষার প্রভাবের তুলনায় তখনকার পোর্তুগিজ বা ইংরেজি ভাষায় বাংলার অভিঘাতের চিহ্ন নিতান্তই নগণ্য।

আপাতত পোর্তুগিজদের সরিয়ে রেখে সেই সময়ের ইংরেজ মিশনারিদের কথাই বলব,

কেননা উপস্থিত আমাদের আলোচনায় সেটাই প্রাসঙ্গিক। বাংলা গদ্যের সেই সূচনার যুগের সমস্ত রচনা দুটি পর্বে ভাগ করে দেখা যায়—প্রাক্-ফোর্ট উইলিয়াম পর্ব ও উত্তর-ফোর্ট উইলিয়াম পর্ব। আর ওই প্রথম পর্বের বিদেশি লেখক ও অনুবাদকদের মধ্যে পোর্তুগিজরা ছাড়াও ছিলেন কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মচারী ও মিশনারি যাঁদের মধ্যে ডানকান, ফরস্টার ও এডমনস্টোন প্রধান। আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সমসময়ে শ্রীরামপুর মিশনের বাংলাচর্চার কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই পর্বের লেখক ও অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ক্ষমতাকেন্দ্র ছিল তৎকালীন বংলা, কোম্পানির বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। বাণিজ্য ও রাজনীতির কারণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ এলাকা তখন বাংলা। ইংরেজ ও বাঙালির সংস্পর্শের সেই শুরু। সেই সংস্পর্শের প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে বাঙালির সাহিত্যে ও ভাষায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপীয়দের বাংলাচর্চার কথা বলার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, তাদের সঙ্গে বাংলা ভাষার সেই সংযোগ-সংস্পর্শে বাংলা ভাষার অবয়বে ও চরিত্রে কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল। কেমন সে-প্রভাব তা আমরা ক্রমশ লক্ষ করব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও বুঝে নেওয়া দরকার যে, বাংলা গদ্যে বিদেশি প্রভাবের আলোচনা করলেই বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাবের সম্পূর্ণ আলোচনা হয় না। দেখতে হবে সামগ্রিক ভাষায় সেই প্রভাব কতটুকু। দ্বিতীয়ত, একথা কখনোই ভেবে নেওয়া উচিত হবে না যে, বিদেশি তথা ইংরেজি প্রভাব এসেছিল কেবল ইয়োরোপীয়দেরই বাংলাচর্চার সুবাদে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, বাঙালির ইংরেজি চর্চা এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার চর্চার ফলেও বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্যের ভাষার তথা ইংরেজি ভাষার প্রভাব পড়েছে। সেই প্রভাবের প্রকৃতিটি বুঝে নেওয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। জেনে নিতে হবে সেই প্রভাব কতদূর গভীর, বা আদৌ গভীর কি না, জেনে নিতে হবে সেই প্রভাব নিছকই শব্দ-উপাদানের (lexical items) মধ্যেই সীমিত, না কি বাংলা ভাষার অন্বয় বাক্যরীতি এবং অন্যান্য বিষয়েও পরিলক্ষিত হয়।

তিন : বাংলা ভাষায় আগন্তুক ইংরেজি শব্দ—গ্রহণ-বর্জনের প্রকৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ওডিবিএল-এ মন্তব্য করেছেন যে ইংরেজি শব্দ বাংলায় কত পরিমাণে এসেছে তার হিসেব 'এখনও' কথা হয়নি।[৩] সে হিসেব আজও যে কষা হয়েছে এমন নয়। ভারতে যত বিদেশি এসেছে তার মধ্যে তুর্ক-আফগান ও মোগলদের মারফত ফারসি ভাষাই বাংলায় এসেছে বেশি এইরকম একটা ধারণা দীর্ঘকাল পোষণ করেছেন সকলে। এই ধারণা যে অহেতুক তা নয়। সুনীতিকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অনুসরণে বলেছেন—এটা সেই ১৯২৬ সালের কথা—যে বাংলায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ এসেছে। সন্দেহ নেই, সেই সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসির গুরুত্বই ছিল বেশি। কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসনকালের হিসেবে তুর্ক-আফগান-মোগল যেখানে পাঁচ শতাব্দকাল ধরে শাসনের সুযোগ পেয়েছে, সেখানে ইংরেজরা শাসন করেছে কেবল দুশো বছর। কিন্তু কেন তা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, ইংরেজি ভাষার প্রভাব আরও

বেশি, আরও গভীর? বলতে হচ্ছে, কেননা আমরা দেখেছি যে, দীর্ঘ মুসলমান শাসনে বাঙালির জীবনে ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তার চাইতে বেশি ও গভীরতর পরিবর্তন এসেছে মাত্র দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে। শুধু তাই নয়, ইংরেজ শাসন প্রত্যাহৃত হওয়ার পাঁচ দশক পরেও বাংলা ভাষায় ইংরেজির প্রভাব অব্যাহত ও অপ্রতিহত। এর কারণ যে রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষার ইতিহাসকার ও ভাষাতাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছেন যে, যত আরবি-ফারসি বাংলায় এসেছে তার বেশির ভাগই জমি ও সম্পত্তি বিষয়ক এবং আইন-আদালত বিষয়ক। অন্য দিকে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ এসেছে বহু রকমের। আর এও লক্ষ করি, বাংলায় ইংরেজি শব্দ ক্রমাগত এসেই চলেছে।

বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কতগুলি ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার সংখ্যা নির্ণয় মোটেই সহজ নয়। আগেকার অভিধানে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব মিলবে না। আমরা সংসদ বাংলা অভিধান (পঞ্চম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আকাদেমি বানান অভিধান (চতুর্থ সংস্করণ) এবং সংসদ বানান অভিধানে (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের যে হিসেব পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে, নানা ধরনের ব্যবহার ধরলে বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আবার একথাও স্মরণীয় যে, বহু নতুন নতুন ইংরেজি শব্দ প্রতিদিন বাঙালির রচনায় ঢুকে পড়ছে। ফলে বাংলায় ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য ইংরেজি শব্দ সংখ্যায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

চার : বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের প্রকৃতি

বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের আলোচনায় কোন কোন উৎস থেকে শব্দ এসে থাকতে পারে তা বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সাধারণভাবে আমরা এই প্রসঙ্গে তিনটি উৎসের কথা বলতে পারি। ইংরেজি শব্দ বাংলায় আসে মূলত সংবাদপত্র থেকে, বিদেশি সাহিত্য থেকে এবং সামাজিক-রাজনীতিক মেলামেশা থেকে। ঔপনিবেশিক শাসনে ইংরেজি ছিল শাসকের ভাষা। পৃথিবীর সমস্ত দেশে দীর্ঘকাল শাসনকারী বিদেশি শাসকের ভাষা যেভাবে দেশীয় ভাষাকে প্রভাবিত করে, ঠিক সেভাবেই ইংরেজি প্রভাবিত করেছে বাংলাকে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমে ইংরেজি শেখা বাঙালির কাছে একটা মর্যাদার সূচকও হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারতে ইংরেজির প্রাধান্য ও গুরুত্ব হ্রাস পাবার বদলে বরং বেড়েই যায়। সংবিধান প্রণেতাদের আশা ছিল সরকারি ভাষা হিন্দি ক্রমে ইংরেজির জায়গাটা নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কার্যত ঘটল তার বিপরীত। অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে হিন্দির গুরুত্ব কমতে লাগল, আর বাড়তে লাগল ইংরেজির গুরুত্ব। ইংরেজি ভাষাই বলতে গেলে এখন ভারতের একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষা। এটা কেউই হয়তো চাননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়াল সেটাই।

বাংলা ভাষায় ইংরেজি প্রভাবের আলোচনায় এই পটভূমিকাটাকে অস্বীকার করা বা ভুলে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, তিন হাজারের বেশি ইংরেজি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই-সব শব্দের একটা বড়ো অংশের বঙ্গীকরণ ঘটেছে। সেই শব্দগুলোকে সাঙ্গীকৃত (naturalized)

বিদেশি শব্দ বলা হয়। এইরকম অজস্র শব্দের মধ্যে আছে—আপেল, টেবিল, ইস্কুল, নম্বর, মারবেল, ডাক্তার, লণ্ঠন, গেলাস, বেঞ্চি, আপিস, ইঞ্চি, হাসপাতাল ইত্যাদি। আমরা নিশ্চয় লক্ষ করব যে, এইসব শব্দ তার মূল উচ্চারণ থেকে খানিকটা সরে এসেছে এবং বাংলা ভাষার প্রবণতা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকরা অনেকসময় এগুলিকে বিদেশি তদ্ভব শব্দ বলেন। শব্দগুলোতে কিছুটা বিকার ঘটেছে বলেই এগুলোকে তদ্ভব বলা হয়। আর এও মনে রাখব আমরা যে, এই সাঙ্গীকরণের ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ইংরেজি শব্দকে উচ্চারণবিকৃতির মাধ্যমে বাংলা করে নেওয়ার প্রবণতা এখন আর তেমন দেখা যায় না।

বরং একালে ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রায় গোটাগুটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই 'প্রায়' কথাটা লক্ষণীয়। অন্য ভাষার, বিশেষত, কোনো ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ হুবহু বাংলায় ব্যবহৃত হলেও একটা পার্থক্য ঘটে যায়। বাংলায় ব্যবহার্য ইংরেজি শব্দে আমরা কখনোই ইংরেজি মতে প্রস্বর বা accent দিই না। কিন্তু সেটাই একমাত্র পরিবর্তন নয়। ইংরেজি শব্দটি ইংরেজির উচ্চারণরীতি মেনে বাংলায় নিখুঁতভাবে প্রতিবর্ণীকৃত করা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি ইংরেজি শব্দ নেব যেগুলো বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি হল—adverb, essay, globe এবং coat। এগুলির ইংরেজি উচ্চারণ দেখাতে হলে কেমন দাঁড়াবে তা দেখানোর পাশাপাশি দেখাই আমরা কীভাবে লিখি বাংলায়।

adverb	(অ্যাড্‌ভ্য-ব্)	অ্যাডভার্ব
essay	(এসেই্)	এসে
globe	(গ্লঅও্ব্)	গ্লোব
coat	(খঅও্ট্)	কোট

মাত্র চারটি শব্দ দিয়ে ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব নয়। তবে ইংরেজি উচ্চারণ আর বাংলা প্রয়োগের তফাতটা অনুমান করে হয়তো নেওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায় দুশো বছর ধরেই পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। সে অবশ্য একটু অন্য ধরনের পার্থক্য। গোটাকতক শব্দের উদাহরণ দিই, যেমন result, effect, enjoy, market ইত্যাদি। বাংলায় সাধারণভাবে রিজ়াল্ট নয় রেজ়াল্ট, ইফেক্ট নয় এফেক্ট, ইন্‌জয় নয় এন্‌জয়, মা-কিট্ নয় মার্কেট। এ হল একটা দিক। আবার একথাও বলতে হবে যে,এমন বহু শব্দও আছে যেগুলোর বাংলা রূপ অনেকাংশেই ইংরেজির অনুরূপ। যেমন ফ্ল্যাট, স্লিপ,ব্যাপটিস্ট, প্রাইমারি, ডিসিপ্লিন,ড্যাম, ক্লাউন, গ্র্যাভিটি ইত্যাদি। এ বিষয়ে আপাতত এই পর্যন্ত। বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব আমরা।

নানান ধরনের ইংরেজি শব্দের আলোচনায় পরিভাষার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। উনিশ শতক থেকেই যে নানা বিদ্যার পারিভাষিক শব্দ বাংলায় রচিত হচ্ছে তা জানি আমরা। কিন্তু সেইসব অনূদিত পরিভাষার পাশাপাশি যে অজস্র ইংরেজি শব্দ পরিভাষা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙালির কথোপকথনে এবং নন-টেকনিকাল রচনায় শত শত ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। থার্মোমিটার, থার্মস ফ্লাস্ক, রেডিয়ো, টেলিভিশন, নার্ভ, আর্ট, আর্টিস্ট, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, লেন্স, মিটার, লিটার, কিলো, সোডা, ভিটামিন, কিডনি, লিভার,গ্যাংগ্রিন, পাইয়োরিয়া, ডিবেঞ্চার, ব্যাংক, শর্ট ওয়েভ, শর্ট সার্কিট, গ্লবিয়ুল ইত্যাদি শব্দ

বাংলায় বহুলব্যবহৃত, কি মৌখিক আলাপে, কি লেখায়। বলতে বাধা নেই,বহু ক্ষেত্রেই বাংলা পরিভাষার চাইতে মূল শব্দটিই বেশি জনপ্রিয়।

অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দগুচ্ছের সমান অর্থবোধক বাংলা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ না থাকায় অনুবাদ করে নিয়ে ব্যবহার করার প্রবণতাও নতুন নয়। অনেককাল ধরেই চলেছে তা। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ যান্ত্রিকতাদুষ্ট হলেও প্রচলিত হয়ে যায়। কোন অনুবাদ চলবে কোন অনুবাদ চলবে না, তা অবশ্য বলা যায় না। প্রশান্ত মহাসাগর চলেছে, অতলান্তিক চলেনি। মধুচন্দ্র বা মধুচন্দ্রিমা, গ্রন্থকীট (bookworm),গোলটেবিল বৈঠক, চায়ের কাপে তুফান, বায়ুরোধী (airtight), দাস মনোভাব (slave mentality), নগ্ন সত্য (naked truth), সুবর্ণ মধ্যম (golden mean), সিংহভাগ (lion's share), উড়ালপুল (flyover),আলোকস্তম্ভ (light house), শীর্ষ সম্মেলন (summit conference), ঝরনাকলম, কাঁদানে গ্যাস, উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) প্রভৃতি অনূদিত শব্দাবলি মোটের উপর চালু হয়েছে, সবগুলো যথাযথ বা সুপ্রযুক্ত না হলেও। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, অনুবাদের প্রবণতা এখনও অব্যাহত। যানজট, উড়ালপুল এসব তো হালের অনুবাদ। ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনায় অনেককাল ধরেই অনুবাদ হয়ে আসছে। স্থাননামের অনুবাদ,ভৌগোলিক নামের অনুবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক শব্দের অনুবাদ প্রভৃতি তার মধ্যে আছে। উদাহরণ হিসেবে কতকগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে—ভারত মহাসাগর, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বঙ্গোপসাগর, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, উচ্চ ন্যায়ালয় ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দকে বাংলার সঙ্গে মিশিয়েও যে ব্যবহার করা হয় না তা নয়। হাতের কাছেই তো আছে উদাহরণ। এগুলোকে portmanteau বা সংকর শব্দ বলতে পারি। হেডবাবু, হেডকেরানি, টাইমকল, কোর্টকাছারি, স্কুলবাড়ি,হেডপণ্ডিত ইত্যাদি। আর ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগ তো রীতিমতো স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে—মাস্টার (master) +ই, ডেপুটিগিরি, জজিয়তি, ডাক্তারি এসবের মধ্যে যে ইংরেজি শব্দাংশ ঢুকে বসে আছে তা যেন আমাদের নজরেই পড়তে চায় না।

আবার বহু ইংরেজি শব্দের বঙ্গীকরণ বা বঙ্গানুবাদ করা যায় না বলে কিংবা ইংরেজি শব্দটিই সবিশেষ পরিচিত হওয়ায় সেই ইংরেজি শব্দটি বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গেই ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে— রান করা, গোল করা, ফাউল করা, চ্যালেঞ্জ করা, লাইন দেওয়া , পাশ করা, রিপোর্ট করা, ফোন করা, বুক করা ইত্যাদি। [৪]

পাঁচ : বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের ধ্বনিতত্ত্ব

ইংরেজি শব্দ যে নানাভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয় সেকথা আগেই বলেছি। আর সেই নানান প্রকারের একটি হল naturalization বা বঙ্গীকরণ যাকে সুনীতিকুমার Bengalisation বলেছেন।[৫] বঙ্গীকৃত ইংরেজি শব্দের বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বাঙালির ভাষায় সর্বত্র। তার মধ্যে লর্ড থেকে লাট, কাউন্সেল থেকে কৌশুলি, হসপিটাল থেকে হাসপাতাল, ডক্টর থেকে ডাক্তার, ব্রাশ থেকে বুরুশ, বেঞ্চ থেকে বেঞ্চি খুবই পরিচিত দৃষ্টান্ত। এছাড়াও আছে টেবিল, শিম্পাঞ্জি, গেলাস, ইসকুল, ইস্টিমার, ইঞ্জিন, নম্বর, বাক্স, কেটলি প্রভৃতি অজস্র

'বাংলা-হয়ে-যাওয়া' ইংরেজি শব্দ। এবং এই বঙ্গীকরণেই হোক আর সাধারণ প্রতিবর্ণীকরণেই হোক, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের কিছু নিয়ম ও প্রবণতা নজরে পড়ে।

ইংরেজি ভাষায় p, t ও k এই তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি বিশেষভাবে মহাপ্রাণিত, ড্যানিয়েল জোনজ়ের ভাষায় 'typically aspirated,'[৬] বিশেষত শব্দের আদিতে প্রস্বরযুক্ত সিলেবলে। তাই ইংরেজের মুখে pot শোনায় ফট্-এর মতো, take শোনায় ঠেইক্-এর মতো এবং cat শোনায় খ্যাট্-এর মতো। সুনীতিকুমার এই ধ্বনিকে দেখিয়েছেন এইভাবে— /t^h/,/p^h/ এবং /k^h/[৭]। তাঁকে অনুসরণ করে paint, task, ও cane এই তিনটি শব্দের ধ্বনিলিপি এভাবে দেখানো যায়।

paint	[p^heint]	ফেইন্ট্
task	[t^ha:sk]	ঠা-স্ক্
cane	[k^hein]	খেইন্

ইংরেজি ভাষার অভিধানগুলি অবশ্য এই সূক্ষ্ম ধ্বনিচিহ্নকে সম্ভবত সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে এড়িয়ে চলে। সে যাই হোক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, বাংলা ভাষায় যখন শব্দগুলো আসে তখন ওই মহাপ্রাণতাকে উপেক্ষা করেই আসে। অর্থাৎ বাংলায় শব্দগুলোকে পাই পেইন্ট, কেইন, কোট, ক্যাট এইভাবে।

দ্বিতীয়ত, বহু দ্বিস্বরধ্বনিযুক্ত (diphthongized) ইংরেজি শব্দের দ্বিস্বরতা বাঙালির উচ্চারণে লোপ পায়। Lake, sale, bake, প্রভৃতি শব্দের ইংরেজি উচ্চারণ যথাক্রমে লেইক্, সেইল্, বেইক্। কিন্তু বাঙালির উচ্চারণে এগুলো যথাক্রমে লেক্, সেল্, বেক্। তাই ওইভাবেই শব্দগুলো বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, road, load, boast, boat, coal, loan প্রভৃতি শব্দে যে দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong) আছে বাঙালি তাকে উপেক্ষা করে শব্দগুলিকে monosyllabic বা একাক্ষরী করে নেয়। ইংরেজি উচ্চারণ র^{অ}ওড্, ল^{অ}ওড্, ব^{অ}ওট্, হলেও বাঙালি বলে ও লেখে—রোড, লোড, বোট ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, বহু ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে বাঙালি বানানকে অনুসরণ করে। ফলে প্রচলিত হয়ে যায় বানানানুগ উচ্চারণ যাকে spelling pronunciation বলা হয়ে থাকে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে মর্টগেজ, কলেজ, রেজ়াল্ট, প্লাম্বার, বাইসাইকল প্রভৃতি শব্দের। বলা বাহুল্য, এগুলির ইংরেজি উচ্চারণ যথাক্রমে মগিজ্, রিজ়াল্ট , প্লামার্ ও বাইসিকল্।

চতুর্থত, ইংরেজি স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বা central vowel আছে যাকে schwa বলা হয়, যার ধ্বনিচিহ্ন /ə/। হাজার হাজার ইংরেজি শব্দে এই ধ্বনিটি পাওয়া যায়। chanter-এর দ্বিতীয় সিলেবলে, campus-এর দ্বিতীয় সিলেবলে, factory-র দ্বিতীয় সিলেবলে, harvester-এর তৃতীয় সিলেবলে এই 'শোয়া' আছে। বাংলায় এই উচ্চারণ যথাযথভাবে দেখানো কঠিন। তবু বলা যায়, কিছুটা অর্ধোচ্চারিত 'অ' ধ্বনির মতো এই শোয়া। factory শব্দটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে (IPA) এইরকম—

factory [fæk-tə-ri]

বাংলায় লেখা যায় এইভাবে—

ফ্যাক্ট^{অ}রি

কিন্তু এই শোয়াকে আমরা প্রায়ই অ বা আ উচ্চারণ করে থাকি। তাই আমরা বলি ফ্যাক্টরি, হারভেস্টার, ক্যাম্পাস ইত্যাদি।

পঞ্চমত, ইংরেজিতে শব্দশেষের r সাধারণত উচ্চারিত হয় না। 'সাধারণত' কথাটা বলার অর্থ এই যে, কোনো অঞ্চলে এই r সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত, কোনো অঞ্চলে অর্ধোচ্চারিত। মান্য উচ্চারণের অভিধানেও দেখি দু-রকম ব্যবস্থা। কনসাইজ|অক্সফোর্ড বন্ধনীর মধ্যে r রাখে, (r) এইভাবে, ড্যানিয়ল জোনজ় একটি তারকা চিহ্ন দিতেন, * এইভাবে। অন্য দিকে ম্যাকমিলানের Encarta World English Dictionary এই r -কে অনুচ্চারিত রাখে। আমরা বাঙালিরা এসব শব্দ নেবার সময় ব্যতিক্রমহীন ভাবে r উচ্চারণ করি এবং সেইভাবেই প্রতিবর্ণীকরণ করি— মাস্টার, কেয়ার, ব্যানার,মোটরকার, হেয়ার, শেয়ার ইত্যাদি।

ষষ্ঠত, ইংরেজিতে শব্দের মধ্যে বদ্ধ সিলেবলে ব্যঞ্জনের আগে r কখনো উচ্চারিত হয় না। অন্তত ব্রিটিশ ইংরেজিতে হয় না। তাই ইংরেজের উচ্চারণে arm হল আ-ম্ artist হল আ-টিস্ট্, conserve হল কন্স্যাভ্। আমরা বাংলায় এই r উচ্চারণ করেই প্রতিবর্ণীকরণ করে থাকি। বাঙালি এটা করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে, এইজন্য আমরা লিখি আর্ট, আর্টিস্ট, গার্ড, গার্ডেন, অর্ডার, বার্নার প্রভৃতি।

সবশেষে আসে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইংরেজি শব্দের পরিবর্তিত রূপের প্রসঙ্গ। এইসব বৈশিষ্ট্য আমরা প্রধানত লক্ষ করি বঙ্গীকরণের সময়। এ থেকে ইংরেজি শব্দের বঙ্গীকরণের নানান প্রক্রিয়াও বোঝা যাবে। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে catathesis বা অন্ত্যস্বরাগম, যার দৃষ্টান্ত পাই বেঞ্চি, কেটলি,লিস্টি প্রভৃতি শব্দে। আছে vowel insertion বা anaptyxis অর্থাৎ মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ যার উদাহরণ আছে টেবিল, ডবল, ফুলুট (ফ্লুট), বকলস প্রভৃতি শব্দে। এ ছাড়া আছে vowel prothesis বা আদিস্বরাগম, যার উদাহরণের মধ্যে আছে ইস্কুল বা ইশকুল, ইস্টিশন, ইস্ক্রুপ, ইস্টুপিড ইত্যাদি।

ছয় : ইংরেজির মারফত অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ

বাংলা ভাষায় ইংরেজির প্রভাবের আর একটি ক্ষেত্রও চিহ্নিত করতে হবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত। সরকারি উদ্যোগ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সহায়ক হয়। একথা নিশ্চয় বলা যাবে না যে, আপামর জনসাধারণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও ঠিক যে, মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার চর্চা এবং ইংরেজির মাধ্যমে ও মারফতে বিবিধ বিদ্যার চর্চা এদেশে দ্রুত এগিয়ে চলে। সচরাচর ঔপনিবেশিক শাসনে যেমন হবার কথা এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজে একটা সম্মানের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। আর একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক কারণে বাংলা প্রদেশে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে মানুষকে অন্য অনেক এলাকার চাইতে বেশি আগ্রহী ও তৎপর দেখা গেছে।

এই ইংরেজি শিক্ষা দেড়শো পৌনে দুশো বছরে আমাদের ইংরেজির মারফতে পাশ্চাত্যবিদ্যা চর্চার পথ প্রশস্ত করেছে। একটু-একটু করে আমরা ইংরেজির সাহায্যে

জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। ক্রমে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য ভাষার তত্ত্ব ও তথ্য আমরা ইংরেজির মারফতে আয়ত্ত করতে থাকি। স্বভাবতই সমস্ত অনিংরেজি ইয়োরোপীয় নাম, ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমরা নিতে থাকি। এর ফলে বাঙালির বিদ্যাচর্চায়, সাংবাদিকতায় এবং সাধারণ কথোপকথনে ফরাসি শব্দ ও নাম, ইতালীয় শব্দ ও নাম, স্পেনীয় শব্দ ও নাম ইংরেজি রীতির অনুসরণেই ব্যবহৃত ও গৃহীত হয়ে এসেছে। ইতালীয় শহর ভেনিসের ইতালীয় নাম যা-ই হোক না কেন, আমরা ভেনিস-ই বলি, লিখি। আমরা আরও বলি, লিখি ফ্লরেন্স। আমরা ফিরেনৎসে বা ভেনেৎসিয়া বলি না। আমরা বলি নেপোলিয়ন, অগাস্টাস (Augustus) অ্যালসিবাইয়াডিজ়, আরজেন্টিনা। আমরা নাপলেয়ঁ কদাচিৎ বলি, আউগুস্তুস কদাচিৎ বলি। আলকিবিয়াদেস বা এউরিপিদেস বলতে বা লিখতে আমরা এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। (৮)

সম্প্রতিক কালে আমরা ফরাসি ইতালীয় জার্মান ইত্যাদি ভাষার শব্দ ও নাম ওইসব ভাষার রীতি অনুযায়ী উচ্চারণ করে সেই মতো প্রতিবর্ণীকৃত করতে শুরু করেছি, একথা ঠিক। এখন বহু বাঙালি লেখক আরিস্ততল, ব্রৎস্কি, লুভ্‌র্ (Louvre), গেয়র্ক, তেওফিল (Theophile), ফেরভান্ট্ (Verwandt) ইত্যাদি লেখেন। এই প্রবণতা স্বাভাবিক। কেননা বাঙালি এখন শুধুমাত্র ইংরেজের মুখে ঝাল খায় না। বাঙালি এখন বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ও অন্-ইয়োরোপীয় বিদেশি ভাষায় পারংগম হয়ে উঠেছে। বহু ভাষার উচ্চারণরীতি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত বাঙালির একটা মাঝারি রকমের ধারণা তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু এর একটা সীমাবদ্ধতাও আছে। সমস্ত বিদেশি শব্দ ও নামের তদ্দেশীয় উচ্চারণ আমাদের অধিগত থাকবে এটা হতে পারে না। ফলে ইংরেজির মারফত সেইসব শব্দ ও নাম নেওয়ার একটা ক্ষেত্র থেকেই যাচ্ছে। আর কেবল উচ্চশিক্ষিত কিছু বাঙালির দক্ষতা ও জ্ঞানের কথা মাথায় রাখলেই চলবে না। এই কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, এখনও বহু মধ্যম-শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি রীতিতেই অভ্যস্ত। সম্ভবত সেই কারণেই কবি অরুণ মিত্রের মতো ফরাসিবিদ মানুষও 'পারি' নয়, 'প্যারিস' লিখে গেছেন সারা জীবন। প্রাহা আমরা বলতেই পারি। কিন্তু তা যে প্রাগকে (Prague) স্থানচ্যুত করবে এমন আশু সম্ভাবনা নেই। ইংরেজি ভাষার এই প্রভাবটা এখনও ব্যাপক, এখনও গভীর।

সাত : বাঙালির মুখের ভাষায় ইংরেজি শব্দ

যদি বলি বাঙালির যাবতীয় লেখালিখিতেই ইংরেজি ভাষার প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে একটা আংশিক সত্য উক্তি। কেননা, বাঙালির মুখের ভাষাতেও ইংরেজির প্রবল উপস্থিতির কথা কারও অজানা নয়। যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের সাধারণ কথোপকথনে বহু ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়ে যখন-তখন। ইনফরমাল বা অনাচারিক আলাপে আমরা আর্ট, আর্টিস্ট, নভেল, ডিকশনারি, মিটিং, বোর্ড (পর্ষৎ), ব্লাড-টেস্ট, বর্ডার, ফোন প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করি। শুধু এইগুলিই নয়। আমরা কথাবার্তায় আরও বহু শব্দই ব্যবহার করে থাকি। একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাক—লোকাল, লাংস (lungs) ক্যাশ, চেঞ্জ, সিট (seat), টাইম, রোড, ইন্‌স্টলমেন্ট, অটোমেটিক, লাইফ, লাইফ-ইনশুরেন্স,

অটোগ্রাফ, বিল, বোট, বেলো (bellow), বেল (bell), অ্যালবাম, কেস, বুমেরাং, বুথ, বডিস, বুটিক, ব্রা, বোরিং, বক্সিং, বয়কট, ব্র্যাকেট, মুড, ব্র্যান্ডি, হুইস্কি, বিচ (beach), ব্রিজ, ব্রিগেড, প্যারেড, ব্রুচ, বাংক, প্যানিক, ক্যারাভান, মেডিক্যাল, ক্যান্টিন, কার্টুন, কমেডি, ট্র্যাজেডি, চ্যাপ্টার, ব্রাশ, টুথপেস্ট, ফিগার, ফার্স্ট এইড, ফর্ম, ক্যারেট(carat), প্রাইমারি, স্যাংশন, সিরিজ়, সিরিয়াল, মেগাস্টার, মেগাসিরিয়াল। এমন শত শত শব্দ আমরা বাংলা কথোপকথনে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। বহু রোগের নাম আর দেহের বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইংরেজি নাম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত আমরা। ফুসফুসের চেয়ে লাং বা লাংস আমাদের জিভে আগে আসে। হার্ট যত সহজে বলি, হৃৎপিণ্ড তত সহজে বলি না। কিছু রোগের নাম ইংরেজিতে না বলে উপায় থাকে না—পেপটিক আলসার, হার্ট অ্যাটাক, ইনফ্লুয়েন্জা, ডায়ারিয়া (কজন আর উদরাময় বলি), কলেরা, টাইফয়েড, অ্যাসিডিটি, টিবি, টিউবারকিউলোসিস, চিকেন পক্স, সেপটিক, টিউমার, আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি। সকলেই জানেন, গ্রামের সরল অশিক্ষিত মানুষও কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। যেমন টাইম, টাইম কল, লোকাল (লোকাল ট্রেন), সিট, পেন (বুকে পেন), রোড (বড়ো রাস্তা)। আমরা যখন এই কথা বলছি তখন বাংলা-হয়ে-যাওয়া ইংরেজি শব্দের কথা ধরছি না। স্কুল,কলেজ, পেনসিল, ক্যালেন্ডার, মেশিন প্রভৃতির মতো শব্দকে বাদ দিয়েই উপরের কথাগুলো বলেছি। এই প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, আমরা অনাচারিক আলাপে অর্থাৎ ঘরে-বাইরের স্বাভাবিক ও অন্তরঙ্গ কথোপকথনে প্রায়ই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। বক্তৃতায় বা আচারিক বা ফরমাল উপলক্ষ্যে যথাসম্ভব ইংরেজি শব্দকে এড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে দেখা যায়। আমরা যখন মুখের ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের কথা বলছি, তখন ফরমাল নয় ইনফরমাল বা অনাচারিক কথাবার্তার কথাই মাথায় রাখছি।

আট : বাংলা অন্বয় ও বাক্যরীতিতে ইংরেজির প্রভাব

ইংরেজি ভাষার প্রভাব যে কেবল শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ তা ভাবলে চলবে না। বাংলা ভাষার অন্বয় ও বাক্যরীতিতেও রয়েছে ইংরেজির প্রভাবের চিহ্ন। আর সে প্রভাবের সূত্রপাত হয়েছিল অনেক বছর আগেই। উনিশ শতকে ইংরেজিতে লেখা নথিপত্র, আইনসংকলন প্রভৃতির বাংলা অনুবাদে যেসব ইংরেজ কর্মচারী ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের অনুবাদকর্মে স্বভাবতই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময়ে বাংলা বাক্যের যে-কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা ও হ্রস্বতা। কিন্তু ডানকান, ফরস্টার ও কেরিদের অনুবাদ কর্মের পক্ষে তা মোটেই উপযোগী বা সহায়ক ছিল না। ফলে অনিবার্য হয়ে পড়ে কিছু পরিবর্তন। তার মধ্যে প্রথমেই যে-পরিবর্তনের কথা বলতে হয় তা হল ইংরেজির অনুকরণে একটি বাক্যের মধ্যে পর পর অনুবাক্য সাজিয়ে দেওয়া, যা প্রথম যুগের বাংলার পক্ষে ছিল অস্বভাবী। কখনো-বা দুটি-তিনটি বাক্য অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে জুড়ে তৈরি হত একটি দীর্ঘ বাক্য। কেরির দুটি বাক্য উদাহরণ হিসাবে দেখতে পারি—

(১) 'পরে রাণী নিশাশেষে রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখিল যে উপপতি মরিয়াছে।'

(ইতিহাসমালা, দ্বাত্রিংশত্তম কথা)

একুশটি শব্দ নিয়ে তৈরি এই বাক্যে রয়েছে চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া—দেখিয়া, করিয়া, লইয়া, গিয়া।

(২) 'তখন রাণী কহিল,"আমি তাহাকে মারিয়াছি, উপপতিকে সর্পাঘাত হইল,তাহা দেখিয়া বেশ্যাধর্ম করিলাম, তাহাতে পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম, সেখান হইতে পলাইয়া গোপগৃহিণী হইলাম—আজি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল, এ-জন্য শোক করিব?"

বস্তুতপক্ষে, এই বাক্যটিতে নটি-দশটি বাক্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় এই প্রক্রিয়া কিছুটা বাধা পায়। বিদ্যাসাগর লিখলেন—

'কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।'

(বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ)

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর গদ্যরচনায় ইংরেজি রীতি পরিহার করেছেন বা কখনো অনুসরণ করেননি। তাঁর অনুসৃত নানা ধরনের ইংরেজি-প্রভাবিত রীতির মধ্যে একটির উল্লেখ করব। সেটি হল neither-nor জাতীয় অনুবন্ধীর (correlatives) ব্যবহার।

'না এ পর্যন্ত তিনি আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল।'

(ভ্রান্তিবিলাস, ২য় অধ্যায়)

উনিশ শতকে বাংলা বাক্যরীতিতে ইংরেজির প্রভাব ক্রমে এতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাকে কষ্ট করে খুঁজতে হয় না। বিদ্যাসাগর,অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকের হাতে বাংলা গদ্য যে-পরিণতি লাভ করে, তাতে ইংরেজির প্রভাব রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল বলা যায়।[৯] কিন্তু এ তো গেল উনিশ শতকের কথা। বাংলা বাক্যরীতিতে ইংরেজির প্রভাব বা ইংরেজি রীতির অনুসরণ হয়েই চলেছে এবং আজও সেই প্রবণতা দেখা যায়। আমরা একে একে সেই প্রভাবের প্রকরণগুলোকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

প্রথমত, 'অথচ', 'কিন্তু', 'এবং',প্রভৃতি অব্যয় দিয়ে বাক্য বা অনুচ্ছেদের সূচনা করা বহুকাল পর্যন্ত বাংলায় ভাবা যেত না। ইংরেজিতে পাই—

'And what about the long-term menace'— John Maddox,Times Literary Supplement, Sept 26, 2003, page 26

'But Svoronos's slim volume, scarcely longer than an encyclopaedia article, is now half a century old,...' -Richard Clogg, Times Literary Supplement, 26 Sept. 2003, page 27

'Or, of course, we might argue that American life is much nicer and less dominated by indirection than Mr. Boorstin says'- Marcus Cunliffe, Encounter, July 1962

এবারে দেখব অনুরূপ বাংলা বাক্য, নীচের তিনটি বাক্যই তিনটি অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য।

' কিন্তু তুলনা এখানেই শেষ'।—বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা (১৯৭৬) পৃ ৬১

'অথচ সেই অপার সম্ভাবনার কতো ভগ্নাংশই বাস্তবায়িত হয় তার অক্ষম সাধনায় এবং অবন্ধ প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশে'—আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা (১৯৭৭) পৃ ২০৯

'অথবা যেমন 'কালের যাত্রা'য় আছে রথটানা রশিটির প্রসঙ্গে ব্যাকুল সব উৎপ্রেক্ষা'—শঙ্খ ঘোষ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক (১৯৬৯) পৃ ৫০

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক বাংলা বাক্যে অনুবাদের ব্যবহারেও দেখা যায় ইংরেজির প্রভাব। আগে দেখব দু-একটি ইংরেজি বাক্য—

'At the moment Whitechapel Properties— I hope you approve of the name— is still a one-hundred-pound off-the-shelf company'.- Jeffrey Archer, First Among Equals, Harper Collins, 1997, P. 290

'My dear boy, it is an omen— the worst omen—of death!' J.K.. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 1999, p.83

এবারে দেখব কয়েকটি বাংলা বাক্য—

'হয়তো সেইজন্যে — বা আসলে তাঁর নিজেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে ব'লে—এখানে তাঁর ভঙ্গিটা প্রতিযোগীর নয়'—বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা (১৯৭৪), পৃ. ৬২

'কিন্তু যেটুকু টিকবে, আমার ধারণা, তার মূল্যও নিতান্ত অল্প নয়'— শিবনারায়ণ রায়, নায়কের মৃত্যু (১৯৭০)পৃ. ১৬২

কখনো দুটি কমার মধ্যে, আবার কখনো দুট ড্যাশ চিহ্নের মধ্যে অনুবাক্য ব্যবহারের এই রীতিতে ইংরেজির প্রভাব স্পষ্ট। যাকে খাঁটি বাংলা বাক্য বলা যায়, তাতে এই প্রকরণ একসময় ছিল অকল্পনীয়।

তৃতীয়ত, একটি তথাকথিত 'অসম্পূর্ণ' বাক্যকে স্বাধীন ও 'পূর্ণ' বাক্য হিসাবে ব্যবহারের যে রীতি এখনকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত তাকেও বলতে পারি ইংরেজির প্রভাবচিহ্নিত। দুটি উদাহরণ নেব—

'এই ভিন্নতা, বস্তুত ঐ দ্বন্দ্বেরই সূচক। মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব।'—শঙ্খ ঘোষ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক (প্রথম সংস্করণ) পৃ.৪৭

'রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এই দায়টাই মানতে পারেন নি। ঐ কৈশোরে'।—দেবেশ রায়, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য (১৯৯৮) পৃ. ৪৬

এমনকী, কখনো-কখনো একটিমাত্র শব্দ নিয়েই তৈরি হয়ে যায় বাংলা বাক্য। এও সেই ইংরেজিই প্রভাব—

'আর যদি "মহাজন" শব্দের সর্বজন অর্থ ধরি, তাহ'লে আরো বেশি ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। সর্বজন? লোকসমবায়?'—বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা (১৯৭৪) পৃ. ৬৮

'আর ধ্বনি? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক'।—সত্যজিৎ রায়। বিষয় চলচ্চিত্র (প্রথম সংস্করণ) পৃ. ১৮

একথা বলব না যে, সব ক্ষেত্রেই এইসব প্রকরণের স্বীকরণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে বাংলায়। একথা মানতেই হবে, কোথাও-কোথাও এসব প্রকরণ কিছুটা যান্ত্রিকতা-দুষ্ট হয়ে পড়ে।

কেউ-কেউ এভাবে ইংরেজির আদলে বাংলা বাক্য সাজাবার অভ্যাসের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে এই ধরনের বাংলা বাক্যে 'ইংরিজি শব্দ নেই বটে, কিন্তু তার গন্ধ ভুরভুর করছে'।[১০] আমরা অবশ্য এই ধরনের যে-কোনো বাক্যকেই এভাবে নস্যাৎ করতে চাই না। আমরা মনে করি, বহু ক্ষেত্রেই এতে বাংলা ভাষার উপকারই হয়েছে। আমরা এ-ধরনের বাক্যকে বাংলার পক্ষে অব্যতিক্রমীভাবে অস্বাভাবিক মনে করি না। বরং এ-ধরনের প্রভাবে বাংলা গদ্যভাষায় নম্যতা আসে।

নয় : বাংলা বিরামচিহ্নে ইংরেজি প্রভাব

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক দিন পর্যন্ত বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। বাংলা কবিতায় ছিল এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির ব্যবহার। কবিতা থেকে গদ্যেও এল সেই এক দাঁড়ি আর দুই দাঁড়ি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে উইলিয়াম কেরি এবং অন্যান্য মিশনারিরা ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত কিছু বিরামচিহ্ন বাংলাতেও ব্যবহার করতে শুরু করেন। রামমোহন রায়ও বাংলায় বিরামচিহ্নের স্বল্পতা অনুভব করেছিলেন নিশ্চয়, যদিও তাঁর প্রথম দিককার রচনায় তিনিও এক দাঁড়ি আর দুই দাঁড়িই কেবল ব্যবহার করেছেন।[১১] পরে তাঁর 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' নামক রচনায় তাঁকে আমরা প্রশ্নচিহ্ন ও সেমিকোলন ব্যবহার করতে দেখেছি। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' তিনি ব্যবহার করেছেন কমা দাঁড়ি সেমিকোলন প্রশ্নচিহ্ন, যদিও এসব বিরামচিহ্নের প্রয়োগ তখনও নিরূপিত হয়নি। ফলে কোনো নিয়মের সন্ধান করা বৃথা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু রামমোহনই নন, তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন অন্য লেখকেরাও কেন যে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন তা প্রায়ই স্পষ্ট নয়। তবু যে কথাটা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য তা এই যে, বাংলা ভাষার লিখিত গদ্যে কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন বা উচ্ছ্বাসবাচক চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং ড্যাশ সরাসরি ইংরেজি ভাষার রীতি থেকে তুলে আনা হয়েছে।[১১] বিদ্যাসাগরও পরবর্তী কালে এইসব বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেছেন এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের ছন্দকে প্রকাশ করবার জন্য রীতিমতো অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন বিরামচিহ্নগুলিকে। বাংলায় অনেকগুলি বিরামচিহ্নই ইংরেজি ভাষার আদলে ব্যবহৃত হয়েছিল বটে, তবে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সচেতন ও সতর্ক প্রয়োগে সেসব বিরামচিহ্ন বাংলায় ক্রমশ প্রযুক্ত হয়েছে যথেষ্ট সৃষ্টিশীলভাবে এবং বিংশ শতকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের কীর্তিমান লেখকদের রচনায় বিরামচিহ্নের বিচিত্র প্রায়োগের যে প্রভূত দৃষ্টান্ত দেখি তাতে ইংরেজি ঋণের কথা আর মনে থাকে না, এতই স্বাভাবিক মনে হয় সেগুলিকে।[১২]

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

১. Dutt, Romesh Chunder—The Literature of Bengal, 1877, Revised edition, Calcutta & London, 1895, p 136

২. বাংলা ভাষায় ইয়োরোপীয় প্রভাবের কিছু আলোচনা অবশ্য শিশিরকুমার দাশ তাঁর Early Bengali Prose (1966) গ্রন্থে করেছেন, করেছেন গোলাম মুরশিদ তাঁর কালান্তরে বাংলা গদ্য (১৩৯৯) গ্রন্থে। কিন্তু উভয়েরই আলোচ্য বাংলা গদ্য, বাংলা ভাষা নয়। তাই তাঁদের আলোচনায় বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচিত হয়েছে পার্শ্বিকভাবে মাত্র। এমনকী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) মহাগ্রন্থেও বাংলা ভাষায় ইংরেজি পোর্তুগিজ ও ফরাসি শব্দ-উপাদানই মূলত আলোচিত হয়েছে।

৩. Chatterji, Suniti Kumar—ODBL, 1926, Rupa Edtion, 1985, p 215

৪. মনসুর, মুসা —'বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার', দ্র বাংলা দেশের রাষ্ট্রভাষা, ২০০২, পৃ.৯৮

৫. Chatterji, Suniti Kumar—ODBL, p.632

৬. Jones, Daniel—English Pronouncing Dictionary, 14th ed. Introduction 3.8, p xix

৭. Chatterji—ODBL, p. 634

৮. এই বিষয়টাকে স্পর্শ করে কয়েক বছর আগে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন বর্তমান লেখক। তাঁর সেই নিবন্ধটির নাম 'বিদেশি নামের উচ্চারণ ও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ, দ্র লেখকের গ্রন্থ 'বাংলাভাষা চর্চা।'

৯. উনিশ শতকের বাংলায় এই প্রভাবের চমৎকার আলোচনা আছে ভবতোষ দত্তের 'বাঙালির ভাষাচেতনা' নিবন্ধে। দ্র. ভবতোষ দত্ত—বাঙালির সাহিত্য, ১৯৭৭। এ বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা পাই অপূর্বকুমার রায়ের উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য:ইংরেজি প্রভাব গ্রন্থে।

১০. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—বাঙলা ভাষার ভূত-ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০০৩, পৃ.২৬

১১. শিশিরকুমার দাশ—'বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০

১২. সুভাষ ভট্টাচার্য—তিষ্ঠ ক্ষণকাল, ১৯৯৯, পৃ. ১৮-২০

তথ্যপ্রযুক্তি কি ভাষার ক্ষতি করছে?

যে-কোনো দেশের বা সমাজের নবীন প্রজন্ম সচরাচর সাহসী হয়ে থাকে, কখনো-কখনো একটু দুঃসাহসীও। আর প্রবীণেরা সচরাচর সে সম্পর্কে একটু সংশয়াকুল হয়েই থাকেন। ভাষার বিষয়ে এই কথাটা একইরকম সত্য। আমাদের কিশোর-কিশোরীরা এবং তরুণ-তরুণীরা যেসব নতুন শব্দ বা নতুন প্রয়োগ চট্ করে নিতে পারে, আমরা প্রবীণেরা ততটা পারি না। অনেক সময় তো কিছুটা বিরূপও হই। এমনকী, অল্পবয়সিরা যখন নির্দোষ কিন্তু নতুন 'ঘ্যাম', 'ব্যাপক' (চমৎকার অর্থে), 'হাইট' অবলীলায় বলত, তখন আমরা কেবলই শুনেছি, কখনো-বা চমৎকৃতও হয়েছি শব্দগুলোর যথাযথতা দেখে, কিন্তু নিজেরা প্রকাশ্যে ব্যবহার করার সাহস দেখাইনি। আর যখন 'ক্যালানো'র (মারধর করা) মতো শব্দ কানে এসেছে, তখন রীতিমতো নাক চোখ কুঁচকে গেছে আমাদের কারও কারও। কিন্তু এই অনিবার্যতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বস্তুতপক্ষে, এভাবেই ভাষার শব্দভাণ্ডার স্ফীত হয়। আর 'অনাচারিক' বা ইনফরমাল ভাষার শব্দও কিন্তু ভাষার অপরিহার্য অংশ।

তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology) প্রচুর চাকরিবাকরির সুযোগ করে দিয়েছে সন্দেহ নেই। আমাদের ঘরে-ঘরে অজস্র ছেলেমেয়ে অন্য চাকরির চেয়ে একেই গ্রহণীয় মনে করছে। সে-শুধু বড়ো অঙ্কের মাসমাইনের জন্যেই নয় নিশ্চয়। সে-আহ্বান তো আছেই। তাছাড়াও অন্য নানান আয়োজন-উপচার এই তথ্যপ্রযুক্তিকে লোভনীয় সমাদরণীয় পেশা হিসেবে তুলে ধরেছে। আর তারই সুবাদে তথ্যপ্রযুক্তির বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে কতকগুলো ব্যাপার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আজ তথ্যপ্রযুক্তিতে কর্মরত ছেলেমেয়েরাই কেবল কম্পিউটার ব্যবহার করছে না, ব্যবহার করছি আমরা অনেকেই। আমরাও কম্পিউটার ব্যবহার করছি আমাদের নানান কাজে, ওয়েবসাইট মারফত নানান তথ্য খোঁজাখুঁজির জন্যে, আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনদের সঙ্গে ই-মেল মারফত সংযোগ স্থাপনের জন্যে। এমনকী দশ বছর আগেও যাঁরা কাগজ-কলমের মতো উপকরণের উপর নির্ভর করেই যাবতীয় লেখালেখি সারতেন, সেই তাঁরাও কম্পিউটারে তাঁদের সমস্ত লেখার কাজ টাইপ করে প্রিন্টার মারফত 'লেখার' কাজ করছেন। কেবল আমার মতো দুর্মর কিছু রক্ষণশীল লোক, এখনও সেই কালি-কলম-কাগজেই আস্থা রেখে চলেছে, সমস্ত 'অসুবিধে' সত্ত্বেও।

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আর যে বস্তুটির বিশ্বজোড়া প্রচলনের কথা বলতে হবে, তা হল সেলফোন বা মোবাইল ফোন, তথাকথিত 'চলভাষ'। এর উপযোগিতা নিয়ে কোনো কথাই বলতে চাই না। সেলফোনের উপযোগিতার তুলনা নেই, আর সে-কথার আলোচনাও এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যা বলতে চাই তা এই যে, আমরা লক্ষ করেছি, ইলেকট্রনিক মেল বা

ই-মেলের বয়ান লেখার সময় প্রায় সবাই শব্দসংক্ষেপ করে থাকেন। এই সংক্ষেপণ এখন প্রায় নিয়মে পর্যবসিত, ব্যতিক্রম প্রায় বিরল ও দুর্লভ। FYI (for your information), u (you), ur (your), bfore বা b4 (before), dr (dear), updt (update), pl বা pls (please), hv (have), nt (not), txt (text), bk (book) এইসব সংক্ষেপণ দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যাঁরা সেলফোনে sms (Short Messaing Service) করেন তাঁরাও এসব সংক্ষেপণ ব্যবহার করে থাকেন। এতে সময় বাঁচে, খরচ বাঁচে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগোনো হয়।

দুই

আমরা অনেকেই রোমান হরফে বাংলা চিঠি লিখি কম্পিউটারে এবং মোবাইল ফোনে। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপণ এখনও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে নিকট ভবিষ্যতে বাংলা শব্দকেও ছেঁটে ছোটো করার আয়োজন শুরু হবে নিশ্চয়। কিন্তু সংক্ষেপণে তো আমরা অভ্যস্ত হয়েই রয়েছি। রবীন্দ্রনাথকে রবি বা রবিন, অমিতাভকে অমিত, হেমেন্দ্রনাথকে হেম বা হেমেন তো কতকাল ধরেই হয়ে চলেছে, যদিও আমরা মনে রাখি না হয়তো যে, এতে ওই নামশব্দগুলোর অর্থবিকৃতি ঘটছে। যাঁরা শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় যাতায়াত করেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, ওই শাখার নিত্যযাত্রীরা লক্ষ্মী (লক্ষ্মীকান্তপুর) ডায়মন্ড (ডায়মন্ডহারবার) ও বারুই (বারুইপুর) বলতেই অভ্যস্ত।

এসব সত্ত্বেও মানতে হবে যে, এস. এম. এস বা ই-মেলে বাংলা শব্দকে (তা রোমান হরফে লেখা বা টাইপ করা হলেও) ছেঁটে ছোটো করার কিছু টাইপোগ্রাফিকাল অসুবিধে আছে। অনুমান করি, সে অসুবিধে শিগ্‌গিরই কাটিয়ে উঠবেন একালের 'তথ্যপ্রযুক্তিবাজ' (এই শব্দটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করছি না। পটু অর্থেই ব্যবহার করছি—ঋণ, দেবেশ রায়) তরুণ-তরুণীরা এবং বাংলায় এস. এম. এস ও ই-মেল এর ভাষিক সম্ভাবনাকে বহুদূর প্রসারিত করবেন।

তিন

এস. এম. এস (যাকে Text messagingও বলা হয়) বা ই-মেল ভাষার ক্ষতি করছে কি না তা নিয়ে আমাদের চাইতে অনেক বেশি ভাবনায় পড়েছে ইংরেজিভাষী জগৎ। খোদ ইংল্যান্ডে কিছুকাল যাবৎ তোলপাড় হয়ে উঠেছে অ্যাকাডেমিক জগৎ। অনেকেরই বিশ্বাস, এস. এম. এস ও ই-মেল ইংরেজি ভাষার ক্ষতি করছে। আর যখন এমনই এক বিতর্কে আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল লিখে ফেলেছেন একটি মোক্ষম বই যার শিরোনামটিই অতীব চিত্তাকর্ষক—txtng : the gr8 db8। প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। বলা বাহুল্য, নামটি এসএমএস বা ই-মেলের অর্থোগ্রাফিতে লেখা হয়েছে। বইটি হল Texting: The Great Debate. ক্রিস্টাল সাহেব কী বলেছেন তাঁর ওই বইয়ে তা একটুখানি দেখে নিই আমরা।

ইংল্যান্ডের শিক্ষাজগতের কিছু বিশিষ্ট মানুষ এই ভেবে শঙ্কিত হচ্ছেন যে, ছোটো ছেলেমেয়েরা টেক্সট মেসেজ বা এসএমএস এবং ই-মেল করছে ভাষার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত

নিয়মের কোনোরকম তোয়াক্কা না করে। কোথায় সংক্ষেপণ (abbreviation) করব আর কোথায় করব না, সে জ্ঞানটুকুও হারাচ্ছে তারা। ক্রিস্টাল একটি চমকপ্রদ নমুনা দিয়েছেন তার 'prw ttyl' ('Parents watching, talk to you later')। এটা অবশ্য ঠিক abbreviation নয়, এটা বরং অনেকটা acronym-এর মতো। তা সত্ত্বেও ক্রিস্টাল ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আদৌ উদ্‌বিগ্ন নন। বরং তাঁর মতে এসব নিয়ে অযথাই হইচই হচ্ছে। তিনি এমনকী ওই prw ttyl নিয়েও ততটা যেন ভাবিত নন। সত্যিই তো, আমাদেরও মনে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের ছেলে বয়সে বড়োদের বা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সমবয়সিদের এড়িয়ে 'কোড' আমরাও ব্যবহার করেছি-'ইল্লামি ইল্লাজ ইল্লোখানে জিল্লাব নিল্লা (আমি আজ ওখানে যাব না)। ডেভিড ক্রিস্টাল এই বিষয়টাকে ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি বলেও দিচ্ছেন- 'The importance of private linguistic spaces is crucial to young Britain's love for texting.' তিনি লক্ষ করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে text message বা smsগুলো 'are written using utterly standard orthography'. একটু রসিকতার ঢঙে তিনি বলেছিলেন, এমনকী স্বয়ং রানিও (Queen's Englishএর কথা মাথায় রেখে) নিশ্চয় P.S এর বদলে তাঁর কোনো চিঠির শেষে Postscript লিখতেন না। ক্রিস্টাল একথাও বলেছেন যে, বহু text message পর্যালোচনা করে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই code mixing বা সংকেত মিশ্রণ এবং code switching বা সংকেত বদলের ইশারা দেখেছেন।

চিরকালই নতুন প্রযুক্তি সনাতন প্রথাকে অল্পসল্প আঘাত করেই থাকে। কীভাবে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বা নর্ম তার মোকাবিলা করে সেটাই দেখার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা আদর্শের একটু আধটু বদলও অস্বাভাবিক নয়। ক্রিস্টাল এও বলেছেন যে, যারা টেক্সট বার্তা লেখার সময় সংক্ষেপ করছে, তারাই প্রবন্ধ বা পেপার লেখার সময় শব্দের পূর্ণ রূপ লেখে। আমরাও যেন ভুলে না যাই যে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরও তো লিখতে হয় দ্র (দ্রষ্টব্য), পুং (পুংলিঙ্গ), নং (নম্বর)।

তাই বলে ওই দ্রষ্টব্য পুংলিঙ্গ আর নম্বরের মতো শব্দগুলো যে অচল হয়ে পড়েছে তাও তো নয়।

বাঙালির মুখের ভাষা

বাঙালির মুখের ভাষার স্বরূপ ও লক্ষণ কী তা নিয়ে বহু বাঙালিরই মনে স্পষ্ট ধারণা নেই। শিক্ষিত বাঙালি বা শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি যে-ভাষায় কথা বলেন তাকেই আমাদের মুখের ভাষা বলে থাকি। তাতে বড়ো রকমের ভুল হয় না বটে, তবে এই মনে করাটা সম্পূর্ণ নির্ভুলও নয়। আসলে বাঙালির মুখের ভাষার অনেকগুলো দিক আছে, অনেকগুলো স্তর আছে। যেকোনো ভাষারই থাকে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ভাষার এই বহুমাত্রিক ব্যাপারটা উল্লম্ব বা vertical এবং অনুভূমিক বা horizontal দুরকমই হতে পারে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে ছাত্রের ভাষা, নাবিকের ভাষা, কারিগরের ভাষা, পুলিশের ভাষা, সৈনিকের ভাষা, মজুরের ভাষা এসব যেমন আছে, তেমনি আছে ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের মার্জিত ভাষা, আছে গ্রামের চাষির ভাষা, আছে নারীর ভাষা। এই সব নিয়েই বাঙালির মুখের ভাষা। এই বিষয়ের চর্চা সমাজভাষাবিজ্ঞান বা sociolinguistics -এর অন্তর্গত।

উপভাষা কী?

তবে সাধারণভাবে বাঙালির মুখের ভাষা বলতে শুধু ওগুলোকেই বোঝায় না, বোঝায় সমস্ত অঞ্চলের বাঙালির অপরিশীলিত মুখের ভাষা, যার অপর নাম উপভাষা। উপভাষা কথাটির সাধারণ অর্থ ভাষার চাইতে একটু সংকীর্ণ এবং একটু যেন কম যোগ্যতাসম্পন্ন আঞ্চলিক ভাষা। উপভাষা মূলত একটা ছোটো অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষা আর সেই কারণেই একে সংকীর্ণ বলে ভাবা হয়ে থাকে। একটা ভাষার অনেকগুলো বা কতকগুলো আঞ্চলিক রূপভেদ থাকতে পারে। যেহেতু এগুলো একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাই এগুলোকে ভাষা বলা যায় না। ভাষা বলতে একটা সমগ্রতার ছবি ফুটে ওঠে। সব অঞ্চলের সব উপভাষা-অঞ্চলের মানুষের ভাষার সাধারণ রূপই হল ভাষা। আর সেই ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতার নামই উপভাষা। এখন অবশ্য শুধু আঞ্চলিকতাকেই উপভাষার একমাত্র বা প্রধান লক্ষণ বা ভিত্তি বলে মনে করা হয় না। কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষাকেও উপভাষা বলা হয় এখন। মাঝির ভাষাও উপভাষা, মজুরদের ভাষাও উপভাষা।

ভাষা-অঞ্চল যত ছোটো হবে, উপভাষার সংখ্যা ততই কম হবে। ভাষা-অঞ্চল যত বড়ো হবে, উপভাষার সংখ্যাও ততই বেশি হবে। বাংলা উপভাষা সম্বন্ধে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করেছেন জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর সুবিপুল লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশিত এগারো খণ্ডের এই বইয়ের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পর্বে গ্রিয়ারসন বাংলা উপভাষার একটা সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ওই গ্রন্থে চল্লিশটি বাংলা উপভাষা চিহ্নিত

করেছেন। সেই খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। উপভাষার লক্ষণ চরিত্র বিস্তার প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের অনেক বক্তব্যই পণ্ডিতরা এখন মেনে নিতে পারছেন না। তাতে অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমছে না। তিনি বিদেশি। বাংলা ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল কেবল ততটুকুই, যতটুকু একজন পণ্ডিত বিদেশি সিভিলিয়ানের পক্ষে অধিগত করা সম্ভব ছিল। সেই কারণে বাংলা উপভাষাগুলির শনাক্তকরণ, এক উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখা হলেও তাঁর চর্চার ত্রুটিও যে প্রকট তা মানতেই হবে।

এক উপভাষার সঙ্গে অন্য এক উপভাষার সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা দরকার। প্রথম কথা, উপভাষায় উপভাষায় আসল তফাত ধ্বনিগত, অর্থাৎ উচ্চারণগত। এক উপভাষায় যা খেয়ে গ্যাচে, আরেক উপভাষায় তা খেইয়ে গেইয়েচে, কোথাও-বা খাইয়া গ্যাসে। একথা বলার মানে এ নয় যে, এক উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার রূপগত বা পদবিন্যাসগত তফাত একেবারেই নেই। আছে নিশ্চয় তেমন তফাত। কিন্তু সে তফাত খুব বড়ো কিছু ব্যাপার নয়। সে তফাত মূলত শব্দগত বা lexical, মোটেই ব্যাকরণগত নয়। দ্বিতীয়ত, দুটো পাশাপাশি এলাকার ভাষায় ধ্বনিগত পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে কম। অর্থাৎ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর ভাষায় পারস্পরিক মিল থাকবেই। যত দূরে যাব ততই এক উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার মিল কমতে থাকবে। তৃতীয়ত, দূরত্বের জন্য মিল কমে যায় বলে পারস্পরিক বোধগম্যতাও কমবে। একে অপরের ভাষা কম বুঝবে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নিই। বাঙালির মুখের ভাষার কথা বলতে গিয়ে উপভাষার প্রসঙ্গ কেন আনলাম? আনলাম এইজন্য যে, উপভাষাগুলির মধ্যেই আছে বাঙালির মুখের ভাষার পরিচয়।

বাংলা উপভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

একটু আগে বলেছি গ্রিয়ারসন তাঁর ওই মহাগ্রন্থে চল্লিশটির মতো বাংলা উপভাষাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি পশ্চিমা বা Western, পূর্ব বা Eastern, দক্ষিণ-পশ্চিম বা South-Western এবং কেন্দ্রীয় বা Central এই কটি মূল ভাগে সমস্ত উপভাষাকে ভাগ করেছেন।

অর্থাৎ ওই চল্লিশটি উপভাষাই এই মূল ভাগগুলির মধ্যে ধরা হয়েছে। তিনি অবশ্য কেন্দ্রীয় বা Central dialect বলেছেন মান্য কথ্য ভাষাকে । বলা বাহুল্য, গ্রিয়ারসন উপভাষার বর্গীকরণের দিকে যাননি। উপভাষাগুলির একটা বিশদ বর্ণনা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পরে যাঁরা উপভাষার সংখ্যা, শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাও যে একটা সর্বজনস্বীকৃত হিসেব হাজির করতে পেরেছেন তাও নয়। এমনকী শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো সর্বস্বীকৃত বিবেচনা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে তার মধ্যে সুকুমার সেনের শ্রেণিবিভাগই তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। সুকুমার সেন 'স্থূল বিবেচনায়' বাংলা উপভাষাকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করেছেন—রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রী ও কামরূপী। সুকুমার সেনের এই শ্রেণিবিভাগ সাধারণভাবে গৃহীত হলেও কোনো কোনো আলোচক মনে করেন যে, ঝাড়খণ্ডি নামে একটি পৃথক গুচ্ছের তেমন সার্থকতা নেই। ঝাড়খণ্ডির অন্তর্ভুক্ত উপভাষাগুলিকে তাঁদের

মতে অনায়াসে রাঢ়ীর একটি উপবিভাগ বলে ধরে নেওয়া যায়। সম্প্রতি নিখিলেশ পুরকাইত নামে জনৈক গবেষক বাংলা উপভাষার যে ভৌগোলিক জরিপ প্রকাশ করেছেন তাতে তিনিও ঝাড়খণ্ডি নামে পৃথক কোনো শ্রেণি দেখাননি। এখানে স্মরণ করতে পারি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ঝাড়খণ্ডিকে তাঁর শ্রেণিবিভাগের মধ্যে রাখেননি। যাই হোক, এই তথ্যগুলিকে মনে রেখে বাংলা উপভাষার একটা ছক আমরা চোখের সামনে ধরতে পারি। সেটা হবে এইরকম—

ক	খ	গ	ঘ
রাঢ়ী উপভাষা	**বরেন্দ্রী**	**কামরূপী**	**বঙ্গালি**
বীরভূম,বাঁকুড়া	মালদা	উত্তর দিনাজপুর	ঢাকা,ফরিদপুর
মেদিনীপুর,	রাজশাহি	দার্জিলিং	ময়মনসিংহ
পুরুলিয়া	পাবনা	জলপাইগুড়ি	খুলনা, যশোর
বর্ধমান,	বগুড়া	রংপুর	বরিশাল
মুর্শিদাবাদ	দক্ষিণ দিনাজপুর	কোচবিহার	সিলেট
হুগলি, হাওড়া			চট্টগ্রাম
উত্তরচব্বিশ পরগনা			নোয়াখালি
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা			ত্রিপুরা, কাছাড়
নদিয়া, কলকাতা			পূর্ব নদিয়া

উপরের এই ছকটি যে নিখুঁত এমন দাবি করব না। এখানে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত,রাঢ়ী উপভাষাগুচ্ছের মধ্যে মেদিনীপুরকে রেখেছি আমরা। আসলে কিন্তু মেদিনীপুরের ভাষাকে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা সম্ভব। এবং নিখুঁত চিত্র পেতে হলে তাই-ই উচিত। এমনকী, বীরভূম ও বর্ধমানেরও পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তবু এখানে সাধারণ পাঠকদের সুবিধের কথা মনে রেখে অত খুঁটিনাটির মধ্যে যাইনি। দ্বিতীয় কথাটি এই যে, উপরের এই ছকটি তৈরি হয়েছে, ভৌগোলিক ভাষাঅঞ্চল ধরে। তার ফলে এখানে এসে গেছে সেইসব উপভাষাও যেগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত। এসেছে কাছাড় অঞ্চলের ভাষাও, ভৌগোলিক বিচারে যা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত নয়, অসমের অন্তর্গত। যদি আমরা রাষ্ট্রিক বিভাগ দেখাতাম তা হলে অবশ্যই পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থাৎ তথকথিত 'বাঙাল' উপভাষাগুলোকে আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতে পারতাম না। কিন্তু যেহেতু আমরা দেখাতে চাই বাংলা উপভাষাগুলোকে, অর্থাৎ বাঙালির কথ্য ভাষাকে, তাই এই যেসব উপভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভিতরের নয় এখন, অথচ যেগুলো বাঙালিরই ভাষা, সেগুলোকে হিসেবের মধ্যে আনতেই হবে। তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে, এক একটা উপভাষা-অঞ্চলের লাগোয়া অঞ্চলের অন্য উপভাষার প্রভাব প্রায়ই পড়ে উপভাষায়। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঠিক-ঠিক বজায় থাকে না। পশ্চিম বর্ধমানের উপভাষায় বাঁকুড়ার ভাষার মিশেল পাওয়া যাবে। আবার উত্তর বর্ধমানের ভাষায় থাকবে মুর্শিদাবাদের ভাষার মিশেল। খুলনার ভাষার ছাপ খুবই প্রকট

পশ্চিম বরিশালের ভাষায়। উপভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় এই কথাটি ভুলে যাওয়া চলবে না।

উপভাষাগুলির মধ্যে মিল ও অমিল

কোনো ভাষাই একটা জায়গায় থেমে থাকে না। ভাষামাত্রই পরিবর্তিত হয়। এডওয়ার্ড সাপির বলেছেন যে, একটা ভাষা যদি উপভাষায় বিভক্ত না-ও হয়, তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কোনো ভাষাই এমন কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাপার হতে পারে না যে, তা মূল-রূপ থেকে একটুও সরে আসবে না। একটা ভাষায় আঞ্চলিক বিভিন্নতার উদ্ভব হয় কেননা দুই বা তার বেশি ভাষাগোষ্ঠী কিছুটা দূরে সরে যায়। আর তা যায় বলেই তাদের কথায় পরিবর্তন আসে। সে-পরিবর্তন প্রথমে উচ্চারণে দেখা দেয়, পরে অন্যত্র।

তাহলে আমরা দেখছি যে উপভাষা ভাষারই কথ্য রূপভেদ। আর তাই যদি হয় তবে উপভাষায় উপভাষায় মিল থাকা যতটা স্বাভাবিক, ততটাই স্বাভাবিক অমিল থাকা।

বাংলা উপভাষাগুলি এসেছে মাগধী অপভ্রংশের কতগুলি আঞ্চলিক বিভিন্নতা থেকে। বাংলা উপভাষা অঞ্চলের যে চারটি ভাগের কথা বলেছি সেগুলো প্রাচীন বাংলার চারটি বিভাগেরই অনুরূপ। প্রাচীনকালে রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ আর বঙ্গ এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল বাংলা। বরেন্দ্রভূমি অবশ্য পুন্ড্র নামেও পরিচিত ছিল। আরও বলবার কথা এই যে, রাঢ়, বরেন্দ্র আর কামরূপের উপভাষাগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত অর্থাৎ উচ্চারণগত মিল বেশ লক্ষ করবার মতো। সে তুলনায় এদের সঙ্গে বরং বঙ্গালির মিল কমই।

ধ্বনিগতভাবে রাঢ়ের জেলাগুলিতে অভিশ্রুতি ও স্বরসংগতি লক্ষ করতেই হবে। করিয়া—কোরে, পাইয়া — পেয়ে এই রূপদুটি দেখলেই একথা বেশ বোঝা যাবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অ ধ্বনির ও ধ্বনিতে পরিবর্তনের প্রবণতা। বন —বোন্, মন —মোন্, বলল— বোল্লো। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নাসিক্যীভবন। রাঢ়ের জেলাগুলিতে অনুনাসিকতার প্রবণতা একটু বেশিই শোনা যায়। বীরভূম-বাঁকুড়ায় শুনতে পাওয়া যাবে ভোগাইঁচে (ভুগিয়েছে), হাঁসপাতাল, রঁইচে (রয়েছে) প্রভৃতি। এসব শব্দের অনুনাসিকতা লক্ষ করবার মতো। তৃতীয়ত, শব্দের মধ্যে বা শেষে মহাপ্রাণতার লোপ বা ক্ষীণতাও এই উপভাষার লক্ষণ। দুধ — দুদ্, বুঝব — বুজ্বো, কোথা -কোতা। চতুর্থত, এ ধ্বনির অ্যা হবার একটা প্রবণতাও আছে এই উপভাষায়। ক্রিয়াপদে সাধারণ অতীতের উত্তমপুরুষে — লুম বিভক্তির ব্যবহার আর এক বৈশিষ্ট্য — করলুম, গেলুম। বর্ধমান ও বীরভূমে ন প্রায়ই ল হয়। লিয়ে যাও, ভালো লয়।

বঙ্গালিতে এ ধ্বনির অ্যা ধ্বনিতে রূপান্তর এবং ও-র উ-তে রূপান্তর লক্ষ করবার মতো। রাঢ়ীর অভিশ্রুতি স্বরসংগতি এখানে নেই। বরং কিছুটা অপিনিহিতির মতো স্বরধ্বনি এগিয়ে আসে। করিয়া —কইরা, দেখিয়া — দেইক্খা, মরিয়া — মইরা। এই উপভাষায় রাঢ়ীর মতো অনুনাসিকতার প্রবণতাও নেই। প্রথম সিলেবলেও মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়। বাত (ভাত) খামু, দান (ধান) নিয়া যাও। শ্ ধ্বনি প্রায়ই হ-তে পরিণত হয়। শালা — হালা, সে — হে। অনুনাসিকতার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির ভাষাতেই কেবল অনুনাসিকতা শোনা যায়। এই দুই উপভাষায় আরও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আছে যা বঙ্গালির অন্য

উপভাষাগুলিতে নেই। যেমন স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের উষ্মীভবন, যথা ক — খ (কলেজ খলেজ)। এই উষ্মীভূত খ ধ্বনি /x/ অন্য কোনো উপভাষায় নেই। বঙ্গালিতে ঘৃষ্ট (affricate)জ্ ধ্বনিটি দন্ত্য ঘৃষ্টতে (dental affricate) পরিণত হয়। জামা /jama/ হয়ে যায় জ়ামা /zama/। রাঢ়ীর অন্তর্গত ও বঙ্গালির অন্তর্গত উপভাষাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা কিছু কম নয়। মধ্য বর্ধমানের ভাষা ও পশ্চিম বীরভূমের ভাষা রাঢ়ীরই উপভাষা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য কম নয়। বীরভূমের যে রইঁচে, ভোগাইঁচে প্রভৃতি অনুনাসিক ক্রিয়ারূপের কথা বলেছি, মধ্য বর্ধমানে তা মোটেই নেই। বরং মধ্য-উত্তর বর্ধমানে রইয়েচে, গেইয়েচে শোনা যায়। তেমনি খুলনা ও বরিশাল দুইই বঙ্গালির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে তফাত বেশ লক্ষণীয়।

একটা উপভাষা অঞ্চলের অবস্থান আর একটা থেকে যত দূরে তাদের মিলও তত কম হবে, অবস্থান কাছাকাছি হলে মিল বেশি হবারই কথা। সেইজন্যেই বর্ধমানে-বীরভূমে যত মিল, বর্ধমানে-পাবনায় তত মিল নেই। বরিশালে আর ফরিদপুরে যত মিল বরিশালে আর পুরুলিয়াতে তত নেই। অথচ সবকটিই বাংলার উপভাষা।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, এই উপভাষাগুলির মধ্যেই রয়েছে বাঙালির কথ্য ভাষার নিদর্শন। বাঙালির কথ্য ভাষা বললে কোনো একটি উপভাষাকে বোঝাবে না, এমনকী, আদর্শ বা মান্য কথ্য ভাষাকেও বোঝাবে না, বোঝাবে যে চারটি ভাষা-অঞ্চলে আমাদের ভাষাকে ভাগ করেছি, তার অন্তর্গত সবকটি উপভাষাকে।

আদর্শ কথ্য ভাষাও একটি উপভাষা

বাঁকুড়ার ভাষায় কথা বলেন এমন এক ভদ্রলোকের যদি কথা বলতে হয় এমন একজনের সঙ্গে যিনি নদিয়ার মানুষ, তাহলে এই দুজনে কী ভাষায় কথা বলবেন? এক্ষেত্রে কয়েকটা সম্ভাবনা আছে। এক, একজন বাঁকুড়ার ভাষা বলবেন, অন্যজন বলবেন নদিয়ার ভাষা। দুই, দুজনেই বাঁকুড়ার ভাষা বলবেন (যদি অবশ্য নদিয়ার মানুষটির বাঁকুড়ার ভাষা জানা থাকে)। তিন, দুজনেই নদিয়ার ভাষা বলবেন (যদি বাঁকুড়ার মানুষটির নদিয়ার ভাষা জানা থাকে)। চার, দুজনেই এমন কোনো তৃতীয় ভাষায় কথা বলবেন যেটা পুরোপুরি নদিয়ার বা বাঁকুড়ার ভাষা নয়, অথচ দুইয়েরই কিছু বৈশিষ্ট্য তাতে থাকতে পারে এবং দুজনের কাছেই সেটা সমান বোধগম্য।

এই-যে চতুর্থ সম্ভাবনার কথা বললাম তা থেকেই আদর্শ কথ্য ভাষার ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যাকে আদর্শ কথ্য ভাষা বা আদর্শ কথ্য বাংলা (Standard Colloquial Bengali) বলছি তাকে কেউ কেউ মান্য কথ্য বাংলাও বলেন। কেউ-বা বলেন মান্য চলিত বাংলা। বাংলাদেশের আলোচকরা একে বলেন মান ভাষা। একে আদর্শ বলার অর্থ এই নয় যে, এই ভাষা তত্ত্বগতভাবে অন্যান্য উপভাষাগুলির চাইতে উৎকৃষ্টতর বা উন্নততর। একে আদর্শ বলার কারণ এই ভাষা সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির কথ্য ভাষা। ঢাকার বাঙালি, বর্ধমানের বাঙালি, কলকাতার বাঙালি, কিংবা দিনাজপুরের বাঙালি যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা এই ভাষাতেই কথা বলে।

এই আদর্শ কথ্য ভাষাটি কীসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল? আর তার গড়ে ওঠার

প্রক্রিয়াটিই বা কেমন? প্রথমে প্রথম প্রশ্নের জবাব। আমাদের আদর্শ কথ্য ভাষাটি গড়ে উঠেছে মূলত রাঢ়ীর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি উপভাষার উপর ভিত্তি করে। কলকাতার ভাষা, পূর্ব হাওড়ার ভাষা, উত্তর চব্বিশ পরগণার ভাষা এবং নদিয়ার ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এই আদর্শ কথ্য ভাষার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। তার মানে, এই ভাষা গড়ে উঠেছে রাঢ়ীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে, নিঃসন্দেহে যার মধ্যে কলকাতার ভাষার প্রাধান্য ছিল। অর্থাৎ কলকাতার ভাষার কাঠামোর উপর কলকাতার নিকট-উত্তর ও নিকট পশ্চিমের জেলাগুলোর ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই ভাষা। বলা বাহুল্য, এ এক মিশ্র ভাষা।

কিন্তু এই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষাই কেন বাঙালির আদর্শ কথ্য ভাষা হয়ে দাঁড়াল? ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়ছিল। আর সেই সঙ্গে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান শহর কলকাতার গুরুত্বও স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছিল। বাংলার নানা জায়গা থেকে বহু মানুষ কলকাতায় আসতে লাগল। রাজনীতিক কারণে এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের কারণে কলকাতার সঙ্গে বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষের নিরন্তর যোগাযোগ ঘটতে লাগল। এ থেকেই, অনুমান করতে পারি আমরা,কলকাতার ভাষা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল অন্যান্য জেলা থেকে আসা লোকের ভাষার উপর।

কিন্তু কলকাতার পুরোনো যে-ভাষা সে-ভাষাই যে আমাদের আদর্শ কথ্য ভাষা হয়ে দাঁড়াল তা তো নয়। তার সঙ্গে নদিয়া হাওড়া হুগলির ভাষার মিশেলও তো ঘটেছিল। মিশেল যতই হোক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মূলত কলকাতার সেকালের কথ্য ভাষার পরিশীলিত রূপই পরে আদর্শ কথ্য বাংলা হয়ে দাঁড়ায়। এই শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে যে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন হয়েছিল আদর্শ কথ্য ভাষাই সেই চলিত ভাষার ভিত্তি। এবং এও ঠিক যে, উভয়ে উভয়কে প্রভাবিত করেছে।

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ কথ্য ভাষাও বস্তুতপক্ষে একটি উপভাষা। কেবল বলা চলে যে, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক কারণে সেই উপভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির স্বীকৃত মুখের ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে যাকে আদর্শ কথ্য বাংলা বলছি তারও দুটি রূপ আছে। একটি তার স্বাভাবিক বা informal রূপ। ঘরেবাইরে বন্ধু আত্মীয়পরিজন প্রভৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তায় ব্যবহৃত রূপ। অন্যটি আনুষ্ঠানিক বা শিষ্ট রূপ যা কিছুটা পরিশীলিত। এই দুইয়ের মধ্যে শব্দের ব্যবহার এবং উচ্চারণে কিছুটা তফাত লক্ষ করা যাবে। বক্তৃতায়, বেতারে ও দূরদর্শনের কথিকায় শিক্ষিত বাঙালি কি শব্দের ব্যবহারে কি উচ্চারণে কিছুটা পরিশীলিত বা আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল বাংলা বলেন।

আবার এই আদর্শ কথ্য বাংলার যে স্বাভাবিক বা informal রূপ তাতেও আছে নানান বিভিন্নতা। সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার স্তর ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণে তফাত ঘটে যায়। কখনো কখনো স্ল্যাং এবং অপভাষারও ব্যবহার হয়, যদিও মূল কাঠামোটা থাকে আদর্শ কথ্য ভাষাতেই আধারিত।

বাঙালির মুখের ভাষার মোটের উপর দুটি দিক আছে তাহলে। উপভাষাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে বাঙালির মুখের ভাষার সহজ স্বাভাবিক রূপটি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভাষায় আপামর

বাঙালি কথা বলে তার মধ্যেই আছে বাঙালির স্বাভাবিক কথ্য ভাষার পরিচয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এই কথাটিও বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষার প্রসার, বেতার ও দূরদর্শনের প্রবল প্রভাব, সিনেমার অনুপ্রবেশ, ক্রমাগত কলকাতা তথা বাংলার শহরাঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযোগ এবং নিরন্তর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রভৃতির ফলে খাঁটি উপভাষা ক্রমেই সীমিত হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের সহজসরল মানুষ নিজের উপভাষার কাঠামোয় কথা বললেও তাঁদের কথাবার্তায় বাইরের প্রভাব এসে পড়েছে। সভ্যতা ও নাগরিকতা ক্রমশ দীর্ঘ ছায়া ফেলছে আর তার ফলে অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রেও ঘটে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন।

তবু আঞ্চলিক এই উপভাষাগুলির মধ্যেই রয়েছে বাঙালির মুখের ভাষার পরিচয়। আর দ্বিতীয় যে দিকটির কথা বলতেই হবে তা হল আদর্শ কথ্য বাংলা। এর মধ্যে রয়েছে বাঙালির মুখের ভাষার আর এক পরিচয়। বাঙালির মুখের ভাষার কথা বলতে গেলে আঞ্চলিক উপভাষাগুলির কথা যেমন বলতে হবে, তেমনি আদর্শ কথ্য বাংলার কথাও বলতে হবে। এই সব মিলিয়েই বাঙালির মুখের ভাষা।

বাংলায় কীভাবে লিখব ফরাসি শব্দ ও নাম?

এই নিবন্ধের শিরোনাম দেখে পাঠকেরা যদি একটু অবাক হন, কিংবা শিরোনাম দেখে তাঁরা যদি লেখকের উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে না পারেন, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। প্রথম কথা, কেন কেবল ফরাসি ভাষার কথা বলা হচ্ছে? আরও তো এমন বিদেশি ভাষা আছে যেসব ভাষার শব্দ ও নাম বাংলা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন জার্মান ভাষা বা স্পেনীয় ভাষা। এই দুটি ভাষার কথা তুলছি না কেন? এই প্রশ্ন খুবই সংগত। তবে এর উত্তরও সহজ। প্রথমত, জার্মান ভাষার উচ্চারণ ফরাসির মতো জটিল নয়। ওই ভাষার শব্দ ও নামের উচ্চারণে সংশয় কমই দেখা যায়। স্পেনীয় ভাষার ব্যাপারটা কিছু আলাদা। শুধু স্পেনেই নয়, লাতিন আমেরিকার প্রায় সর্বত্র যেহেতু স্পেনীয় ভাষাই চালু, তাই স্পেনীয় ভাষার শব্দ ও নামও আলোচিত হওয়া উচিত বলে নিশ্চয় মনে করা যেতে পারে। এই কথাটাকে মেনে নিয়েও বলব, প্রায় এক শতক ধরে ফরাসি ভাষার বহু শব্দ ও নাম নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে এলেও আজ পর্যন্ত তাতে বিধিবদ্ধতা (standardization) আসেনি। আর তা না আসার কারণ ওই ভাষার উচ্চারণের জটিলতা। স্পেনীয় ভাষায় সেই জটিলতা নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস, আর দ্বিতীয়ত স্পেনীয় ভাষার শব্দ বা নামের ব্যবহার এখনও আমাদের বিদ্যাচর্চায় অতটা ব্যাপক নয়।

এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বহু বছর ধরে শিক্ষিত বাঙালি যে দ্বিতীয় বিদেশি ভাষাটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সেটা ফরাসি ভাষা। সাহিত্যের কারণে ফরাসি ভাষার প্রতি একটা টান শিক্ষিত বাঙালির ছিলই। সেই টানের জোর নিশ্চয় বাড়িয়ে দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং লোকনাথ ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যিকরা। দ্বিতীয়ত, আমাদের এই সময়ে ভালো ফরাসি-জানা বাঙালির সংখ্যা নেহাত কম নয়। কাজে-কাজেই বহু শিক্ষিত বাঙালির কাছে ফরাসি ভাষাটি একেবারে অপরিচিত নয়। উপরন্তু এই ভাষার শব্দ ও নাম বাংলায় লেখার একটা চলনসই রীতি চলে আসছে প্রায় সত্তর-আশি বছর ধরে। এই নিবন্ধের শিরোনামের প্রশ্নচিহ্নটা তাই অনেকের কাছেই অর্থহীন বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি অপ্রাসঙ্গিক? সমস্যা এসব সত্ত্বেও যে ভালোরকমই আছে সেটাই দেখাতে চাই।

দুই

আমরা সকলেই জানি, দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হতে হতে কতকগুলো শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকরণ একরকম স্থির হয়ে গেছে। র‍্যাঁবো (Rimbaud), তুলুজ় (Toulouse), পোয়াঁকারে (Poincaré), শাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand), ক্লোদ (Claude), স্যাঁ-সিমঁ (Saint-Simon), রাব্‌লে

(Rabelais), লাফাইয়েৎ (Lafayette), শাঁজেলিজে (Champs-Élysées), দাঁতোঁ বা দাঁতঁ (Danton), ভ্যর্সায়ি (Versailles) প্রভৃতি নাম বহু দিন ধরে এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব ক্ষেত্রে কেউ হয়তো 'দাঁতঁ' লেখেন, কেউ-বা 'দাঁতোঁ'। Debussy-কে কেউ লেখেন দ্যব্যুসি, কেউ-বা দ্যবুসি। আমরা এই বিভিন্নতাকে তত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। Paulকে পল লিখব, না পোল? অনেকেই পোল লেখেন, পোল ভালেরি। অরুণ মিত্র লিখেছেন এবং চিন্ময় গুহ লেখেন পল। আমরা অবশ্য এটাকেও বড়ো কোনো সমস্যা বলে মনে করি না। কয়েকটা শব্দ বা নামের উচ্চারণ কী হবে তা কেবল জেনে নেওয়ার প্রশ্ন। কবি Saint-John Perse-কে কী বলা হবে? কীভাবে লেখা হবে তাঁর নাম? বহু লোকেই বলেন বা লেখেন স্যাঁ- জঁ প্যার্স। আপাতদৃষ্টিতে ভুল নেই এতে, থাকার কথা নয়। কিন্তু অনেক বছর আগে অরুণ মিত্র শুধরে দিয়েছিলেন, ওই নামটির প্রকৃত উচ্চারণ স্যাঁ- জন প্যার্স। নিতান্তই ব্যতিক্রম এটা। এই ধরনের ব্যাপারও আমাদের এই আলোচনার পক্ষে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ কেবল তথ্য আর অতথ্যের ব্যাপার। আসল সমস্যা অন্যত্র। এক ভাষার শব্দ ও নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর একটি ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণ কখনো নিখুঁত হতে পারে না। কাছাকাছি পৌঁছোনো যায় মাত্র। এই কথাটা মাথায় রাখা একান্তই জরুরি। উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের ভাষায় যে ভিন্নতা আছে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'স্ট্যান্ডার্ড' ফরাসি ভাষার আলোচনায় সেই ভিন্নতা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তিন

ফরাসি ভাষার কিছু স্বরগুচ্ছের (vowel cluster) উচ্চারণ বাংলায় দেখানো এতই কঠিন যে, সেগুলোকে নিয়ে লেখক-পাঠক প্রায়ই বিভ্রান্ত হন। এর মধ্যে আছে un যার উচ্চারণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে (IPA) দেখানো হয়েছে /œ̃/ এইরকম। আছে um, একই উচ্চারণ /œ̃/। কী লেখা হবে বাংলায়? উঁ লিখলে ঠিক হয় না, য়্যুঁ লিখলেও খুব-একটা কাছাকাছি যায় না। এছাড়া কীই-বা লেখা যায়? অ্যঁ বোধ হয় একটু কাছাকাছি যায়। এই শব্দে বা শব্দাংশে উ-ধ্বনি ততটা স্পষ্ট নয়। যেন একটা অর্ধোচ্চারিত বা অর্ধেক উ-ধ্বনি। ধরা যাক humble শব্দটা। IPA-তে উচ্চারণ /œ̃:bl /। বাংলায় তাই অ্যঁব্‌ল্ লিখতে ইচ্ছা করে। অন্য কিছুও কি লেখা যায়, লেখা কি সংগততর হবে? এই হল একটা সমস্যা।

দ্বিতীয়ত, শব্দের বা নামের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে en থাকলে এবং পরে অন্য কোনো ধ্বনি না থাকলে কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার উচ্চারণ IPA-তে /ã :/ দেখানো হয়। কাজে কাজেই বাংলায় একে আঁ লেখাই মনে হয় সংগত। যেমন encyclopédie হল আঁসিক্‌লপেদি /ãsiklɔpedi/, penchant হল পাঁশাঁ/pãʃã/। অরুণ মিত্র এইরকমই লিখতেন। এখনকার বিশিষ্ট ফরাসিবিদ চিন্ময় গুহও তাই লেখেন। ফ্রান্সেরCharente নামের নদীটির উচ্চারণ /ʃarãt/, বাংলায় লিখব শারাঁৎ। কিন্তু লক্ষ করেছি অনেকেই লেখেন অঁ। তাঁরা লেখেন অঁসিক্‌লপেদি, পঁশঁ। এবং নিশ্চয় লিখবেন শরঁৎ। কিন্তু তা তো হবার কথা নয়। IPA-র a হল আ, ã হল আঁ। খোদ ফরাসিদের মুখেও যা শুনেছি তা তো আ এবং আঁ উচ্চারণেরই কাছাকাছি, কোনোমতেই অ বা অঁ নয়। যাঁরা ফরাসি ভাষাটিকে উত্তমরূপে জানেন না, তাঁরা লিখতেই পারেন। কিন্তু যাঁদের আমরা ফরাসি ভাষাভিজ্ঞ বলেই জানি তাঁদেরও কেউ-কেউ a-কে অ এবং ã-কে/ অঁ লেখেন।

তৃতীয়ত, r বর্ণটা যে অতীব গোলমেলে তা অনেকেই জানেন। এর উচ্চারণস্থান কণ্ঠের পিছনে। কণ্ঠনালিপথ বা glottis দিয়ে হাওয়া বাইরে বার করে r উচ্চারণ করতে হয়। জিভ মূর্ধাকে বা দন্তমূলকে স্পর্শ করবে না। IPA-তে কোথাও R-কে উল্টে /ʁ/ দেখানো হয়, কোনো-কোনো সংস্থা আবার capital R ব্যবহার করে, কেউ-বা /r/ ব্যবহার করে। ফরাসিরা যেভাবে r উচ্চারণ করে তা অনেকটা আমাদের 'র্হ'-র মতো আরও সহজ করে বলতে গেলে, হ্র-র মতো। যেমন au revoir (বিদায়) শব্দটি IPA-তে /ɔrvwar/। কিন্তু ফরাসিরা উচ্চারণ করে অনেকটা অর্হ্ ভোয়ার্হ্ বা অহ্ভোয়াহ্ -এর মতো করে। কবি Rimbaudকে ফরাসিরা বলে অনেকটা হ্র্যাঁবো-র মতো। অনেকেরই মনে পড়বে, বছর ত্রিশ-পয়ঁত্রিশ আগে আমাদের জনৈক সুখ্যাত লেখক হ্র্যাঁবো লেখার প্রস্তাব করায় তাঁকে বিস্তর নিন্দেমন্দ করা হয়েছিল। অথচ সত্যিই তো ফরাসিরা ওই নামটিকে রীতিমতো আলজিভ কাঁপিয়ে ওইরকমই উচ্চারণ করে। Alexendra ওদের উচ্চারণে আলেক্জ্হাঁধা-র মতো। Bonjour-কে ফরাসিরা মোটেই বঁজুর বলে না, বলে বঁজুহ্ বা বঁজুর্হ্-এর মতো। এই একই কারণে Louvre মিউজ়িয়ামকে বলে লুভ্, মোটেই তা লুভ্র্ নয়। ফরাসিদের উচ্চারণে trois (তিন) হল থোয়া, quatre (চার) হল কাথ্ বা ক্যাথ্, trente (ত্রিশ) হল থাঁৎ। এইরকম আরও বহু r-যুক্ত শব্দ নিয়ে r-এর বিশিষ্ট ফরাসি উচ্চারণ দেখানো যায়। তবে আর উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নেই।

এখন তাহলে একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠে পড়ে। কেন অরুণ মিত্র, পুষ্কর দাশগুপ্ত, চিন্ময় গুহদের মতো ফরাসিবিদেরা ফরাসি r কে বাংলায় র লিখেছেন, লেখেন? সে কি এই জন্য যে, ফরাসি উচ্চারণ ঠিক ঠিক দেখাতে গেলে তাতে বাঙালি পাঠকের বড়ো রকমের ধাক্কা লাগবে? এমনটা হতেও পারে যে, ইংরেজি ভাষার শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে যেমন বহু ক্ষেত্রেই বড়ো রকমের আপস করা হয়, ফরাসির ক্ষেত্রেও তাই। ইংরেজি cat, campaign, great, road শব্দগুলোর উচ্চারণ যদিও খ্যাট্, খ্যাম্ফেইন, গ্রেইট, র্ঔড্,বাংলায় ক্যাট,ক্যাম্পেইন/ ক্যাম্পেন, গ্রেট, রোড লেখা হয়। নিখুঁত উচ্চারণ করে বাংলায় লিখলে তাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হতেই পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে একটা আপস করে নেওয়া হয়েছে।

ফরাসির ক্ষেত্রেও কি তা-ই? আমরা লক্ষ করেছি, ফরাসি ভাষাটা অত্যন্ত ভালো জানা সত্ত্বেও অরুণ মিত্র বরাবর প্যারিস লিখে গেছেন, পারি বা পাহ্রি লেখেননি। বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে একটা মধ্যপন্থা নিতেই হয় অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু এই আপস কতদূর পর্যন্ত সংগত সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ধরা যাক, bureau de poste (post office) কথাটা। ফরাসিভাষীর মুখে যা ব্যুহো দ্য পস্ত্ বা ব্যুর্হো দ্য পস্ত্, তাকে ব্যুরো দ্য পস্ত্ লিখলে বা বললে ফরাসির কাছাকাছি পৌঁছোনো যায় না, ও-ভাষার উচ্চারণের আদলটাকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। সবাই জানেন, Hugo-র উচ্চারণ য়্যুগো। কিন্তু Victor Hugo নামের রেস্টরান্টের উচ্চারণ ভিক্তহ্যুগো। এই হ আসে r-এর জন্যে। শব্দটাকে বাংলায় লিখতে হলে কী লেখা উচিত?

চার

আবার এও লক্ষ করেছি যে, আমাদের সমসময়ে যাঁদের ফরাসিবিদ বলে জেনেছি তাঁদের লেখালিখিতেও রয়েছে বিস্তর বিভিন্নতা। ফরাসি j-কে কেউ লেখেন জ়, কেউ-বা ঝ়। du-কে কেউ কেউ লেখেন দু, যদিও বেশিরভাগ লেখকই লেখেন দ্যু। ফরাসি স্থাননাম আর ব্যক্তিনাম

বাংলায় লেখার দরকার হয় প্রায়ই। একটা বিধিবদ্ধ রীতি না থাকলে একই নামের বা শব্দের নানান রূপ চলতেই থাকবে। Jean নামের নানান চেহারা দেখতে পাই — জাঁ, জ়াঁ, জঁ, জ়ঁ, ঝাঁ, ঝ়াঁ ইত্যাদি। François ও Andréকে পুষ্কর দাশগুপ্ত ও স্বপন দাশ মহাপাত্র তাঁদের অনুবাদ পত্রিকায় একদা লিখেছিলেন ফ্রঁসোয়া, অঁদ্রে। অন্য দিকে অরুণ মিত্র লিখেছেন এবং চিন্ময় গুহ লেখেন ফ্রঁসোয়া, আঁদ্রে। আমাদের বিবেচনায় এই দ্বিতীয় প্রতিবর্ণীকরণই সঠিক, যদি ফরাসিদের মূল উচ্চারণকে অনুসরণ করতে হয়, যদি IPA-তে যা দেখানো আছে তাকে অনুসরণ করতে হয়।

ফরাসি উচ্চারণ সঠিকভাবে দেখাবার জন্য বহুদিন আগে বর্গীয় জয়ের নীচে বিন্দু ব্যবহার করার চল হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু এর অন্যতম হোতা। এখন তা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে। অন্য দিকে, /ʒ/ ধ্বনিটির জন্য বর্গীয় জয়ের নীচে দুটি বিন্দুরও চল হয়েছে। সকলেই যে তা করছেন তা নয়। তবে কেউ-কেউ নির্দিষ্টতার স্বার্থে জ় ব্যবহার করছেন। করছেন এই বর্তমান লেখকও। cage (খাঁচা) শব্দের উচ্চারণ /kaʒ/, বাংলায় লিখব কাজ়। উনিশ শতকের বিখ্যাত সমরনায়ক Georges Boulanger-কে বলব জ়র্জ় বুলাঁজ়ে।

পাঁচ

বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের একটা বড়ো এলাকা জুড়ে রয়েছে ফরাসি ভাষার শব্দ ও নাম। তাকে বিধিবদ্ধ করার জন্য বাঙালি ফরাসিবিদদের ভাবতে অনুরোধ করি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিরও নিশ্চয় এ-ব্যাপারে আগ্রহ থাকবে। কেননা, প্রশ্নটা যেহেতু বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ, সেহেতু বিষয়টা বাংলা ভাষার বিধিবদ্ধতার এলাকায় ঢুকে পড়ে। জার্মান, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষার নাম ও শব্দের প্রতিবর্ণীকরণেও যথেষ্ট অন্যমনস্কতা দেখতে পাই। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এখনও জোত্তো (Giotto), জর্দানো (Giordano) গ্রামশি-কে (Gramsci) জিয়তো, জিয়র্দানো, গ্রামশ্চি লেখেন। পুরোপুরি ইংরেজি রীতিতে লিখলে কিছু বলার থাকে না। প্যারিস, নেপোলিয়ন, ভিয়েনা, ফ্লরেন্স, অগাস্টাস প্রভৃতি নাম এইভাবে তো লেখা হচ্ছেই। কিন্তু ইতালীয় বা ফরাসি বা জার্মান উচ্চারণ অনুসরণ করতে হলে সে উচ্চারণ জেনে নিয়ে লেখাই সংগত। আর ঠিক এখানেই ফরাসিবিদ, এবং জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতির ভাষার পণ্ডিতদের একটা ভূমিকা রয়েছে। বাংলা বিদ্যাচর্চায় এই বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়।

বর্ধমানের উপভাষা : একটি রূপরেখা

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে 'প্রাকৃত ভাষা'-র কথা বলেছেন। আমরা জানি তাঁর ওই প্রাকৃত ভাষা হল আমজনতার মুখের ভাষা, আমবাঙালির মুখের ভাষা। সেই প্রাকৃত ভাষাই বাঙালির প্রকৃত ভাষা। এও আমরা জানি যে, বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যেই রয়েছে সেই প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু উপভাষার পদ্ধতিগত চর্চা ঠিকমতো শুরু হয়েছ অনেক পরে, বলতে গেলে বিংশ শতকের মাঝামাঝি। এমনকী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থ 'ওডিবিএল'-এও তার যথাবিধি সূত্রপাত দেখিনি আমরা। তাঁকে লিখিত ভাষিক উপাদানের উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছিল। অথচ ১৯০৩ সালে গিয়ারসনের সেই বিখ্যাত আকরগ্রন্থ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভেতে (যার পঞ্চম খণ্ডটি সম্পূর্ণতই বাংলা ভাষায় নিবেদিত) ঔপভাষিক শব্দচর্চার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সেই সুযোগ গ্রহণ করতে আমাদের উপভাষা-বিশেষজ্ঞদের কেটে গেছে অনেকগুলি বছর। আশার কথা, আশ্বাসেরও কথা, উপভাষা চর্চা শুরু হয়েছে কিছুকাল যাবৎ। যদিও এখনও উপভাষাচর্চা অনেক ক্ষেত্রেই ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষায় সমৃদ্ধ নয়, যদিও সে-চর্চায় বহুলাংশে বিশেষজ্ঞতার চিহ্ন থাকে না, তবুও চর্চা যে হয়ে চলেছে, সেটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারই ইঙ্গিত।

উপভাষার প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত উপভাষা-মানচিত্র রচনা। আর সেই মানচিত্রে সমধ্বনি রেখা বা ধ্বনিরেখাচিত্র (isomorph) এবং সমশব্দসীমা (isogloss) দেখানো একান্তই প্রয়োজনীয়। আরও একটা কথা বলতে হবে। জেলা-উপভাষার আলোচনার সূত্রে প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির ভাষাচিত্র বা ভাষারূপের প্রতিও দৃষ্টিক্ষেপ করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দুটি জেলার প্রান্তীয় অঞ্চলে দুটি ভাষা প্রায়ই মিশে গিয়ে একটির বা অন্যটির প্রাধান্য দেখায় কিংবা মিশ্রণের ফলে একটা নতুন রূপ ফোটে। যে-কোনো উপভাষার আলোচনায় এই প্রাথমিক কথাগুলি স্মরণে রাখা চাই।

দুই

একসময় বাংলা ভাষার আলোচনায় আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ভাষার তুলনায় অর্থাৎ মান্য ভাষার তুলনায় নগণ্য বলে মনে করা হত। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের চর্চা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষাচর্চায় আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব যে সর্বৈব স্বীকৃত হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার সম্পর্কে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ চিত্র পেতে হলে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন। সুখের কথা বর্তমানে সেই চেষ্টা হয়ে চলেছে।

আঞ্চলিক ভাষার প্রতি ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন জেলার ভাষার আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভাষা সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলও বেড়েছে। এই প্রারম্ভিক কথাগুলি বলে নিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য,অর্থাৎ বর্ধমান জেলার ভাষা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বলতে চাই। এই নিবন্ধে বর্ধমান জেলার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আঞ্চলিক ভাষায় সংস্পর্শ-প্রভাব যে কতদূর ক্রিয়াশীল তা যে-কোনো একটি জেলার ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায়। একটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি যে পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব বহন করে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে বর্ধমান জেলার ভাষায়। বর্ধমানের ভাষায় হুগলি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রভাব নৈকট্য-জনিত এবং কাজে-কাজেই সংস্পর্শ-জনিত।

যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য সন্ধানে বা আঞ্চলিক ভাষার চরিত্র বিশ্লেষণে আগ্রহী তাঁদের কাছে বর্ধমানের ভাষা একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই ভাষায় রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্ধমান জেলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য শুধু তার ধ্বনিতত্ত্বে নয়,এই ভাষার বৈশিষ্ট্য তার শব্দভাণ্ডারে, রূপতত্ত্বে, বাক্যরীতিতে। বর্ধমান জেলার শব্দগত বৈশিষ্ট্য ও বাক্যপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কেননা এতে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যাকে এক আঁচড়েই বর্ধমানের ভাষার লক্ষণ বলে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করা যায়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও বর্ধমানের ভাষার শব্দবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা, তথাপি এই ভাষার ধ্বনিগত লক্ষণগুলির দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করা সমীচীন বলে মনে করি।

তিন

কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে বর্ধমানের উপভাষার এলাকাগত পরিচয়।১৯০৩সালে প্রকাশিত জর্জ গ্রিয়ারসনের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পঞ্চম খণ্ডে বাংলা উপভাষার একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসনের আগে এভাবে বাংলা উপভাষার বর্ণনা কেউ দেননি। তিনি মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে বাংলার চল্লিশটি উপভাষাকে ভাগ করেছেন। সেই চারটি হল পশ্চিমা বা western, পূর্বী বা eastern, দক্ষিণ-পশ্চিম বা south-western এবং কেন্দ্রীয় বা central. অবশ্য কেন্দ্রীয় বলতে তিনি বুঝেছেন মান্য কথ্য ভাষাকে। গ্রিয়ারসন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করেননি। কেবল উপভাষাগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত অনেকেই বাংলা উপভাষার বর্গীকরণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বর্গীকরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সর্বজনগ্রাহ্য বর্গীকরণ পাওয়া না গেলেও, বাংলার উপভাষার চালচিত্র এখন অনেকটাই স্পষ্ট। সুকুমার সেনের বর্গীকরণই তুলনামূলকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি 'স্থূল বিবেচনায়' বাংলা উপভাষাকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—

১. রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা)

২. ঝাড়খণ্ডি (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা)

৩. বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)

৪. বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ববঙ্গের উপভাষা)

৫. কামরূপী (উত্তর - পূর্ববঙ্গের উপভাষা)

সুকুমার সেনের এই পাঁচটি থেকে ঝাড়খণ্ডিকে অনায়াসে রাঢ়ীর একটি উপবিভাগ বলে ধরে নিতে পারি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে চারটি গুচ্ছ। আর তার প্রথমটি অর্থাৎ রাঢ়ী উপভাষাই উপস্থিত আমাদের বিবেচ্য। বর্ধমানের উপভাষা এই রাঢ়ীর মধ্যেই পড়ে।

তবে এভাবে ভাগ করার সময় 'স্থূল বিবেচনা' কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা, অনেকেই নিশ্চয় জানেন, রাঢ়ীর অন্তর্গত কোনো-কোনো উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী ও কামরূপীর কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক নৈকট্যই এর কারণ। মধ্য বর্ধমানের ভাষার সঙ্গে পশ্চিম বীরভূমের ভাষার তফাত বেশ লক্ষ করবার মতো। আবার বর্ধমানের মৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি এলাকার ভাষায় বাঁকুড়ার ভাষার মিশেল বা প্রভাব বেশ স্পষ্ট। অন্য দিকে, বর্ধমানের কেতুগ্রাম, মাঝিগ্রাম, রামজীবনপুর প্রভৃতি এলাকার ভাষায় বীরভূমের ভাষার ছাপ বেশ স্পষ্ট। এও সেই নৈকট্যেরই জন্য। কোনো দুটি অঞ্চল যতই নিকটবর্তী হবে, তাদের ভাষার সাদৃশ্য ততই বেশি হবে; দুটি অঞ্চল পরস্পরের যতই দূরবর্তী হবে, ততই তাদের ভাষার পার্থক্য বেশি হবে।

চার

বর্ধমানের ভাষার অন্যতম প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ স্বরসংগতি। সিদ্ধ-সেদ্ধ, কৃপণ-কেপ্পন, চৈত্র - চোত্, বিলাত -বিলেত্, উড়ানি - উড়ুনি, দেশি -দিশি। এই সব দৃষ্টান্ত যে বর্ধমানের ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ তা মনে করার কারণ নেই। কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং অন্য কোনো-কোনো আঞ্চলিক ভাষায়ও অনুরূপ স্বরসংগতি লক্ষ করা যায়। অন্ত্য মহাপ্রাণহীনতা বর্ধমানের ভাষার তথা রাঢ়ী উপভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দুধ-দুদ, শাঁখ-শাঁক্ এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বরভক্তির উল্লেখ করতে হয়। শব্দের আদিতে বা মধ্যে যুক্ত-ব্যঞ্জন থাকলে সেই ব্যঞ্জনদুটির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জন দুটিকে আলাদা করে দেয়। গ্রাম-গেরাম্, প্রথম - পের্থোম্, শুক্র- শুক্কুর, ক্রমে -কের্মে, ব্লু -বুলু, ক্লাব-কেলাব্। উচ্চারণে স্বরভক্তি আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা। সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভৃতি উৎস থেকে প্রচুর যুক্তব্যঞ্জনের শব্দ বাঙালিকে ব্যবহার করতেই হয়। সেইসব যুক্তব্যঞ্জনকে সরল করে নেওয়ার নানান প্রক্রিয়ার অন্যতম হল স্বরভক্তি। ঘোষীভবন বর্ধমানের ভাষার আর একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এর দৃষ্টান্ত শাক-শাগ্, কাক -কাগ্। পঞ্চমত, নিম্নমধ্য অ্যা - ধ্বনির উচ্চমধ্য এ- ধ্বনিতে রূপান্তর—এগারো, বেলা, মেলা, খেলা, এইসব শব্দের মান্য উচ্চারণ যদিও অ্যাগারো, ব্যালা, ম্যালা ও খ্যালা। বর্ধমানে এগুলির এ উচ্চারণই দস্তুর। ষষ্ঠত, শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ঝোঁক এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্ধমানে অত্যন্ত প্রকট - বাবা -বাব্বা, মেলা - মেল্লা, খেলা -খেল্লা, ব্যাপার - বেপ্পার ইত্যাদি। সপ্তমত, একাক্ষর বা এক সিলেবলযুক্ত শব্দের শেষে ম্ ধ্বনি থাকলে আদ্য নিহিত অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। গম - গোম্, দম -দোম্। এছাড়া অন্যান্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে নাসিক্যীভবন - গোড়া-গোঁড়া, হাসপাতাল - হাঁশ্পাতাল্; ন্ - ধ্বনির ল্ ধ্বনিতে রূপান্তর - নোটিশ - লুটিস্, নোট -লোট্,

নেওয়া, নিতে -লেয়া, লিতে, নবান-লবান্ প্রভৃতি; শব্দের আদ্য অ এবং ও ধ্বনির র্ ধ্বনিতে রূপান্তর - অঞ্জন - রন্‌জোন, ওজন - রোজোন্; মধ্য ব্যঞ্জনলোপ - তুলসী - তুলোশি, দরজা - দরোজা।

কয়েকটি বাক্য নিয়ে উদাহরণ দিয়ে এই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো যায় - ১) এত্তো রেতে কোতা যেচিস? ২) ওমনিই যেইতে মোন হোইলো তাই যেচি। ক্যানে, তুমি যাবা আমার সঙ্গে? ৩) মোন হোইল, লয়? যা ক্যানে, বুজবি মজ্জা। ৪) তুমি ঘরে দোর এঁইটে ঘুমোও গা। আম চল্‌লাম। ৫) কাইল কাঁটোয়া জাব্‌বো লব্‌বানের বাজার কইর্‌তে।

এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসি। বর্ধমানের ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক ও শব্দ প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই অঞ্চলের ভাষার প্রকৃত চরিত্র-লক্ষণ সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথমত, কর্ম-বিভক্তি 'দিগকে' বর্ধমানে 'দিগে' তে পরিণত হয়। আমাদিগে, তাদিগে, ছেলেদিগে। একে আমরা রাঢ়ী উপভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, সকর্মক ও অকর্মক দু-রকম ক্রিয়াপদেই প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনের সাধারণ অতীতকালে - ল বিভক্তির বদলে - লে বিভক্তির ব্যবহার বর্ধমানের স্বাভাবিক প্রবণতা। দুধটা কে খেলে? সে বললে ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি মান্য ভাষার 'বলল', 'খেল' প্রভৃতিও ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রধানত বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির প্রভাবে এবং অনেকাংশে শিক্ষারও প্রভাবে। তৃতীয়ত, ক্রিয়াপদের খেসে (খা + এসে), খাওসে (খাও +এসে) দেখসে (দেখ + এসে) ইত্যাদি রূপ বর্ধমানের উত্তরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। আবার যাচ্ছি, যাচ্ছে, খাচ্ছি, খাচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়ারূপে যুক্তব্যঞ্জনের লোপও লক্ষণীয় - যেচি, যেচে, খেচি, খেচে। চতুর্থত, তুই এর বদলে তু, এবং সম্বোধনে এই এর বদলে এ (এ মানিক, শোন্‌সে, কাগজটা লিয়ে যা) বর্ধমানের বিশেষ প্রবণতা।

ছয়

বর্ধমানের ভাষার শব্দভাণ্ডার একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই জেলার ভাষায় এমন বহু বহু শব্দ আছে যেগুলি মূলত আঞ্চলিক শব্দ হিসাবেই চিহ্নিত। সেইসব শব্দ অবশ্য পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো-কোনো জেলায়ও ব্যবহৃত হয়। এমন বহু শব্দও আছে যেগুলি নিতান্তই বর্ধমানের নিজস্ব শব্দ। অন্যত্র সেই শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, তবে ধরে নিতে হবে যে সেগুলি বর্ধমান থেকেই অন্যত্র গেছে। আবার এমন শব্দও আছে যেগুলি মান্য ভাষারই অনুরূপ। যে-কোনো আঞ্চলিক ভাষার শব্দের বেলায়ও যেমন, বর্ধমানের ভাষার শব্দকেও আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি - (ক) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যাদের অর্থও অনুরূপ, (খ) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যেগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং (গ) সম্পুর্ণ ভিন্ন শব্দ।

আমাদের এই আলোচনায় 'ক' শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মা, ভাই, ভাত, মাছ, দুধ, কলা,মাঠ, ঘাট, ফল, আম, দেখা লাঠি প্রভৃতি অজস্র শব্দ এই শ্রেণিতে পড়ে।

'খ' শ্রেণিভুক্ত কিছু শব্দ আমরা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করছি। 'দিন' শব্দটি বর্ধমানে ক্রিয়াবিশেষণে প্রতিদিন অর্থেও ব্যবহৃত হয়—আমি দিন তার বাড়ি যাই। অনুরূপ

আর একটি শব্দ 'প্রায়'। বর্ধমানে প্রায়ই অর্থে প্রায় ব্যবহৃত হয়—সে প্রায় এখানে আসে। 'পালানো' শব্দটিকে বর্ধমানে সাধারণভাবে যাওয়া অর্থেই ব্যবহার করা হয়—অনেক বেলা হল, এবার পালাই গো। বর্ধমানে ভেজাল বা ভ্যাজাল শব্দটির অর্থ ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট, ভালো ভ্যাজাল হল দেখছি। বর্ধমানে ছেলে বলতে প্রায়ই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বোঝায়—ওগো ছেলে কোলে লাও।

'গ' শ্রেণিভুক্ত কিছু শব্দের উদাহরণও দেওয়া যাক। মুড়ি (নর্দমা), বোজা (আবর্জনা), সপ (মাদুর), ঘসি (ঘুঁটে), পারা(মতো), ভিচিকিচি (ঝামেলা), কম্‌নে (কোনদিকে), হোতা (ওখানে), খ্যাড় (খড়), পঁইঠে (সিঁড়ি), অঘোর (অলস), আজল (বোকা), খিটকাল (কেলেঙ্কারি; ঝামেলা) ইত্যাদি। এই নিবন্ধে বর্ধমানের শব্দ সংকলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল বর্ধমানের ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চাই। তাই আপাতত কতকগুলো শব্দের উল্লেখ করা হল মাত্র।

এবারে বর্ধমানের শব্দপ্রয়োগের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক। বর্ধমানে জমি অর্থে জায়গা শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয়—জায়গা কিনে ঘর করব। আবার বাড়ি অর্থে ঘর শব্দটিও যে প্রচলিত তা এই বাক্যটি থেকেই বোঝা যাবে। বৃষ্টি অর্থে জল—আজ জল হবে গো; শীত অর্থে ঠান্ডা, পাত্র অর্থে জায়গা—দুধের জায়গা দিন গো; ডগা অর্থে ডগ—লাউয়ের ডগ, নারকেল গাছের ডগ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানে নিকৃষ্ট বা inferior অর্থে 'কমা' শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়। শব্দটি আঞ্চলিক বটে, কিন্তু এতই কার্যকর ও যথাযথ যে এই শব্দটিকে মান্য ভাষার অভিধানে গ্রহণ করা যায় কি না তা আভিধানিকরা ভেবে দেখতে পারেন। নিপাত শব্দ হিসাবে 'দিয়ে' ও 'নিয়ে'র প্রয়োগ বর্ধমানে খুবই ব্যাপক। বর্ধমানে মনে হওয়া বা ইচ্ছা হওয়া অর্থে 'মন হওয়া' ব্যবহৃত হয় —মন হল তাই চলে এলুম। সম্বোধনে ওগো শব্দের আত্যন্তিক প্রয়োগ আমাদের কিছু উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। এছাড়া আদপে অর্থে মূলে— মূলে সে ভাতই খায় নাই, নেই বা-নি অর্থে নাই, জলখাবার অর্থে জল—অনুসর্গ হিসাবে লেগে শব্দের ব্যবহার— তোমার লেগে বসে আছি, পাগল ও পাগলি অর্থে খ্যাপা ও খেপি, প্রশ্ন করা অর্থে শুধানো—আমি জানিনা গো, ওকে শুধোও—প্রভৃতি বর্ধমানের বিশেষত্ব।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের কিছু ইডিয়ম বা বাগ্‌ধারার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষার বহু বাগ্‌ধারাই আসলে আঞ্চলিক ভাষার অন্তর্গত। পৌনঃপুনিক ও ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আঞ্চলিক প্রয়োগ মান্য ভাষার শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে যায়। বর্ধমানের বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও পৃথকভাবে সংকলনযোগ্য। আপাতত আমরা কয়েকটির উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করছি— মালা ঘোরানো, কোনো ব্যাপার নয়, বাঁশবুকো (গালাগালিতে), আজলগোদা (গালাগালিতে), আদিঙ্গে, আঁচল চেলে, নামুনে (গালাগালিতে), কোনো সিন নাই, আবুজ আবজো।

মেয়েদের ভাষা, বাঙালি মেয়ের ভাষা

সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষের ভাষাব্যবহারে যথেষ্ট ভিন্নতা দেখা যায়। এবং সর্তক কানে সে-ভিন্নতা ধরাও পড়ে। ভাষাবিজ্ঞান, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সমাজভাষাবিজ্ঞান সেই ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করে, তার স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয় করে। নানা শ্রেণির মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় যে তারতম্য ঘটে তাকে সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেন দুই ভাবে, সেই তারতম্য বা তফাতকেও ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। এক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মানুষের ভাষিক তারতম্যের কারণকে social distance বা সামাজিক দূরত্ব বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নারী-পুরুষের ভাষার তফাত সামাজিক দূরত্বের কারণে ঘটে না। কেননা একই পরিবারের নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থান প্রায় অভিন্ন। অথচ সেই একই পরিবারের নারী-পুরুষের ভাষাও ভিন্নতা-চিহ্নিত হবেই। নারী-পুরুষের ভাষার তারতম্য সামাজিক ভিন্নতার (social difference) জন্যই ঘটে বলে মনে করা হয়। একই পরিবারভুক্ত নারী-পুরুষের ভাষার ভিন্নতার প্রকৃত কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর অবদমন। কোনো-কোনো ভাষায় ভিন্নতা তত বেশি নয়, আবার কোনো-কোনো ভাষায় ভিন্নতা খুবই বেশি। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ট্রাস্ক (R.L.Trask)দেখিয়েছেন যে, জাপানি ভাষায় নারীদের শব্দপ্রয়োগ পুরুষের শব্দ প্রয়োগের চাইতে অনেকটাই আলাদা। আবার আমেরিকার লুইসিয়ানা অঞ্চলের কোয়াসাতি ভাষায় মেয়েদের ব্যবহৃত কিছু শব্দের শেষাংশ (ending)পুরুষের ব্যবহৃত শব্দের শেষাংশ থেকে যে আলাদা হয়ে যায় তাও তিনি লক্ষ করেছেন। এমনকী, এই ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপেও স্ত্রী পুরুষভেদে তফাত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল বলেছেন যে, স্ত্রী পুরুষের ভাষাভেদ একরকম স্বাভাবিক ও অনিবার্য, আর সেই পার্থক্য প্রধানত উচ্চারণে হলেও শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য, উচ্ছ্বাসবাচক শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য, এসবও উপেক্ষণীয় নয়।

নারীপুরুষের ভাষার পার্থক্যের ব্যাপারটা পশ্চিমের ভাষাবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন প্রায় একশো বছর আগেই। অটো ইয়েসপেরসেন ও এডওয়ার্ড সাপির বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই নারীপুরুষের ভাষার পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। ইয়েসপেরসেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের রোমান রাজনীতিবিদ ও লেখক সিসেরোর রচনায় নারীপুরুষের ভাষার পার্থক্য লক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত নাটকের সংলাপে নারীর ভাষা আর পুরুষের ভাষা একরকম নয়। সংস্কৃত নাটকে নারীর মুখে অনেক সময়ই প্রাকৃত ভাষার সংলাপ বসানো হয়েছিল। কাজেই নারীর ভাষা যে পুরুষের ভাষার চেয়ে আলাদা তা স্বীকৃত এখন। কিন্তু কীসে আলাদা, কেনই-বা আলাদা? নারীপুরুষের ভাষার তফাতের কারণ কি শারীরবৃত্তীয়ই শুধু?

অথবা শুধুই কি ভাষাতাত্ত্বিক? তার কি অন্যবিধ কারণও আছে? আর সেই তফাতের প্রকাশই বা কেমন? অর্থাৎ নারীপুরুষের ভাষার পার্থক্যের স্বরূপ কী?

আমাদের ভাষায় আজ পর্যন্ত নারীর ভাষা নিয়ে কেবল দু-একজন কাজ করেছেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় সুকুমার সেনের Women's Dialect in Bengal নামে ছোটো একটি বই। তার এক বছর আগে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনিই লিখেছেন 'বাংলায় নারীর ভাষা' নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধ লিখেছেন নির্মল দাশও, তবে তাঁর বিষয় সামগ্রিকভাবে বাংলায় নারীর ভাষা নয়, তাঁর বিষয় ছিল কেবল উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা। ভাষায় লিঙ্গভেদের কারণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন মৃণাল নাথও তাঁর একটি গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ। 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা' নামে শর্মিলা বসু দত্তর যে-বইটি পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে বলা যেতে পারে বাংলায় লেখা বাঙালি নারীর ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক বিশ্লেষণ। এই বই লিখে অকালপ্রয়াত এই গবেষক একটা রীতিমতো দুরূহ কাজ করে ফেলেছেন।

'বাংলায় মেয়েদের ভাষা'-য় শর্মিলা বসু দত্ত ঠিক কী করেছেন বা বলেছেন সেটা দেখতে হলে তাঁর বইয়ের পরিকল্পনাটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। শর্মিলা তাঁর বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে। পরিবারের গঠন ও পারিবারিক সম্পর্ক প্রত্যাশিতভাবেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর আলোচনায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের জীবনে কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য বাধানিষেধ (constraints) থাকে। এই সামাজিক অবস্থান ও পুরুষনির্ভরতা তাদের ভাষাকে প্রভাবিত করে। স্ত্রীপুরুষের ভাষার পার্থক্যের শারীরবৃত্তীয় বা জৈবিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও ভিত্তির আলোচনা স্বাভাবতই এবং অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। এ ধরনের বইয়ে অন্য একটি প্রত্যাশিত প্রেক্ষাপটও থাকে। তা হল এদেশে ও বিদেশে পূর্ববর্তী লেখক ও গবেষকদের আলোনার মূল্যায়ন। শর্মিলা বসু দত্ত সপ্তদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মেয়েদের ভাষা নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। সে-আলোচনা সংক্ষিপ্ত বটে, তবে পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ফরাসি নাম Rochefort -এর উচ্চারণ রসর্ফোর্ট নয়, রশ্‌ফর্‌। এর পরে শর্মিলা বাংলায় নারীর ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এই বিশ্লেষণে শব্দব্যবহার, ধ্বনির ব্যবহার, বাক্যবিন্যাস, সবই আলোচিত হয়েছে। বাংলা প্রবাদপ্রবচনে মেয়েলিপনা,মেয়েদের ভাষায় ট্যাবু, মেয়েদের ব্রতকথা এবং মেয়েলি ছড়ার আলোচনাও এসেছে নিছক পার্শ্বিকভাবে নয়, একটা পুরো অধ্যায়ের বিষয় হিসেবে। সবশেষে আছে একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় — মেয়েদের গোপন ভাষা ও শরীরী ভাষার প্রয়োগ।

একটা সময় ছিল যখন উপভাষা কথাটি ভাষার আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক রকমফের বোঝাতে ব্যবহৃত হত। ক্রমে ভাষাবিজ্ঞানীরা এর অর্থকে প্রসারিত করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষাও উপভাষা হিসেবে স্বীকৃত এখন। সেদিক থেকে নারীর ভাষাও একটি অনাঞ্চলিক সমাজ-উপভাষা। আর সমাজ-উপভাষার চর্চা বা অনুসন্ধান সমাজভাষাবিজ্ঞানের (sociolinguistics) অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং নারীর ভাষাকে শর্মিলা বসু দত্ত সঠিকভাবেই দেখেছেন একটি সমাজ-উপভাষা হিসেবে। তাঁর বিশ্লেষণে তিনি ভাষাবিজ্ঞান ও

সমাজবিজ্ঞানকে মিলিয়ে দেখেছেন। নারীপুরুষের ভাষায় যে ভিন্নতা দেখা যায় তার কারণ সামাজিক, শারীরবৃত্তীয় এবং ভাষাতাত্ত্বিক তো বটেই। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মনস্তত্ত্বগত উপাদানও। আর এই সবকিছু মিলে তৈরি করে মেয়েদের ভাষাব্যবহারের বিশেষ চরিত্রকে। প্রায় প্রত্যেক সমাজে শিশুকাল থেকে এমন কিছু ধারণা ও শিক্ষা মেয়েদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যার প্রকাশ ঘটে পরিণত বয়সে তাদের বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গিতে। নারীর ভাষার কোমলতা, আবেগপ্রবণতা, সলজ্জ ভঙ্গি, সবকিছুরই উৎস আছে এইরকম সামাজিক ভাবনাচিন্তায় এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। ভাষায় লিঙ্গভেদের এসব কারণের কথা বলেছেন ইয়েসপেরসেন, ল্যাকফ, মেকলি, এবং বলেছেন ডেবোরা ক্যামেরন-এর মতো ভাষাবিজ্ঞানীরা। এবং বলেছেন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনও।

কেবল নারীপুরুষের ভাষার বিভিন্নতার কারণগুলো অনুসন্ধান করা এবং ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট হতে পারে না। তাতে নারীর ভাষার একটা খণ্ডিত ও আংশিক চিত্র পাওয়া যায় মাত্র। দেখা দরকার নারীর ভাষার সম্পূর্ণ চালচিত্রটাকে। নারীর ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং নারীর শব্দব্যবহারের বিশেষত্বও খতিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার নারীর ভাষাব্যবহারে আর কী কী এমন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য নারীর ভাষা এমন বিশিষ্ট। অর্থাৎ নারী কীভাবে ভাষা ব্যবহার করে, কী ভাষা ব্যবহার করে তা দেখতে হবে। সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষার প্রভেদ হয়। নারীর ক্ষেত্রেও তা হতে বাধ্য। শিক্ষা ও অশিক্ষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর ভাষাব্যবহারের সেই দিকগুলি শর্মিলা কীভাবে দেখেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেটাও বুঝে নেওয়া দরকার।

শর্মিলা বসু দত্ত বাঙালি মেয়েদের ভাষা নিয়ে তাঁর গবেষণার বিষয়টির প্রায় সমস্ত দিকই উন্মোচিত করেছেন। মেয়েদের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তিনি যথেষ্ট মুনাশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়টি সহজ নয়। অথচ শর্মিলা তাঁর অনতিদীর্ঘ অধ্যায়ে বিষয়টিকে প্রায় তার সমগ্রতায় ধরতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনা স্বচ্ছ ও ভারবর্জিত। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যক্তিতা ও মানসপ্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনি ব্যবহার করেন নারীরা। আবার একথাও তাঁরা বলেন যে, ধ্বনি-উচ্চারণের কৌশল ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা রপ্ত করে তাড়াতাড়ি। এরও আছে শারীরবৃত্তীয় কারণ। দেখা গেছে, অল্প বয়সে মেয়েদের বাগ্‌যন্ত্র দ্রুত পরিণতি লাভ করে। মেয়েদের গলার আওয়াজের উচ্চতা,তীক্ষ্মতা, স্বরতন্ত্রীর কম্পন, ধ্বনিদ্বারের কম্পন, এসবও এসেছে আলোচনায়। এই প্রেক্ষাপটে লেখিকা আলোচনা করেছেন বাঙালি মেয়েদের ধ্বনি-উচ্চারণের প্রসঙ্গটি। তিনি দেখিয়েছেন এক-একটা শব্দ বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের মেয়েরা কীভাবে উচ্চারণ করেন। উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন প্রাত্যহিক জীবন থেকে এবং সাহিত্য থেকে। বাঙালি মেয়েদের, বিশেষত শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মেয়েদের উচ্চারণে উষ্ম-তালব্য (fricative palatal) শ্‌ ধ্বনিটির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। লেখিকা তারও উল্লেখ করেছেন।

নারীর ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোনো সহজ ব্যাপার নয়। একথা ঠিক যে, ধ্বনি-উচ্চারণের প্রক্রিয়া, রূপতত্ত্বগত অনুসন্ধান বাক্যবিন্যাসের রীতিপ্রকৃতি— এই তিনটি বিষয় নিয়েই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার বৃত্ত, মূলত। কিন্তু এর মধ্যেও আছে কিছু জটিল বিষয়।

এখানেও সক্রিয় কিছু সামাজিক ও শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার। নারীর শব্দভাণ্ডার কেন পুরুষের শব্দভাণ্ডারের চাইতে সীমিত? কেন নারীর ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি সংরক্ষণশীল? কোনো এক আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের অনুসরণে বলা কি যায় এ কথা যে, এ সবের কারণ 'relative isolation of the sexes'? এই অতিসরলীকরণ এ কালের অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক নিশ্চয় মেনে নেবেন না। কেননা, প্রাচীন ও জনজাতীয় সমাজ সম্পর্কে এই উক্তি অনেকটা খাটলেও খাটবে না আধুনিক শিক্ষিত এবং এমনকী মাঝারি-শিক্ষিত নারীসমাজ সম্পর্কে।

শব্দব্যবহারের আলোচনায় লেখিকা দেখিয়েছেন আত্মীয়বাচক শব্দ বাঙালি মেয়েরা কতদূর ও কীভাবে ব্যবহার করেন। এ ছাড়া মেয়েদের ভাষায় বাক্যালংকার-জাতীয় শব্দের বহুলব্যবহার, 'শিশু-অভিমুখী অনুকরণবাচক' শব্দের ব্যবহার, আতিশয্যবাচক শব্দের ব্যবহার, উচ্ছ্বাসধর্মী(exclamatory) শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, নামবিকল্পন, নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহারের নানান মাত্রা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। বাংলায় কিছু শব্দ যে কেবল মেয়েদের মুখেই শোনা যায়, ছেলেদের পক্ষে সেগুলির ব্যবহার যে রীতিমতো অস্বাভাবিক, তা দেখিয়েছেন লেখিকা। এমনকী অবধারণবাচক কিছু শব্দও পুরুষের চাইতে নারীই বেশি ব্যবহার করেন। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বাঙালি মেয়েদের ব্যবহৃত নানা ধরনের একশো কুড়িটির মতো বিশেষার্থক শব্দের একটি তালিকাও পেশ করা হয়েছে।

বাংলায় নারীপুরুষের ভাষায় বাক্যবিন্যাসগত পার্থক্যও আছে। সাধারণভাবে একথা প্রায় সব সমাজভাষাবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন যে, নারীর ভাষাব্যবহার পুরুষের তুলনায় বেশি মার্জিত। নারীর ভাষায় সামজিক সম্ভ্রমবাচক বাক্য বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এও ঠিক যে, ঘরোয়া পরিবেশে নারী অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সেখানে তার ভাষাভঙ্গি অনাচারিক, খোলামেলা। পোশাকি পরিবেশে নারী স্বাভাবতই অনেক বেশি সচেতন, সতর্ক। ফলে সাধারণভাবে ঘরের বাইরের ফরমাল পরিবেশে নারীর ভাষা অনেক বেশি কুণ্ঠাচিহ্নিত। রবিন ল্যাকফ (Robin Lakoff) বলেছেন যে নারীর ভাষা 'more hesitant, less confident', আর তার কারণ সমাজে নারীর 'subordinate position'. মেয়েদের ভাষায় লগ্নপ্রশ্ন বা tag-question একটু বেশিই ব্যবহৃত হয়। যদিও দুবোয়া ও ক্রাউচ (B.L. Dubois ও I Crouch) এর মতে লগ্নপ্রশ্ন পুরুষেরাই বেশি ব্যবহার করে। লেখিকা দেখিয়েছেন বাঙালি মেয়েরা কেমন লগ্নপ্রশ্ন ব্যবহার করেন। আরও দেখিয়েছেন মেয়েদের ভাষায় ব্যবহৃত অনুরোধসূচক ভাষাভঙ্গি, সম্ভ্রমবাচক (হয়তো, খুব সম্ভব, বোধ হয়) শব্দাবলির ব্যবহার। বাঙালি মেয়েদের ভাষায় ব্যবহৃত হয় কিছু বিশেষ সম্বোধন। মেয়েরা পরোক্ষ বাক্যও বেশি ব্যবহার করে। এ সবই লেখিকা দেখিয়েছেন তাঁর বিশ্লেষণে। এখানে লেখিকা একটু যেন গতানুগতিক পথে হেঁটেছেন। তা ছাড়া এই বিষয়ে সম্প্রতিকালে সমাজবিজ্ঞানীরা যেভাবে ভাবেন, নারীবাদীরা সেভাবে দেখেন না। শর্মিলা বসু দত্তের বিশ্লেষণ এখানে এই বিষয়টাকে স্পর্শ করেনি।

সকলেই জানেন, প্রবাদ প্রবচন বেশি ব্যবহার করার একটা প্রবণতা আছে মেয়েদের। লেখিকা তা স্পষ্টই বলেছেন, কিন্তু কেন এই প্রবণতা তা অনুসন্ধান ততটা করেননি। তিনি বরং লক্ষ করেছেন বিশেষ কিছু প্রবাদ ও বাগ্‌ধারা মেয়েরা যত ব্যবহার করেন, পুরুষেরা তত করেন না। প্রবাদের আছে নানা রকমফের। সাহিত্যিক প্রবাদ, লৌকিক প্রবাদ, এক বা একাধিক

বাক্যের প্রবাদ। আবার খণ্ডবাক্যের প্রবাদও অপ্রতুল নয়। প্রবাদ অধিকাংশত পদ্যছন্দে গ্রথিত সমিল নির্মাণ। মাঝারি শিক্ষিত ও অপরিশীলিত রুচির মেয়েদের সাহিত্যিক প্রবাদ কমই ব্যবহার করবার কথা। খণ্ডবাক্য, একবাক্য বা একাধিক বাক্য যা-ই হোক না কেন, লৌকিক প্রবাদেই মেয়েদের স্ফূর্তি বেশি। সুশীলকুমার দে-র অবিস্মরণীয় 'বাংলা প্রবাদ'-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদচর্চা শেষ হয়ে যায়নি। বরং সে-চর্চা এগিয়ে চলেছে। মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, কাজী দীন মহম্মদ, বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, গোপাল দাস চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখের রচনা ও গবেষণা প্রমাণ করেছে যে দুই বাংলাতেই এই চর্চা চলেছে, চলেছে পশ্চিমি দেশগুলিতেও। শর্মিলা বসু দত্ত আলোচনা করেছেন মেয়েদের মুখে কীভাবে আসে প্রবাদ, কোন ধরনের প্রবাদ শোনা যায় বেশি, আর কেনই বা। নারীর সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী মা, মেয়ে, বধূ, শাশুড়ি, বিমাতা ও সতিন বিষয়ক লৌকিক প্রবাদ কেন মেয়েরা ব্যবহার করেন তা নিয়ে তাঁর আলোচনা মন্দ নয়। মেয়েরাই বেশি ব্যবহার করেন এমন বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ভঙ্গির কয়েকশো প্রবাদের একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছেন তিনি। আমরা জানি বয়স্ক মহিলা ও গ্রামের মেয়েরা তাঁদের প্রতিদিনের আলাপে বহু লৌকিক ও গ্রাম্য ধরনের বাগ্‌ধারা ব্যবহার করে থাকেন। কিছু বাগ্‌ধারা তো এমনও আছে যেগুলি মেয়েদের মুখেই মানায়। আমাদের সাহিত্যেও আছে তার পরিচয়। লেখিকা নারীর ব্যবহৃত বিশেষার্থক বাক্যখণ্ড ও বাগ্‌ধারার আলোচনায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই বইয়ের শেষের দিকে দুটি অধ্যায়ে মেয়েদের ব্রতকথা ও মেয়েলি ছড়ার আলোচনা আছে। সে- আলোচনায় অবশ্য বিশ্লেষণের চেয়ে তথ্যের সংকলনই বেশি দেখা যাচ্ছে। একটি পরিচ্ছেদে ট্যাবু বা নিষিদ্ধ শব্দের ব্যবহার নিয়েও আলোচনা করেছেন লেখিকা। সে-আলোচনায় ট্যাবুর, বিশেষত মেয়েদের প্রসঙ্গে ট্যাবুর, সমস্ত দিক উন্মোচিত হয়নি। মেয়েদের গোপন ভাষা ও শরীরী ভাষায় প্রয়োগও আলোচিত হয়েছে একটি অধ্যায়ে। এই আলোচনায় অবশ্য তাত্ত্বিক দিক হাজির করার চেয়ে দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্তে বিষয়টাকে স্পর্শগ্রাহ্য করবার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি দেখে বোঝা যাচ্ছে লেখিকা এ বিষয়টিকে সমগ্রভাবে ধরবার জন্য বেশকিছু বই পাঠ করেছেন। তবে, দুটি ছাড়া বাকি বই, বিশেষত ইংরেজিতে লেখা বই, পুরোনো, ফলে তাতে নতুন চিন্তা ততটা পাওয়া যায় না। দুখানি বইয়ের কথা বলা যেতে পারে যে দুটিতে এ বিষয়ে প্রচুর নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত। বইদুটি হল P.M. Smith এর Language, the Sexes and Society (Oxford, Blackwell, 1985) এবং B.Thorne, C. Kramarae & N Henley (eds.) সম্পাদিত Language, Gender and Society (Rowley,Mass. 1983)

কিছু কিছু খামতি যে নেই তা নয়। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলায় মেয়েদের ভাষা নিয়ে শর্মিলা বসু দত্ত যে-কাজ করেছেন তা মূল্যবান এবং পাঠযোগ্য। অজস্র ছাপার ভুলের জন্য এ-বইয়ের পাঠককে প্রায়ই থমকে যেতে হয় বটে, তবে লেখিকার নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচয় পেয়ে সেই ত্রুটিকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে।

ভাষাপ্রেম ও ভাষাবিরোধের প্রসঙ্গ

ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান একটা টেকনিকাল বিষয়। এই বিষয়টিকে বুঝতে হলে প্রথাগত শিক্ষা কিংবা নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় পঠন একান্তই জরুরি। এই বিষয়ে বাংলায় যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কেবল গবেষণামূলক রচনাই লেখেন, তাঁদের রচিত সন্দর্ভ সাধারণ শিক্ষিত (এমনকী উচ্চশিক্ষিত) পাঠকদের জন্যও উদ্দিষ্ট নয় বলেই মনে হয়। অন্য দিকে কয়েকজন আছেন বা ছিলেন যাঁদের রচনা যথেষ্ট তত্ত্বসেবিত হওয়া সত্ত্বেও রচনাগুণে এমন শিক্ষিত পাঠকেরও বোধ্য হয়ে ওঠে, যে-পাঠকেরা প্রথাগত ভাবে ভাষাতত্ত্বের ছাত্র নন। এই দ্বিতীয় ধারার ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন এবং পবিত্র সরকারের নাম করতে হবে। আবার কেউ-কেউ প্রথাগতভাবে ভাষাতাত্ত্বিক না হয়েও পঠনগুণে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। তেমন একজন শিশিরকুমার দাশ। যাঁদের নাম করেছি তাঁদের মধ্যে একমাত্র পবিত্র সরকারই বিপুলভাবে সক্রিয়। তাঁর লেখনী বিপুলভাবে সচল। পবিত্র সরকারের রচনা সুগম ও সুবোধ্য অথচ তরল নয়। তত্ত্বকথাও তিনি পাঠককে ধরিয়ে দেন অনায়াসে। এই কারণে তাঁর যাবতীয় রচনা বা ভাষাসংক্রান্ত যে-কোনো বই-ই সমস্ত শিক্ষিত পাঠকের কাছে কৌতূহলের বিষয়। ভাষা ও সমাজ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধসংকলন 'ভাষা দেশ কাল' প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। 'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ' নামে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আর একটি প্রবন্ধ সংকলন।

পাঠক লক্ষ করবেন কোনো-কোনো দিক থেকে ওই প্রথম আর দ্বিতীয় বইয়ের মধ্যে বিষয়গত মিল ছাড়াও আছে পদ্ধতিগত মিল। দুটি বইয়েই সরাসরি সমাজ নিয়ে কিংবা সরাসরি ভাষা নিয়ে রচিত নিবন্ধের সংখ্যা তিনটি বা চারটি হলেও পার্শ্বিকভাবে ও-দুটি বিষয়কে ছুঁয়ে যায় এমন রচনা বলতে গেলে সবকটিই। দুটি বইয়ের মধ্যে বিষয়গত ও চরিত্রগত মিল যে রয়েছে তার আরও প্রমাণ প্রথম বইয়ে ভুক্ত 'বাংলা ভাষা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ' নিবন্ধটি সেই বই থেকে বাদ দিয়ে নতুন বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এর কারণ হিসেবে লেখক নিজেই বলেছেন — "তা ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধের প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে বিষয়গতভাবে ঘনিষ্ঠ।" এই প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসব আমরা।

'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ' এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ এবং তার নামেই বইয়ের নাম। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি এটি এই বইয়ের কেন্দ্রীয় নিবন্ধ। ভাষা সম্বন্ধে আত্মচেতনা কী, এই প্রশ্নটাই এ-প্রসঙ্গে প্রথম উঠে পড়ে। এর একটা সহজ উত্তর এই যে, যদি ভাষা বস্তুটা সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র ভাবিত হই, তার সংগঠন কেমন, তার কাজ কী, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে তার ভূমিকা কী, অন্য আর-পাঁচটা ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার সম্পর্ক বা কী,

এসব চিন্তা যদি আমাদের মধ্যে জাগে, আর যদি কখনো-সখনো আমরা তার উত্তর খুঁজতেও প্রবৃত্ত হই, তাহলেই বলা যাবে ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আত্মচেতনা আছে। আত্মচেতনা বিশেষভাবে জাগে যখন আমাদের ভাষা অন্য কোনো ভাষার সংস্পর্শে আসে। একইভাবে, ভাষাপ্রেম জাগে যখন ভাষা আহত হয়। আর আহত হলে যে বা যারা আঘাত করে তার বা তাদের প্রতি বিরোধ সঞ্জাত হয়। তাই লেখক বলেছেন ভাষাপ্রেম থেকেই অনেক সময় ভাষাবিরোধের সৃষ্টি হয়।

ভাষাপ্রেমের প্রসঙ্গে এসেছে ভাষার আলোচনায় সাহিত্যের মূল্যের প্রসঙ্গ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সাহিত্য এবং লিখিত ভাষাকে তত আমল দেওয়া হয় না। পবিত্র সরকার ভাষাবিজ্ঞানে দীক্ষিত হয়েও সাহিত্যের মূল্য অস্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন, ভাষাবিজ্ঞানীরা যা-ই বলুন, সাহিত্য যেহেতু "ভাষারই একটা বিশেষ প্রকাশ, এবং ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের নানা ধরনের সুখদুঃখের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা উপহার দেয়", তাই সাহিত্য হয়ে ওঠে ভাষাকে ভালোবাসার একটা ভিত্তি। (পৃ ১৬) ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা মূলত ধ্বনি নিয়ে, ধ্বনিখণ্ড নিয়ে, ধ্বনির সংগঠন সংস্থান ও সমবায় নিয়ে। তাই পবিত্র যখন কথাগুলো বলেন তখন আমরা যুগপৎ চমকিত ও উৎসাহিত হই। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানী যে ঠিক এইরকম কথাই বলেছেন তা আমাদের অজানা নয়। সম্ভবত এসব নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। মনে পড়ে যায় প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টালের মন্তব্য। কেমব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ল্যাংগোয়েজের একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন ভাষার আলোচনায় সাহিত্য অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। অর্থাৎ মুখের ভাষার পাশাপাশি লিখিত ভাষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

এই বইয়ের ভূমিকায় পবিত্র সরকার যা বলেছেন তাতে মনে হয় তিনি নিজে মনে করেন বইটির কেন্দ্রীয় নিবন্ধ 'বাংলাভাষা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ'। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার নিবন্ধ। এই নিবন্ধটি লেখকের 'ভাষা দেশ কাল' বইয়ের প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সেখান থেকে তুলে এনে এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাকে। বহুপ্রসারী উপন্যাসে যেমন থাকে নানান ঘটনার নানান আখ্যানখণ্ডের বয়ন, তেমনই এই দীর্ঘ নিবন্ধেও আলোচিত হয়েছে নানান বিষয়। বাংলা ভাষাই যদিও ওই নিবন্ধের ভিত্তি এবং কেন্দ্র, তবে পার্শ্বিকভাবে এসেছে আরও নানা বিষয়, নানা সূত্র, নানা উল্লেখ। পাকিস্তানের শাসনে পূর্ববঙ্গের তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা পরিস্থিতি, স্বাধীন বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি, জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার হিসেবে বাংলা ভাষার ভূমিকা, ইসলামি বা মুসলমানি বাংলার লক্ষণ ও চরিত্র, হিন্দুয়ানি বাংলা আর ইসলামি বাংলার সংঘাত-সংস্পর্শ, বাঙালি মুসলমানের ভাষাদ্বন্দ্ব, মাতৃভাষার স্বরূপ— এমন আরও নানান বিষয় আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

পূর্ব পাকিস্তান পর্বের ও বাংলাদেশ পর্বের ভাষা-আন্দোলনের আলোচনায় সচরাচর বাংলা ভাষার সমর্থকদের মাতৃভাষাপ্রেম এবং সেই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল তার বৃত্তান্তই গুরুত্ব পায়। পবিত্র সরকার সেই গতানুগতিক আলোচনার ধারাকে অনুসরণ করেননি। তিনি বিষয়টাকে স্থাপন করেছেন একটা বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। তাঁর আলোচনায় ভাষা যত গুরুত্ব পেয়েছে, ততটাই গুরুত্ব পেয়েছে সমাজনীতি রাজনীতি এবং

ভাষার ধর্মীয় চরিত্র। তাঁর আলোচনা থেকে বুঝতে পারি কত জটিল বিষয়টা, বুঝতে পারি, কতখানি বিমিশ্র তার চরিত্র। আরও যে কথাটা বলবার তা এই যে, রচনাটি প্রথম পাঠের হুবহু উৎকলন নয়। এটি কিয়দংশে পুনর্লিখিত এবং বহুলাংশে পরিমার্জিত। পাঠক লক্ষ করবেন প্রথম যখন এটি প্রকাশিত হয় তখন টীকা ও উৎসনির্দেশে ছিল ১২৬টি তথ্যসূত্র। আর এই নতুন চেহারায় সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪১।

বাঙালি মুসলমানের ভাষাদ্বন্দ্ব নিয়ে মুসলমান লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও কিছু কম ভাবেননি। বিশেষত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (সওগাত, বৈশাখ ১৩৩৬,) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন' (সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), সৈয়দ এমদাদ আলীর 'বাংলা ভাষা ও মুসলমান' (মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৪) প্রভৃতি রচনাই বলে দেবে যে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এ নিয়ে কতটা ভাবিত ছিলেন। এসব রচনার একখানা সংকলনও প্রস্তুত হয়েছে ঢাকায় ১৯৯১ সালে। আরও পরে মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল ফজল প্রমুখও এ নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু এসব রচনায় সাহিত্যিকদের ভাষামাধ্যমের দ্বন্দ্বসংকটের কথাই কেবল বলা হয়েছে। এঁরা উর্দুর বিরোধিতায় অকপট এবং সরব, ইসলামি বাংলার সপক্ষতাও করেননি। তাঁরা মূলত চেয়েছিলেন ইসলামি বাংলা ও হিন্দুয়ানি বাংলা এই দুটিকেই এড়িয়ে সাহিত্য রচনা করতে। পবিত্র সরকার মুসলমানের ভাষাদ্বন্দ্বের এই চেহারাটা চমৎকার দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কেবল ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমস্যার ভাষাতাত্ত্বিক দিক ছাড়াও যে ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক দিক আছে সেটাও যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

কিছুটা ওই নিবন্ধেরই 'পরিপূরক' হিসেবে দেখা যেতে পারে 'মান্য চলিত বাংলা ও বাংলাদেশ' রচনাটিকে। যাকে মান্য চলিত বাংলা বা standard colloquial Bengali বলি তা হল সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালির সাধারণ শিষ্ট কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে একই মান্য চলিত ভাষা বা মা-চ-বা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলা হয় প্রত্যেক জেলার বাঙালিকেই তা আয়ত্ত করতে হয়। এবং আরও কথা এই যে, সেই ভাষারও একটা ভৌগোলিক ভিত্তি আছে। কলকাতা, হুগলি, আর নদিয়ার ভাষার মিশেল নিয়েই তৈরি মা-চ-বা। তবে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যে একটা তফাত লক্ষ করতে হবে। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত বাঙালি যদিও ওই মা-চ-বাতেই অভ্যস্ত, বাংলাদেশে কিন্তু এর কোনো ভৌগোলিক ভিত্তি নেই। কোনো উপভাষাই এর কাছাকাছি নয়। চিত্রটা এইরকমই ছিল অনেককাল যাবৎ। কিন্তু ১৯৬০ সালে মুনীর চৌধুরী Language problem in East Pakistan প্রবন্ধে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মান্য কথ্য বাংলার পাশাপাশি ইনফরমাল প্রতিবেশে মা-চ-বা-র একটা ভিন্ন রূপ তৈরি হয়ে উঠেছে যার ভিত্তি ঢাকা-ময়মনসিংহের উপভাষার মিশ্রণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ওখানে মা-চ-বা দুটো — একটা ফরমাল প্রতিবেশে ব্যবহৃত, রেডিয়ো-টেলিভিশনে, বক্তৃতায়, ক্লাসঘরে; অন্যটি ইনফরমাল প্রতিবেশে। ফলে মুনীর চৌধুরীর মতে একজন বাংলাদেশিকে চার-চারটি উপভাষা শিখে নিতে হয়— নিজের উপভাষা তো আছেই, আছে লেখার সাধুভাষা, আর দুটি মা-চ-বা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকেও কি বাংলা ভাষার একাধিক রূপ শিখে নিতে হয় না?

অবশ্যই হয়। কাজেই পরিস্থিতি দুই বঙ্গেরই অনেকটা একরকম। 'অনেকটা', তবে সবটা নয়। এখানেই পবিত্র সরকারের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা মা-চ-বা-র কাছাকাছি ভাষা এমনিতেই বলেন। বাংলাদেশের কেউই মা-চ-বা স্বাভাবতই বলেন না, বলার জন্য শেখেন। এই পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন পবিত্র। পশ্চিমবঙ্গের মা-চ-বা বাংলাদেশের উপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এর যে কারণটা পবিত্র বলতে পারতেন তা এই যে, ষাট বছর আগেও বাংলাদেশ ছিল ভারতেরই অংশ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতিদিনের আদানপ্রদান ও সংযোগ এতই স্বাভাবিক ছিল, এতই নিয়মিত, দুই বঙ্গের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান বাস করতেন এতই স্বাভাবিক সংলগ্নতায় যে, স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরেও মুসলমানের মা-চ-বা বদলাল না। সমস্যাটা তৈরি হল তখন যখন থেকে বাংলাদেশের বাঙালির "একটি পৃথক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল।" (পৃ ৭৮) এর পর থেকেই একটু-একটু করে, মূলত অধঃস্তরীয় ভাষারই চাপে এবং টানে, পূর্বোক্ত ইনফরমাল কথ্য চলিত ভাষা ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। আর তারই ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশের বহু মানুষের মান্য ভাষাতেও ঔপভাষিক 'স্মৃতি' সক্রিয়। এই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চর্চাকেন্দ্র ক্রেসিডার প্রকাশিত এবং বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলা ভাষা ও বাঙালী সমাজ' সংকলনে। তখন অবশ্য নিবন্ধটির শিরোনাম ছিস 'শিষ্ট চলিত স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ও বাংলাদেশ'। সন্দেহ নেই, পরিবর্তিত নামকরণই উপযুক্ততর। যথোচিত পরিমার্জনাও করা হয়েছে। প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ তিনটি সংযোজিত হয়েছে, আগে ছিল না। ষোলো বছর আগে প্রকাশিত রচনা যখন গ্রন্থভুক্ত হয়, তখন তাকে অংশত কিংবা সম্পূর্ণত পরিমার্জিত করে নিতেই হয়। তবে প্রথম প্রকাশিত পাঠে অন্তিম একটি অনুচ্ছেদে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অন্নদাশংকর রায়ের একটি সুপারিশ বা পরামর্শের উল্লেখ ছিল। গ্রহণীয় না হলেও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক সেই পরামর্শ। পরিমার্জনার সময় পবিত্র সেই অংশটি বর্জন করেছেন। অন্নদাশংকরের সে মন্তব্য কি তাঁর কাছে অনাবশ্যক মনে হয়েছে? না কি তাকে মনে হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক? আমাদের অবশ্য মনে হয় ওটা রাখা হলে পবিত্রর প্রবন্ধের কোনো হানি হত না।

'ইঙ্গবঙ্গ ও তার বিবর্তন' সুলিখিত, তবে এটি পুরোপুরি ভাষাবিষয়ক রচনা নয়। চালচলনে, পোশাকে এবং ভাষায় বাঙালির সাহেব হয়ে ওঠার বৃত্তান্তই এই নিবন্ধের উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। পবিত্র বার্নস্টাইনের খ্রিস্টান-নামকে একবার লিখেছেন বেজ়িল (পৃ ১১১), পরে সূত্র নির্দেশের ৯ নম্বরে (পৃ১১৪) লিখেছেন বেসিল। বেজ়িল|-ই-তো ঠিক ছিল, তবে তাকে বদলালেন কেন?

'বাংলা শব্দভাণ্ডার ও সাহিত্যশৈলী : সম্প্রীতির দলিল' নামের প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে শব্দের গ্রহণীয়তা, স্বাভাবিকতা। নানা সূত্রে ভাষায় শব্দ আসে। সেসব শব্দ কত দূর আত্মীকৃত হবে তার অনেকটাই নির্ভর করে প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিতের উপর। এ কথা ঠিক যে, বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় আত্মীকৃত হয়ে গেছে, আবার বহু শব্দ কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কখনো-কখনো হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষই

কিছু শব্দকে অগ্রহণীয় অব্যবহার্য মনে করেন। এই প্রসঙ্গে জল ও পানি শব্দ দুটির বিশেষ বিচার করেছেন পবিত্র। তাঁর আলোচনা তীক্ষ্ম, সংবেদনশীল, মনোজ্ঞ। স্মরণ করি— ১৯৪০ সালের ৩১ আগস্ট আবুল ফজল এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দেন ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০-এ। রবীন্দ্রনাথ লেখেন "খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে, তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। " বাঙালি মুসলমানের প্রতিদিনের কাজের ভাষায় 'পানি' এতটাই স্বাভাবিক, যতটা বাঙালি হিন্দুর কাছে 'জল'। আবার হত্যা অর্থে খুন হিন্দু মুসলমান উভয়েই কাছেই সমান স্বাভাবিক হলেও রক্ত অর্থে খুন বাঙালি হিন্দুর ভাষায় স্বাভাবিক নয়। পবিত্রর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য — "শৈলী বা স্টাইলের ভিন্নতা তৈরির জন্য কোনো ধরনের শব্দ আর-এক শৈলীতে ব্যবহার করার অধিকার সকলেরই আছে।" (পৃ ৯০)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'সাধারণ ভাষা ব্যবহার ও সম্প্রচারের ভাষা', 'তীব্রতা এসেছে বাংলা ভাষাচর্চায়', 'জাতপাতের ভাষা, ভাষার জাতপাত' এবং 'বাঙালি কে?' বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে ভাষার আদর্শ কী, এই প্রশ্নের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনায় পবিত্রর নৈপুণ্য প্রকাশিত। বাংলা ভাষাচর্চার নানা ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে যেসব উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার সবিস্তার আলোচনা রয়েছে 'তীব্রতা এসেছে বাংলা ভাষাচর্চায়' নিবন্ধে। এতে বহু পুস্তকের কথা বলেছেন পবিত্র। এই নিবন্ধে বাংলা ভাষাচর্চার একটা সার্বিক পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কোনো পুস্তক বা গবেষণা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় এসব ক্ষেত্রে।

আরও একটি প্রয়োজনীয় রচনা 'কাজের বাংলা ভাষা কেমন করে হবে'। এক অর্থে অভিনব এবং মজারও বটে রচনাটি। কাজের ভাষা বলতে কী বুঝি? আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন যাতে মেটে তেমন করে ভাষাকে তৈরি করে নিতে পারলেই তাকে কাজের ভাষা করে তোলা যায়। সেই দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলোকে আটচল্লিশ ভাগে ভাগ করেছেন পবিত্র, যদিও সংখ্যাটা সম্পূর্ণ নয়, তিনি নিজেই বলেছেন। রচনাটিকে প্রয়োজনীয় বলছি কেননা এতে পবিত্র দেখিয়েছেন, বাংলাকে কাজের ভাষা করে তোলায় কী কী বাধা আছে, কীভাবেই বা সেসব বাধা কাটিয়ে ওঠা যায়। পবিত্র দেখিয়েছেন যে, বাধার অনেকটাই মানসিক। কাজেই কাটিয়ে ওঠা কঠিন নয়। পরিভাষার দুরূহতা বা ঘাটতি কোনো সমস্যাই নয়। দুটো কথা বলে ভালোই করেছেন পবিত্র। নীচু ক্লাশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষক-অধ্যাপকরা বাংলায় পড়াতে অভ্যস্ত হয়েছেন অনেকটাই। দ্বিতীয়ত, পবিত্র অস্বীকার করেননি যে, বাংলাকে কাজের ভাষা করে তোলার সঙ্গে ভালো করে ইংরেজি ভাষাটা শেখার কোনো বিরোধ নেই।

এই বইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'বাঙালি কে?' বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারাই বাঙালি। কিন্তু এতটাই কি সরল ও একরৈখিক এই বাঙালি সত্তা? তার মধ্যে কি নেই নানান স্তর, নানান বৃত্ত ও বৃত্তান্ত? সেটা কি গ্রহণ-বর্জনের প্রচুরতায় গড়ে ওঠা একটা সমগ্র সত্তা নয়, যা সচল, পরিবর্তমান, অথচ জটিল ও বিমিশ্র? এই ব্যাপারটাই পবিত্র দেখিয়েছেন গভীর বিশ্লেষণের সাহায্যে। মনে হতে পারে কোথাও কোথাও বক্তব্য একটু আলগা হয়ে পড়ছে।

একটু ঝুলে ও এলিয়ে পড়ছে কোথাও, বিশেষত যেখানে হালকা চালে গল্প বলছেন। কিন্তু বক্তব্যের সামগ্রিক ঐক্য ব্যাহত হয়নি একটুও। এই নিবন্ধে তথ্যের সংকলন মোটেই বড়ো কথা নয়। তথ্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু বিশ্লেষণের গভীরতা আর তীক্ষ্মতা ছাপিয়ে গেছে তথ্যের ভারকে।

সব শেষে দুটো কথা বলব। পবিত্র সরকার অধোস্তর শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। (পৃ ৭৮,৭৯) সন্ধির নিয়মে অধঃস্তর হওয়ার কথা। পবিত্র ভেবে দেখবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কতকগুলি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন খুবই যথাযথভাবে। তার মধ্যে আছে আচারিক (formal, পৃ৭৭),। নিরুক্তি (register,পৃ ৮৬), ভাষাবর্জন (code switching, পৃ ১০৫), ইত্যাদি। আচারিক ও আনুষ্ঠানিক (formal) দুই-ই ব্যবহার করা যায়, করা হয়েছেও। কোনটি উপযুক্ততর? code switching কে ভাষাবর্জন বলতেই পারি। তবে ভাষাবদলও বলা যায় না কি?

ঢোঁড়াই চরিতমানস : অন্তরঙ্গ ভাষাপাঠ

সতীনাথ ভাদুড়ীর কোন উপন্যাস শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে মতৈক্য না হবারই কথা। আঙ্গিকের জন্যই হোক, বা যাকে তিনি নিজেই রাজনৈতিক উপন্যাসের 'সত্যনিষ্ঠা' বলেছিলেন একসময়, তার জন্যই হোক, প্রকাশের পরেই 'জাগরী' লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার পরেও জাগরী-র জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। রবীন্দ্র পুরস্কার তার একটা কারণও হতেও পারে। তবে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক নিজে ছিলেন যথেষ্ট যত্নশীল। এই উপন্যাসের গঠনবিন্যাস সেই সময়ের পক্ষে ছিল অস্বাভাবিক ও কিছুটা জটিল। রাজনৈতিক উপন্যাসের তথাকথিত রাজনীতি এখানে না সরল, না গতানুগতিক। রাজনৈতিক বিশ্বাস আর রাজনৈতিক কর্মব্রতর ভিতরের দ্বন্দ্বগুলো উঠে এসেছে উপন্যাসে, সেই দ্বন্দ্ব কীভাবে পরিবার-জীবনে ছায়াপাত করে, কীভাবে সংকটের দিকে ধাবিত হয় দ্রুত, উপন্যাসে সেই কাহিনি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মোটা দাগের রাজনীতি নয়, রাজনীতির সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে গেছে গোটা উপন্যাসে। এসব সত্ত্বেও জাগরী-কে সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যাবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। সতীনাথ নিজে এবং আরও কেউ-কেউ বরং 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন।

'শ্রেষ্ঠ' মার্কাটা কোনো সাহিত্যকর্মের গায়ে এঁটে দেওয়া সহজ নয়। একজনের বিবেচনায় যা শ্রেষ্ঠ, তা ততখানি ভালো না হতেই পারে আরেকজনের বিবেচনায়। এমনকী, লেখক নিজেই তাঁর নিজের রায়কে বদলে দিতে চাইবেন হয়তো পরবর্তী কোনো-এক সময়ে। এই কথাটা সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস সম্বন্ধেও খাটবে। তবু ঢোঁড়াই চরিতমানস-কে অধিকাংশের বিচারে সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ বলি আর না-ই বলি, ওই উপন্যাস যে নানা কারণে সতীনাথের বিশিষ্টতম রচনা তাতে সন্দেহ করার কারণ দেখি না। উপন্যাসটির বিষয় অস্বাভাবিক,তার ভাষাতেও রয়েছে অস্বাভাবিকতা। গতানুগতিকতা থেকে সরে আসা হয়েছে অনেকটাই। শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী'-তে তাঁদের ভূমিকায় লিখেছেন—

'লেখকের এই পক্ষপাতের কথা যদি ভুলেও যাই আমরা, তাহলেও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' বিষয়ে আমাদের বিস্ময় কখনো কমে না। এ কেমন উপন্যাস যার পাতায় পাতায় দরকার হয় পাদটীকার? এ কেমন উপন্যাস যার নায়কের নাম 'ঢোঁড়াই'? এর ঘটনাভূমি আমাদের চিরপরিচিত বাঙলাদেশ নয়, বিহার। এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি, এর জগৎটা গড়ে উঠছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর তাৎমাদের নিয়ে। আর এই সংগঠনের মধ্যে লেখক আমাদের ফিরিয়ে নিয়েছেন আপাত-প্রাচীন যুগে,আদিকাণ্ড বাল্যকাণ্ড

রামিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন কোনো তুলসীদাসী রামায়ণের স্বাদ। অথচ, পূর্বাগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না করেও সবই আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে পরিচিত দেশশ্রী থেকে ছিন্ন না করেও এ-বই আমাদের এক নতুন দেশের মুখোমুখি নিয়ে যায়।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর বিশিষ্টতার ধরনটা পাঠকের গোচরে আনবার জন্যই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি। আর যেহেতু এই উপন্যাসটি বিহারের অন্ত্যজ ধাঙড় ও তাৎমাদের জীবন নিয়ে রচিত ,তাই এর ভাষাকেও স্বাভাবিক কারণেই হতে হয়েছে বিশিষ্ট। যে- উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় দিতে হয়েছে পাদটীকার সহায়তা, সে-উপন্যাস আদৌ খাঁটি উপন্যাস কি না, সেই দ্বিধা অহেতুক নয়। বিশেষত ওতে কোথাও-কোথাও প্রবন্ধের আদলও যেন ধরা পড়ে। এমন একটি উপন্যাসের ভাষারূপকে দেখে নেবার ইচ্ছাকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

দুই

ঢোঁড়াই চরিতমানস সব অর্থেই একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। একটি প্রান্তিক উপজাতি বা জনজাতির জীবনকে নিয়ে উপন্যাস বাংলায় কমই রচিত হয়েছে। ঢোঁড়াইয়ের ব্যতিক্রমী চরিত্র শুধু তার জন্যই নয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ভাষাভঙ্গিও ব্যতিক্রমী এখানে, সংগতভাবে, প্রত্যাশিতভাবে। বিহারের একটি অন্ত্যজ প্রান্তিক জনজাতি তাৎমাদের জীবন যেহেতু এই উপন্যাসের মূল কথা, তাই এই উপন্যাসে সতীনাথের ভাষারূপ কিছু 'অন্যরকম' হবারই কথা, হয়েছেও তাই। আর একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। ঢোঁড়াই চরিতমানস নামটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে হিন্দি কবি তুলসীদাসের রামচরিতমানস-এর প্রভাব। শুধু নামেই নয়, উপন্যাসের নির্মিতিতে এবং শিরোনামে অনেক ক্ষেত্রেই রামচরিতমানস তথা রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উপন্যাসটি কতকগুলো কাণ্ডে বিভক্ত, আর সেই বিভাগগুলোর নাম আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ইত্যাদি। শুধু এ-ও নয়, পাঠককে লক্ষ করতে হয় লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত একটি পরিচ্ছেদ,যার নাম 'বাবুসাহেবের অক্ষয় তূণীর লাভ'। এ ছাড়া জায়গায় জায়গায় অগ্নিপরীক্ষা, রামরাজ্য, নাগপাশ এসবও আছে। বিশেষত তুলসীদাসের রামচরিতমানস-এর ছায়াপাত তাই খুবই স্পষ্ট। উপন্যাসের একেবারে শেষেও দেখতে পাই এই কথাগুলো —

এন্টনির মা হয়তো এখন বলছে — এটা কীরে কম্বল জড়ানো? লোকটা ফেলে গেল। রামায়ণ?

সেই রামায়ণই আবার! কিন্তু এই রামায়ণ বা রামচরিতমানস -এর প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ নিতান্তই বাহ্যিক। তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইয়ের জীবনরচিত রামচরিতমানস-কে ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে তাৎমাটুলির রামায়ণ।

তিন

এমন একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপন্যাসের ভাষাও যে প্রত্যাশামতো বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত হবে ও ব্যতিক্রমী হবে সেটাই স্বাভাবিক। আমরা দেখব এই উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর

ভাষারীতি কীভাবে তাঁর বিষয়ের উপযোগী হয়ে উঠেছে সর্বৈব। ঢোঁড়াইয়ের দুটি চরণের প্রকাশকাল ১৩৫৬-৫৮ এর মধ্যে, অর্থাৎ জাগরী-র চার-পাঁচ বছর পরে। শুধু এই জন্যই যে সতীনাথ সাধুভাষা থেকে মান্য চলিতে চলে এলেন, এমন সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না। বস্তুতপক্ষে ঢোঁড়াইয়ের বিষয়ই তাঁর স্টাইলকে নির্ধারিত করে দিয়েছে। আমরা এমন অনুমান করতেই পারি যে, তাৎমাটুলির ধাঙড়দের জীবনস্রোতের কাহিনি নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে সাধুভাষা উপযুক্ত বাহন হত না। তাই সংগতভাবেই মান্য চলিত ভাষার ব্যবহার এখানে।

তবে কেবল 'মান্য চলিত ভাষা' কথাগুলো বলাই যথেষ্ট নয় এক্ষেত্রে। কেননা ঢোঁড়াই চরিতমানস উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে মান্য চলিতের ক্রিয়াপদ, সর্বনাম আর অনুসর্গ ব্যবহারই বড়ো কথা নয়। শব্দব্যবহারে সতীনাথ কতদূর সচেতন ও সজাগ ছিলেন তা লক্ষ করার বিষয়। মান্য চলিত ভাষা ব্যবহার করার মানে এই নয় যে, কেবল হালকা তরল বা লঘু শব্দের ব্যবহারই এখানে দস্তুর। সাধু ভাষায় কেবল ওজনদার তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হবে, আর চলিত ভাষায় লঘু শব্দই ব্যবহৃত হবে এই ধারণা ভুল এবং প্রায় বর্জিতই হয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরীর চলিত গদ্য ও রাজশেখর বসুর চলিত গদ্য যেমন ওই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে, তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সাধু গদ্য বুঝিয়ে দেয় যে লঘু বা ওজনদার শব্দ, হ্রস্ব বা দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত হবে কি না তা সাধু-চলিতের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিষয়ের উপর, উপস্থাপনরীতির উপর, লেখকের মেজাজের উপর। আর এই কথাটা আরও একবার প্রমাণিত হয় ঢোঁড়াই চরিতমানস উপন্যাসের গদ্যভাষায়। এখানে আমরা লক্ষ করি প্রয়োজনে তৎসম শব্দ কী দক্ষতার সঙ্গে ও যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। নীচের বাক্যগুলো দেখব আমরা—

> কিন্তু এর চোখে একটা অননুভূত কোমলতার আভাস দেখে, ঢোঁড়াই ভয় করবার অবকাশও পায় না সেদিন।
>
> (প্রথম চরণ, ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধঘোষণা)
>
> মৃত্যুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হয় যে পাতালপুরীর গভীর অতলে নেমে চলেছেন।
>
> (দ্বিতীয় চরণ, বাবুসাহেবের অক্ষয় তূণীর লাভ)

প্রয়োজনে তৎসম, দেশি, বিদেশি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করে লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট পরিবেশ রচনা করেন। প্রয়োজনে ঔপভাষিক শব্দও ব্যবহার করতে হয়।

> দূরে, পাক্কী থেকে কোশখানেক পচ্ছিমে একখান গাঁ দেখা যাচ্ছে। একসার ডালছাঁটা শিশুগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশ ফুঁড়ে।
>
> (দ্বিতীয় চরণ, ঢোঁড়াইয়ের জমি ও জাতের রাজ্যে আগমন)
>
> যতই কোয়েরী আর সাঁওতালগুলো জ্বালাতন করুক না কেন, জমি রাখার মধ্যে আছে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার তলেও আছে একটা গভীর পরিতৃপ্তির ভাব। কিন্তু নিশ্চিন্দি আর নেই। ঘুরেফিরে নাকের উপর মাছি বসলে ধ্যানী সন্ন্যাসীরাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, বাবুসাহেব তো কোন ছার। কোয়েরী-সাঁওতালগুলোর সেই যে তড়্পানি আরম্ভ হয়েছে, আট-দশ বছর আগে থেকে, এ কি কোনোদিন থামবে না। নিত্যি নূতন

ফ্যাসাদ বাধিয়েই রেখেছে।

(দ্বিতীয় চরণ, ভূম্যধিকারীর তপস্যায় বিঘ্ন)

শুধু তৎসম-অতৎসম নয়, অতৎসম শব্দাবলির মধ্যে যে নানান জাতের বা শ্রেণির শব্দ, সেগুলিকে দরকারমতো মিলিয়ে-মিশিয়ে ব্যবহার করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। নানা শ্রেণির শব্দের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছেন সহজেই। 'সহজেই' কথটা বললাম এইজন্য যে, পাঠক অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ পড়ে যাবেন, না থেমে, না থমকে। জাগরী-র সাধুভাষার বেলাতেও যেমন, ঢোঁড়াই চরিতমানস-এর চলিত ভাষার বেলাতেও তেমনি; শব্দ ব্যবহারের এই ভারসাম্য বা ব্যালান্স সতীনাথের গদ্যের বিশেষ গুণ, একথা মনে রাখতেই হবে।

চার

যখন চলিত ভাষার কথা বলছি, তখন এই কথাটাও মনে রাখব যে, সেই চলিত ভাষারও রয়েছে নানান মাত্রা। বিবৃতির ভাষার যে ভঙ্গিটি দেখি, তার সঙ্গে সংলাপের ভাষার মিল নেই, তা থাকবার কথাও নয়। মান্য চলিত ভাষা মোটেই একরৈখিক নয়। তারও আছে নানান স্তর। এই বিভিন্নতা ভালোই ধরা পড়ে যখন আমরা উপন্যাসের বিবৃতির ভাষা আর সংলাপের ভাষা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি। লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, সংলাপ অংশে কথ্য ভাষা বা এমনকী ঔপভাষিক ভাষা যতটা ঢুকে পড়ে, বিবৃতি অংশে তত নয়। বিবৃতির ভাষা আমরা লক্ষ করেছি কিছুক্ষণ আগে। এবার দেখব সংলাপের ভাষা।

সব কেচ্ছাই জানি তোমার, মেয়ের বেলায় এত সতীপনা কেন? হারামজাদা? ধোঁদলের বিচির মতো তার দাঁতগুলো ইচ্ছে করে এক থাবড়ায় ভেঙে দি।

(প্রথম চরণ, ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ)

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমস্ত সংলাপেই কথ্যতা বা ঔপভাষিকতার প্রাধান্য। সংলাপের ভাষাও নির্ভর করে বক্তার সামাজিক অবস্থান আর শিক্ষা রুচি প্রভৃতির উপর। তাই বাবুসাহেবের সংলাপের ধরনটা এইরকম—

কেবল কথা! যা দরকার বুঝবে করবে। তা নিয়ে এত কথা কিসের?

কিংবা যেমন লাডলীবাবু বা 'বলন্টিয়ারদের' কথা। এই উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অজস্র ঔপভাষিক শব্দ বা বিকৃত শব্দ। ডিস্টিবোর্ড, কাংগ্রিসি, টৌন, পাক্কী, রংরেজ, বগুলা, কিরিস্তান, পিট্রৌল, হিঁদু, ছত্তিস, পরদেশী শুগা, পচ্ছিম, পোসকাট, ডিরেসিং, সাগাই, চেরমেন, বলন্টিয়র— এইরকম শব্দ পাওয়া যায় পাতায় পাতায়। আবার মিউনিসিপ্যালিটি ডিস্ট্রিক্ট এসবও আছে। কাংগ্রিসি যেমন আছে, তেমনি কংগ্রেস আর কংগ্রেসীও আছে। অফিসার আছে, অফসরও আছে। আসলে কোন শব্দ কীভাবে বা কোন চেহারায় আছে তা নির্ভর করে কী উদ্দেশ্যে কোন পরিস্থিতিতে তা ব্যবহৃত হচ্ছে তারই উপর।

পাঁচ

সংলাপের প্রসঙ্গে এই কথাটা স্মরণ করা অত্যন্ত জরুরি মনে হয় যে, অন্যান্য সার্থক ঔপন্যাসিকের মতো সতীনাথও এমনভাবে সংলাপ রচনা করেছেন যাতে বিশেষ কোনো

সংলাপের বক্তার চরিত্র ও মেজাজের অনেকটাই তার সংলাপের মধ্যে স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসটি ঢোঁড়াই নামে তাৎমাটুলির একটি যুবকের বৃত্তান্ত মূলত। ঢোঁড়াই শৈশবে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বড়ো হয়েছে বোবা সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তার চরিত্রে অস্থিরতা আছে, ক্রোধ আছে, একটা চাপা অভিমানও আছে। তার সংলাপে এই সবকটিরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

সংলাপের প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। সতীনাথ যে সচেতনভাবে নারী-পুরুষের সংলাপে ভেদ রেখেছেন তা সংলাপাংশ পড়লেই বোঝা যায়। মহতোগিন্নি ঢোঁড়াইকে আদর করে খাওয়াতে চায়। তার কথাগুলো এইরকম —

আর চারটি ভাত নেবে না? ওকি ছাই খাওয়া হল? এই জোয়ান বয়সে ঐ চারটি ভাতে কী হবে? এই ফুলঝরিয়া, আমলকির আচার দিয়ে যা। ও মেয়ের আবার বুঝি লজ্জা হয়েছে।..... কী যে আমার কপালে ভগবান লিখেছেন কে জানে।

(প্রথম চরণ, ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা)

এই বাক্যগুলোতে পর পর প্রশ্নবাক্য, 'চারটি ভাত', 'কপালে', 'বুঝি', 'কী যে' এই শব্দ ও শব্দবন্ধগুলো নারীর মুখের ভাষার ভঙ্গির দ্যোতক। নারীর ভাষায় সাধারণভাবে বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বেশি হবার কথা। সতীনাথ ও তাঁর উপন্যাসে নারীর মুখে প্রবচন বসাতে ভুল করেননি। ঢোঁড়াইয়ের হবু বউ রামিয়ার মুখে শুনতে পাই এই কথা—

ঢোঁড়াই তাকে এক কোঁচড় গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল খেতে দিয়েছিল। এ রকম কুল পচ্ছিমে আছে, বড় যে পচ্ছিমের বড়াই করো? রামিয়া একটা খেয়েই বলেছিল 'বেটা মরে! এমন কুল জীবনে খাইনি, গুড়ের মতো মুখে দিলে মিলিয়ে যায়।' (অর্থাৎ এই কথাটা মিথ্যে হলে আমার ছেলে যেন মরে যায়।)

(প্রথম চরণ, রেবণগুণীর ঢোঁড়াইকে বরাভয় দান)

ঢোঁড়াই চরিতমানস যে একটা ব্যতিক্রমী উপন্যাস, সেকথা আগেই বলেছি। ব্যতিক্রমী নানান কারণেই। একটা কারণ, এর প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনামের ভাষা। উপন্যাসটিতে মান্য চলিত ভাষা, মান্য কথ্যভাষা ও উপভাষার একটা মিশেল চোখে না পড়েই পরে না। কিন্তু পরিচ্ছেদের শিরোনামে সতীনাথ ব্যবহার করেছেন প্রায় নির্ভেজাল তৎসম শব্দ। এখানে কয়েকটা শিরোনাম তুলে দিই— তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন, বস্ত্রলাভের উপাখ্যান, গুরু-শিষ্য সংবাদ, গানহী বাওয়ার বার্তা, গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন, সামুয়ারের ভর্ৎসনা, ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ-ঘোষণা, ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা, মহতোর বিলাপ, ভূম্যধিকারীর তপস্যায় বিঘ্ন, তিতলিকুঠি দহন, লাডলীবাবুর চরু লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ ইত্যাদি। এই উপন্যাস লেখবার সময় সতীনাথের মন যে রামায়ণে পড়ে ছিল সেকথা তিনি নিজেই বলেছেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস -এর প্রভাবও স্পষ্ট। শিরোনামগুলোর ওজনদার ভাষাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে।

আমরা এ-ও লক্ষ করেছি যে, এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় পাদটীকার ছড়াছড়ি। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কেননা বিহারের ওই অঞ্চলের বহু ঔপভাষিক শব্দ সতীনাথ ব্যবহার করেছেন। আর শুধু শব্দই তো নয়, আছে প্রচুর শব্দবন্ধ, বাগ্‌ধারা আর প্রবাদ-প্রবচনও।

বাত্তিমার,কর্মাধর্মার, চুমৌনা, পরহেজ, কালালী (কালালি), ঔজার, শুগা, জিলা-খারিজ, শ্যাম্পনি, ঝোটহা, খাব্বাস— এইসব শব্দ কি আর পাদটীকার সহায়তা ছাড়া বুঝে নেওয়া সম্ভব হত পাঠকের পক্ষে? কিংবা প্রবাদগুলো? না আগে নাথ, না পিছে পগাহা, পাবলিসের এক্কা, এখন লে সুথনি?

সতীনাথ ভাদুড়ী ও তাঁর অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর বয়ান থেকেই জানতে পারি আমরা যে, ঢোঁড়াই চরিত্রটি সতীনাথের নিজের কল্পনার সৃষ্টি নয়। ঢোঁড়াই জনৈক তাৎমার নামই বটে। তবে চরিত্রটিকে নানাভাবে বদলে নিয়েছেন তিনি। বদল যতই হোক, ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই-ই থেকেছে। আর সেইজন্যই সতীনাথের এ-উপন্যাসের ভাষা তাঁর অন্য সমস্ত গল্প উপন্যাসের ভাষা থেকে পৃথক। এমনকী, সর্বজনপরিচিত জাগরী-র ভাষাও এমন সচেতন প্রয়াসনির্মিত নয়। সেখানে তার প্রয়োজনও হয়তো ছিল না। শুধু ভাষানির্মাণই তো নয়, ঢোঁড়াই চরিতমানস একটি জনজাতির উপাখ্যান হয়ে উঠেছে, দুটি জনজাতির ভিতরের সংঘাতসংস্পর্শ, কন্ট্রাক্টর ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া — এই সব মিলিয়ে এই উপন্যাসের গঠনটি বেশ জটিল। এর ভাষা স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তাকে নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। এই উপন্যাসে এ ছাড়া উপায় ছিল না মোটেই।

ভাষা বিশ্লেষণের আর এক পদ্ধতি

ভাষাচর্চার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। গ্রিক ও রোমান ভাষাভাবুক ও দার্শনিকরা ভাষা নিয়ে বিস্তর ভেবেছেন, ভেবেছেন প্রাচীন ভারতের পাণিনিসহ অন্য পণ্ডিতেরাও। সেই ভাষাচর্চার পথ একরৈখিক নয়, বলাই বাহুল্য। তবে উনিশ শতকেই প্রথম সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়েছে, অন্যভাবে বলা যায়, উনিশ শতকেই প্রথম ভাষাবিজ্ঞান নামক বিদ্যার উদ্ভব হয়। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ উনিশ শতকেরই ঘটনা। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলো সম্বন্ধে অনুসন্ধান ওই শতকের ভাষাচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একে একে অন্য ভাষাবংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধানও হতে থাকে। রাস্ক, ফ্রানৎস বপ ও ফান হুমবোল্টের ভাষাচর্চায় এ বিষয়ে নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এঁদের আলোচনায় এবং বিশেষত হুমবোল্টের গবেষণার ফলে পৃথিবীর ভাষাগুলোকে বিশ্লেষাত্মক (isolating), সংশ্লেষাত্মক (agglutinating) ও সবিভক্তিক (inflexional) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। হুমবোল্টের ভাষাচিন্তার একটা বড়ো দিক এই যে, তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত ভাষাদক্ষতার বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন। অনুমান হয়, চমস্কি অন্তত এই একটি ব্যাপারে হুমবোল্টের কাছে গভীরভাবে ঋণী। ইতিমধ্যে কার্ল ব্রুগমানের মতো নব্যব্যাকরণপন্থী ভাষাতাত্ত্বিকরা ধ্বনি পরিবর্তনের বিষয়টির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে শুরু করেন।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়। ফরাসিভাষী সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুরের লাঁগ্ (langue) ও পারল্ (parole) বিষয়ক আলোচনায় সূত্রপাত হয় সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের। এই সময়েই এককালিক ভাষাতত্ত্বের প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এসে পড়ে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান। এই সময়ের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন সাপির, লেনার্ড ব্লুমফিল্ড,ফার্থ প্রভৃতি। এঁদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানে ভাষাবিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। প্রায় একই সময়ে প্রাগ স্কুল ভাষাচর্চার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ঘটনাটি বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলিত করে এবং ভাষাবিজ্ঞানে বলতে গেলে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেয় তা হল নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ (Transformational-Generative Grammar)। ১৯৫৭ সালে তাঁর Syntactic Structures-এর প্রকাশে এই নতুন তত্ত্বটির সূচনা হয়। পরে ১৯৬৫ তে Aspects of the Theory of Syntax-এ চমস্কি তাঁর তত্ত্বে কিছু পরিবর্তন পরিমার্জনা ও সংযোজন করেন। চমস্কির তত্ত্বে ভাষার অধোগঠন ও অধিগঠন (deep structure, surface structure) পদসজ্জাবিধি (phrase structure rules) এবং

রূপান্তর ও সঞ্জনন সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। চমস্কি বলেন মানুষ মাত্রেই একটা ভাষাবোধ বা ভাষাসামর্থ্য নিয়ে জন্মায়, যাকে তিনি competence বলেছেন। সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভাষাকে নতুন নতুন উপায়ে ব্যবহার করা হয়, যা তাঁর তত্ত্বে performance নামে পরিচিত। চমস্কি বলেছেন যে, কীভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সূত্র নিয়ে যেকোনো ভাষায় অসংখ্য বাক্য নির্মাণ করা যায় তার কোনো ব্যাখ্যা আগেকার কোনো তত্ত্বেই মেলে না। একমাত্র সংবর্তন ও সঞ্জননের জন্যই সেটা সম্ভব হয় বলে তিনি মনে করেন।

সন্দেহ নেই যে, চমস্কির তত্ত্ব ভাষাচর্চায় নবযুগ সূচিত করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আগেকার সব তত্ত্ব, সব আলোচনা উড়ে গেল। বরং দেখা যাচ্ছে, চমস্কির তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও এক দিকে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এবং অন্য দিকে বর্ণনাপন্থী ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা চলতেই থাকল। আর শুধু তাই নয়। লেনার্ড পামার-এর মতো বর্ণনাপন্থীরা চমস্কির তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। পামারের কঠোর সমালোচনার একটু নমুনা দেখে নেওয়া যেতে পারে — 'it has become clear over the past five years that transformational-generative grammar is nowhere near being an adequate theory of human language'. একথা পামার লিখেছেন ১৯৭২ সালে তাঁর Descriptive and Comparative Linguistics : A Critical introduction বইয়ে।

ভাষাগবেষক নীলাদ্রিশেখর দাশ সম্প্রতি প্রচুর পরিশ্রম করে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন— 'ভাষাংশ সংগ্রহ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান'। এই বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় corpus linguistics. এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়কে স্থাপন করতে হবে উপরোক্ত পটভূমিকায়। করপাস লিংগুইস্টিকসকে একেবারে নতুন একটা ভাষাপদ্ধতি মনে করলে ভুল হবে। এই পদ্ধতির ভিত্তি যে করপাস, নীলাদ্রিশেখর দাশের কথায় 'ভাষাংশ সংগ্রহ', তার উপর ভিত্তি করে এই ভাষাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল বিংশ শতকের মাঝামাঝি। তবে এর সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে অতি সম্প্রতি। করপাস ভাষাবিজ্ঞানের সমর্থকদের মতে এই ভাষাপদ্ধতি চমস্কির ভাষাবিজ্ঞানের এক প্রবল প্রতিস্পর্ধী তত্ত্ব হিসাবে জেগে উঠেছে।

নীলাদ্রিশেখর দাশের এই বই করপাস ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকল ইনস্টিটিউটে গবেষণারত এই ভাষাবিজ্ঞানী ইতিপূর্বে করপাস নিয়ে শ্রমসাধ্য গবেষণা করেছেন। এবং করপাস ভাষাবিজ্ঞানের অধুনাতম প্রবণতার সঙ্গে সংগতি রেখে তিনি তাঁর গবেষণায় কম্পিউটার প্রযুক্তিরও সাহায্য নিয়েছেন প্রভূতভাবে। তাঁর এই বই থেকেই আমরা জানতে পারছি তিনি করপাস ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে আসছেন অন্ততপক্ষে ২০০০ সাল থেকেই। আমাদের বলতে দ্বিধা নেই, পশ্চিমবাংলায় এ-বিষয়ে গবেষণা যাঁরা প্রথম করছেন, নীলাদ্রিশেখর তাঁদেরই একজন।

শ্রীদাশের বইটির আলোচনায় যাবার আগে দেখে নেওয়া ভালো এর পরিকল্পনাটি কেমন। মোট নটি অধ্যায়ে সাজানো এই বই। করপাস বলতে কী বোঝায়, করপাসের স্বরূপ, করপাসের নথিভুক্তি ইত্যাদি নিয়ে প্রথম দুটি অধ্যায়। করপাসের প্রকারভেদ ও প্রাক্-বৈদ্যুতিন ভাষা-নমুনার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে। কম্পিউটার-নির্ভর করপাস পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় 'বাংলা লিখিত ভাষাংশ নির্মাণ'। শেষ

তিনটি অধ্যায়ে পাচ্ছি ভাষাংশের ব্যবহার, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি এবং তার পরে ধীরে ধীরে করপাস ভাষাবিজ্ঞান একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে জেগে উঠেছে। করপাস ভাষাবিজ্ঞানের সমর্থকদের কেউ-কেউ একে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব না বলে ভাষাচর্চার একটা পদ্ধতি হিসেবে দেখারই পক্ষপাতী। আমরা দেখতে পাই যে, করপাস ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির দুটো পর্ব আছে, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের আগেকার পর্ব, আর কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের পর্ব। করপাস পদ্ধতি বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করার পর থেকে এবং এই বিষয়টি নীলাদ্রিশেখর তাঁর বইয়ে ভালোই দেখিয়েছেন। তবে বইটি যেহেতু এই বিষয়ে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই, তাই বিষয়টিকে সাধারণ উৎসাহী পাঠকের কাছে উপস্থাপনের জন্য যতদূর সম্ভব একটা সরল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে তাঁকে। তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, অথচ অতিসরলীকরণের দোষও তেমন ঘটেনি। এই বই পড়ে পাঠক জানবেন, ভাষাংশ বলতে কী বোঝায়। পাঠক জানবেন, কোনো ভাষার নানান ব্যাবহারিক দিকে চর্চা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কীভাবে নির্ভর করা যায় বা করতে হয় করপাসের উপর।

একথা ঠিক যে, চমস্কির অনুগামী ভাষাবিজ্ঞানীরা করপাসকে তেমন গুরুত্ব দেন না। আমরা অবশ্য চমস্কির ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে এই পদ্ধতির কোনো বিরোধ দেখি না। চমস্কি কোনো একটিমাত্র ভাষার কথা বলেননি। মানবজাতির সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই তাঁর তত্ত্ব প্রযোজ্য। তিনি বিশ্বজনীন ব্যাকরণের কথা বলেছেন, মানুষের এবং বিশেষত শিশুর সহজাত ভাষাবোধের কথা বলেছেন, এবং সংবর্তন ও সঞ্জননের প্রক্রিয়ায় সীমিতসংখ্যক সূত্রের সাহায্যে অসংখ্য বাক্য তৈরির কথা বলেছেন। কিন্তু শেষ বিচারে কোনো তত্ত্বই কি আরোহ পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া গড়ে উঠতে পারে? বিজ্ঞানের সূত্র প্রতিষ্ঠিত ও যাচাই কি আরোহ পদ্ধতিতেই হয় না? আর করপাস পদ্ধতির ভিত্তি তো সেই আরোহ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও সমাবেশ। তা যদি হয়, তাহলে এই পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করার তো কারণ দেখি না। বরং আমরা দেখেছি, এককালিক (synchronic) রীতিতে কোনো ভাষাকে দেখবার ও বুঝবার কাজে প্রভূত সাহায্য করতে পারে করপাস ভাষাপদ্ধতি। আর এও লক্ষ করবার যে, কয়েকজন বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিতে কাজ করেও চলেছেন। নীলাদ্রিশেখর তো আছেনই, আছেন বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী এবং আরও অন্যান্যেরা।

ইংরেজি ভাষার বিস্তৃত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কম্পিউটার -নির্ভর করপাস কতদূর ব্যবহৃত হতে পারে তার একটি সর্বজনপরিচিত দৃষ্টান্ত COBUILD অর্থাৎ Collins Birmingham University International Language Database. এছাড়া আছে Brown Corpus (Brown University Standard Corpus of Present-day American English (1961), LOB (London- Oslo- Bergen Corpus, London -Lund Corpus (1987), Longman -Lancaster Corpus (1996), British National Corpus, 1996 প্রভৃতি। সারা পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষার জন্য যত করপাস গড়ে উঠেছে এ হল তার কয়েকটি মাত্র। এ থেকে করপাসের ব্যাপক উদ্যোগের একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গেও যে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ভাষাবিশ্লেষণের কাজ চলছে, একথা

আগেই বলেছি। প্রধানত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকল ইনস্টিটিউটেই সে কাজ হয়ে চলেছে। করপাস তৈরির কাজ যেমন হচ্ছে তেমনি বিভিন্ন টেক্স্টের সাংখ্যাতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাজও হচ্ছে। অন্য দিকে, করপাস তৈরির কাজে এগিয়ে এসেছে সাহিত্য সংসদের মতো প্রতিষ্ঠানও। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'সংসদ শব্দজগৎ' নামে ব্যাবহারিক বাংলা ভাষার একটি করপাসের সফটওয়্যার যা বানান পরীক্ষণের (spell check) ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

করপাস ভাষাপদ্ধতির যে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তা এর সমর্থকেরাও অস্বীকার করেন না। অধিভাষা (metalanguage), অপূর্ণাঙ্গ ভাষা (sublanguage) প্রভৃতি বিষয়ে করপাস ভাষাপদ্ধতির অনুসন্ধান এখনও যথেষ্ট নয়। এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে নীলাদ্রিশেখর দাশও কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও ভাষাবিশেষের প্রকৃতি ও প্রয়োগের গবেষণায় এবং অভিধান প্রভৃতির সংকলনে করপাসের অর্থাৎ ভাষানমুনা সংগ্রহের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। করপাস ভাষাবিজ্ঞানের নানা দিকই এতে আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র আছে, বিশদ আলোচনা নেই। বহুভাষিক ভাষাংশ সংগ্রহ বা multilingual corpora নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা হয়ে চলেছে তারও একটা হদিশ এই বইয়ে থাকলে ভালো হত। এ বিষয়ে ম্যাকেনরি, উইলসন, গোসিয়ে, জোহানসন প্রমুখের গবেষণার কথা জানা যায়। লিখিত বাংলার করপাস বিষয়ে নীলাদ্রিশেখরের আলোচনা এই বইয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ।

পরিশেষে একটি-দুটি অনুযোগের কথা জানাতে চাই। প্রথমত, বইটির পাতায় পাতায় অজস্র ছাপার ভুল চোখকে বড়োই পীড়া দেয়। অনাকাঙ্খিত(পৃ ২), নিষ্কাষন, সুষ্ঠ(১৮), বহির্ভুত(২৫)এসব তো আছেই। এ ছাড়া নথি/নথী, শ্রেণি/শ্রেণী, এইরকম দ্বিধান্বিত বানানও আছে। আছে আইনী, সূচীপত্র, পূর্বসূরী, রানী-র মতো বর্জিত বানান। বিশেষ্য ও বিশেষণে একাধিক জায়গায় 'লক্ষ' বানান দেখছি। যে বইয়ের বিষয় ভাষা, তাতে কোনো ছাপার বা ভাষার ভুল থাকা অনুচিত।

লেখক ভাষানমুনাকে ভাষাংশ বলেছেন। সেই ভাষানমুনার সংগ্রহকে অর্থাৎ করপাসকে বলেছেন ভাষাংশ সংগ্রহ। এবার তাহলে corpus linguistics-কে কী বলা হবে? ভাষাংশ সংগ্রহ ভাষাবিজ্ঞান? এই পরিভাষা নিয়ে লেখক আর একটু ভাবলে ভালো হয়। ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে 'ভাষাংশ' কথাটাকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে দেখি corpusও ভাষাংশ, আবার করপাসধৃত ভাষানমুনাও ভাষাংশ। তিনি লিখেছেন— 'ব্যবহারিক প্রমাণের প্রধান ও একমাত্র উৎস হল ভাষাংশে অন্তর্ভুক্ত ভাষা-নমুনা'(পৃ ২১২)। এখানে ভাষাংশ বলা হয়েছে corpus কে। এই প্রয়োগ অসংগত। এসব গুরুতর খামতি নয় অবশ্যই। লেখকের এই বই যে বাংলায় ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে চমস্কির তত্ত্বকে আসর থেকে সরিয়ে দেবার মতো কোনো জোর করপাস ভাষাপদ্ধতির এখনও হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া সমস্ত ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ কোনো মন্তব্য করপাস ভাষাপদ্ধতির অন্বিষ্ট নয়। অন্য দিকে, চমস্কির তত্ত্ব কোনো বিশেষ ভাষা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, তা প্রযোজ্য যে-কোনো ভাষা সম্বন্ধে। একটি তত্ত্ব, অন্যটি ভাষাপদ্ধতি। দুটি দুই দিক থেকে কার্যকারী।

পরমাভাষার কী ও কেন

মানুষের পৃথিবীতে ভাষার সৃষ্টিরহস্য আজ পর্যন্ত ভেদ করা যায়নি। যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাবই এর কারণ। অনুমান নিশ্চয় করা যায়, করা হয়ও। কিন্তু সেসব অনুমানের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এতই বিভ্রান্তিকর যে, ১৮৬৬ সালে প্যারিসের ভাষাসমিতি (The Linguistic Society of Paris) তাদের সভায় ভাষার উৎপত্তি নিয়ে সমস্তরকম আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আলোচনা তাতে বন্ধ হয়নি। আলোচনা এবং গবেষণা স্বতঃই এগিয়ে চলেছে। এবং সেসব আলোচনা বয়ে চলেছে বিচিত্র ও বিভিন্ন খাতে। কখনো আলোচনা গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে পারে না, আবার কখনো দেখি আলোচনা উৎকৃষ্ট ও গভীর গবেষণার চেহারা নেয়। যেমন নিয়েছে কলিম খানের 'পরমা ভাষার বোধন-উদ্বোধন' বইয়ে। এই গবেষণার ফলে ভাষাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে এমন দাবি এই বইয়ের লেখকের।

ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক লুই গ্রে বলছেন, চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে মানুষের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই। এবং এও নিশ্চিত যে, সেই তারিখও মানুষের ইতিহাসের অনেক পরবর্তী ঘটনা —Even that data must be relatively late in the history of mankind, and it is clear that language had a long course of evolution behind it. Every language and every language group is evidently the result, even in its earliest known stage, of centuries if not millennia, of development. কীসের ভিত্তিতে গ্রে বললেন একথা?

১৭৮৪-৮৬ সাল নাগাদ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষাকে 'আবিষ্কার' করেন। এই আবিষ্কারের কাজটি প্রথম করেন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones 1746-1794) তিনি বুঝেছিলেন সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন গ্রিক লাতিনের চাইতে বেশি সুসংবদ্ধ ও নিয়মবদ্ধ। তবে এর চাইতেও তাঁর যে উপলব্ধিটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তা এই যে, সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিনের মধ্যে আছে গভীর মিল, যাকে প্রায় ঐক্যই বলা চলে। এই ঘটনাটা ভাষাচর্চার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন হয়ে রয়েছে, কেননা এর পর থেকে নতুন রীতির যে ভাষাচর্চা শুরু হল তার নাম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা comparative philology. সার উইলিয়াম ইঙ্গিত করলেন যে, শুধু এই তিনটি ভাষাই নয়, এমনকী গথিক ও কেলটিক ভাষাও একই উৎস থেকে এসেছে। ইন্দো-ইয়োরোপীয় নামে এক উৎস-ভাষার কথা বলা হল, পিছিয়ে-যাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে সেই আদি ভাষার পুনর্গঠনের চেষ্টা হল। আমরা জানলাম যে, সেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা ক্রমে দশটি ভাষা-পরিবারে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেগুলিও একে একে ভাঙতে লাগল, আর তৈরি হল নতুন নতুন ভাষা-পরিবার।

গোড়ায় একটিই ভাষা ছিল মানবজাতির, এমন অনুমান করেন অনেকে। তবে একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষারও আগে ছিল আরও কোনো এক ভাষা যার কোনো রূপ এখন পর্যন্ত কল্পনা করা যায়নি। ঠিক এখানেই কলিম খান তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আধুনিক কালের অনুমানের অনেক আগেই এই এক আদি বিশ্বভাষার অনুমান করেছে বাইবেল (পৃ ৩৬)। কলিম খান মনে করেন সেই আদি বিশ্বভাষা ছিল ক্রিয়াভিত্তিক। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ, তাতে অর্থ কখনো অস্পষ্ট হয় না।

এ থেকে কলিম খান তাঁর গবেষণাকে পরিচালিত করেন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার দিকে। সংক্ষেপে বলা যায় ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় ক্রিয়াই ভিত্তি, ক্রিয়া থেকেই অপরাপর যাবতীয় শব্দের উৎপত্তি ও প্রসার। এমনকী, নাম বা বিশেষ্যের মধ্যেও আছে 'একটা ক্রিয়াত্মক অর্থ'। ক্রিয়াই 'শব্দের প্রাণ বা আত্মা'। দ্বিতীয়ত, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় রূপক বা উপমা বা প্রতীকী রূপ থাকে না। আবার বহুরৈখিকও বটে ওই ভাষা। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় ব্যুৎপত্তিরই প্রাধান্য।

কলিম খান লক্ষ করেছেন যে, অনেকেই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির উল্লেখ করেছেন এবং সংক্ষেপে তার তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তা নিয়ে যে বিশদ আলোচনা কাম্য ছিল তা আজ পর্যন্ত হয়নি। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার সন্ধান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে ভাষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। তাই ওই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। কলিম খানের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কারা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রসঙ্গত কলিম খান বলেছেন পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহ্ম-এর কথা যিনি ১৯৮০ সালে verb-based language এর কথা বলেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন যে, আমাদের প্রচলিত ভাষায় কোয়ান্টাম বিদ্যার তত্ত্বটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার কিছু অসুবিধা আছে। একমাত্র ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতেই তা করা যায়। কেননা বিজ্ঞানের ভাষাকে হতে হবে প্রত্যক্ষ ও দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধি বা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আর কোনো আলোচনাই কলিম খানের নজরে আসেনি। আর, ডেভিড বোহ্ম কেবল ওই সীমাবদ্ধতার কথাটাই বললেন, তার সমাধান করতে পারেননি।

অবশ্য কলিম খানের নজর এড়িয়ে গেলেও এই বিষয়ে আরও কেউ-কেউ যে কিছু আলোকপাত করেছেন তেমন দৃষ্টান্তও আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ জাহাঙ্গির সোরাবজি তারাপুরওয়ালার Elements of the Science of Language প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। ওই বইয়ের ১৯৭৮ সালের চতুর্থ সংস্করণে দেখছি তিনি বলছেন— Proceeding in this way Panini discovered in India more than 2000 years ago that language is ultimately made up of, what he called ধাতু or roots. (Taraporewala, I.J.S, Elements of the Science of Language, 1978, P 9)। একটি ধাতু থেকে যে অনেক শব্দ তৈরি হতে পারে এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পাণিনি। উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক ইয়োহান হ্যর্ডেরও (Johann Herder) বলেছিলেন যে, ক্রিয়া থেকেই বিশেষ্যের জন্ম হয়েছে (কলিম খান, পৃ ১৩)।

ঈষৎ ভিন্নভাবে হলেও ক্রিয়ার গুরুত্বের কথা পার্শ্বিকভাবে অন্য কোনো-কোনো

একটি অসম্পূর্ণ অভিধান

অভিধান নানা রকমে কাজ করে যায়। যে অভিধানকে ভাষার দর্পণ হিসাবে দেখতে পাই, সেই অভিধানই আবার হয়ে ওঠে ভাষার নিয়ন্তা, ভাষার নির্দেশক। যে-কোনো জীবিত বা সচল ভাষাই সদাপরিবর্তমান। ভাষার সেই পরিবর্তন হয়তো দু-পাঁচ বছরে বোঝা যায় না, কিন্তু দু-পাঁচ দশকে নিশ্চয় বোঝা যায়। ভাষার এই পরিবর্তনগুলো অভিধানে ধরা থাকে বলেই তাকে ভাষার দর্পণ বলি। অন্য দিকে, ভাষার প্রমিতীকরণেও অভিধানের ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অভিধানই স্থির করে ভাষার শব্দসম্ভার, অভিধানই বানানকে সুস্থিত করে দিতে পারে। এমনকী অর্থকে সুস্পষ্ট করে এবং শব্দের প্রয়োগক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিটি শব্দের মান্য রূপ দেখিয়ে দেয় অভিধান। আর এভাবেই ভাষার প্রমিতীকরণের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে অভিধান।

কিন্তু এ ছাড়াও ভিন্নতর উদ্দেশ্য ও নীতি নিয়েও অভিধান রচিত হতে পারে। কোনো সম্পাদক কেবল প্রচলিত শব্দগুলোকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, বর্জন করতে পারেন সমস্ত অপ্রচলিত ও বিরল শব্দ। আবার অন্য এক সম্পাদক হয়তো তাঁর অভিধানে প্রচলন বা অপ্রচলনের কথা মোটেই ভাবতে চান না। তিনি হয়তো চাইবেন এমন এক অভিধান যাতে ধরা থাকবে ভাষার সমস্ত শব্দ। এমনকী কোনো একদিন কোনো একবার কোনো এক সূত্রে যে-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল সেই শব্দও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অভিধানটি হবে সুবিপুল এবং বহুজনের সম্মিলিত সনিষ্ঠ শ্রম ছাড়া তেমন অভিধান কল্পনা করাও যায় না।

জগন্নাথ চক্রবর্তী যে জাতীয় অভিধানটির পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি এই দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যেই পড়ে। প্রয়াত এই প্রধান সম্পাদকের মেধা, অভিধান সম্পাদনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণের জন্য তাঁকে এই কাজের যোগ্য বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। কাজটাও অবশ্য বিরাট মাপের। বাংলা ভাষায় প্রচলিত অচলিত সমস্ত শব্দকে এর বৃত্তের মধ্যে আনতে পারাটা নিশ্চয় নিরতিশয় কঠিন কাজ। কিন্তু শুধু এটাই এই অভিধানের ঘোষিত বা ঈপ্সিত লক্ষ্য নয়। প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি, পূর্ণ ব্যাকরণগত তথ্য ও পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালানুক্রমে সাজানো থাকবে প্রাচীনতম থেকে আধুনিকতম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, থাকবে পরিভাষা, মাঝে মাঝে থাকবে প্রধান ভারতীয় ও অনেকগুলো বিদেশি ভাষার শব্দের রূপ, সন্নিবেশিত হবে তুলনামূলক আলোচনা। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় মূল অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির কথা যার সংকলন শেষ করতে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো ব্যস্ত বছর এবং সপ্তম থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত যত ইংরেজি শব্দের অস্তিত্বের কথা জানা যায় তার সবই ধরা ছিল সেই মহাকোশগ্রন্থে। উপরন্তু প্রতিটি শব্দের প্রয়োগ ও অর্থের বিবর্তনসহ সমস্ত সম্ভাব্য ভাষিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছিল

মহাভাষার ভাষকরা তখন একটিই মহাজাতিতে মিলিত হবে (পৃ ১১৯)। এই তত্ত্বের সঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ আছে। তা হল এই যে, এই কাজে পথ দেখাবে বাংলা ভাষা। যেহেতু লেখক মনে করেন, কেবল বাংলা শব্দের জিন-কালচার করেই পৌঁছোনো যাবে সেই দূর-অতীত মহাভাষায়।

তিন

কলিম খানের সমগ্র তত্ত্বটি যে অনুমানভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রধান অনুমানগুলি হল — (এক) আদি মহাভাষা ছিল ক্রিয়াভিত্তিক ও বহুরৈখিক; (দুই) সেই মহাভাষায় শব্দ ও অর্থের ছিল তাদাত্ম্য সম্পর্ক; (তিন) সুদূর অতীতের সেই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ক্রমে প্রতীকী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে ইত্যাদি। এইসব অনুমান থেকে লেখক কতগুলি সিদ্ধান্তও করেছেন। প্রথমত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক অনুসরণ করলে বোঝা যায় কীভাবে সেকালের বহুরৈখিক বিভিন্নার্থক ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ একরৈখিক একার্থবোধক প্রতীকী শব্দে পর্যবসিত হল, বোঝা যাবে আদিতে এবং তার পরেও অনেক ক্ষেত্রে ভাষার শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো আকস্মিকতা ছিল না, ছিল সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট নিয়ম। আরও একটি সিদ্ধান্ত— বাংলা ভাষার শব্দের জিন-কালচার করলে পৌঁছে যাওয়া যাবে আদি মহাভাষায়, জানা যাবে তার ক্রিয়াভিত্তিক রূপটি কেমন ছিল।

কলিম খান আরও বলেন যে, পরমাভাষার রি-এঞ্জিনিয়ারিং ভাষাতত্ত্বের অনেক 'মিসিং লিংক' উদ্ধার করতে পারবে। যেসব প্রশ্নের উত্তর ভাষাতাত্ত্বিকদের এতাবৎ অজানা ছিল, জানা হয়ে যাবে সেসবও। কলিম খানের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে কি না এখনই তা বলা যায় না। তবে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই প্রাথমিকভাবে অনুমানভিত্তিক। কলিম খানেরও তাই। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে, তাঁর কোনো-কোনো অনুমান অনেকটাই শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

লেখকের মতে আদি মহাভাষার সন্ধান পাওয়া, কিংবা তাঁর ভাষায়, 'সর্বভাষার মূলাধারে পৌঁছে যাওয়া' সম্ভব। আর বাংলা শব্দের জিন কালচার করে পিছোতে পিছোতে সেই আদি ভাষায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। আজ পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরা যা করেননি বা বলেননি, কলিম খান তা বলতে সাহসী হয়েছেন। আবার এক মহাভাষার পুনর্গঠন করে সারা পৃথিবীর মানুষকে অভিন্নভাষী করে তোলার স্বপ্ন যিনি দেখেন তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে কি না জানা নেই। তবে তাঁর তত্ত্বকে যেভাবে তথ্যের উপর যুক্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন তা প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহে। প্রসঙ্গত দু-একটি অতি তুচ্ছ কথাও বলা দরকার। লেখকের গ্লোকালাইজেশান (glocalization) এর তত্ত্বটি ঈষৎ কষ্টকল্পিত বলে মনে হতে পারে। মনে হয় তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর সংগতি যেন নেই, কিংবা তার সঙ্গে এর যোগ কিছুটা দুর্বল। বাংলা ভাষার শতকরা ৯৪টি শব্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে (পৃ১০০), এই মন্তব্যও পুনর্বিবেচনা দাবি করে। এসব সত্ত্বেও এই কথাটা বলা অত্যন্ত জরুরি যে এ-ধরনের ব্যতিক্রমী গ্রন্থ আমাদের ভাষায় খুব অল্পই লেখা হয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিকও বলেছেন। ১৯৩৯ সালে ভাষাতাত্ত্বিক লুই গ্রে লিখেছেন যে, সমগ্র ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্রিয়াকেন্দ্রিকতা। (Louis Gray, Foundations of Language, second printing 1958 p 235)। কাজে কাজেই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা সম্বন্ধে, কিংবা আর একটু সরল করে বলা যায়, ভাষায় ক্রিয়ার মৌলিক অবস্থান ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক লেখকই অবগত ছিলেন। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে, প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ ভাষাই তার ক্রিয়াত্মকতা হারিয়েছে। বহু অভিধানে সন্ধান চালিয়ে কলিম খান দেখেছেন যে, হাজার হাজার সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ এতই বহু-অর্থবোধক যে, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ শনাক্ত করা যাচ্ছে না। উপরন্তু প্রতীকী অর্থও রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ঠিক এখানেই উঠে পড়ে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের প্রসঙ্গ।

দুই

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতীকী শব্দার্থবিধি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। সেই গোলকধাঁধা থেকে পরিত্রাণের পথ কী? কলিম খানের মতে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সন্ধানই একমাত্র পথ। কীভাবে সেই পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব? এখানেই আবার এসে পড়ে পৃথিবীর আদি মহাভাষা বা superlanguage এর প্রসঙ্গ (পৃ ১৫)। সুদূর অতীতে পৃথিবীতে ছিল একটিই মহাভাষা। বলা বাহুল্য, সেই মহাভাষাটি ছিল ক্রিয়াভিত্তিক। সে ভাষায় 'শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক ছিল দেহ ও আত্মার মতো' (পৃ ৬৩)। পরে সেই মহাভাষা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে এবং ছড়িয়ে পড়ে। তার চরিত্রও যায় বদলে। অনুমান করা হয়, সেই আদি মহাভাষা গড়ে উঠেছিল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার অনেক আগে (পৃ ৭৩)। তার একটিই সর্বজনীন রূপ ছিল। এখনও সেই আদি ভাষার সন্ধান করা সম্ভব। তার উপায়টি লেখকের মতে বাংলা শব্দের জিন- কালচার করে, আমরা ওই ভাষাগুলির ভিতরে প্রবহমাণ বংশধারাগুলিকে চিনে নিতে পারি, পৌঁছোতে পারি সর্বভাষার মূলাধারে (পৃ ৬৩)। কলিম খান সেই আদি মহাভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেও প্রয়াসী হয়েছেন। একে কোথাও-কোথাও সনাতন ভাষাও বলেছেন তিনি। তার সঙ্গে সম্পর্কিত যে-ভাষাকে পরমাভাষা বলা হয়েছে তার একটা রূপরেখাও দিয়েছেন লেখক।

কলিম খান এও দেখিয়েছেন যে, এক সময় যেমন আদিভাষা বিচূর্ণীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে এবং বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার ভাষা, তেমনি বর্তমানে একটা ভাষাযুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যার ফলে ভাষায় ভাষায় দ্বন্দ্ব হচ্ছে, আর বহু ভাষা পরাভূত হয়ে বিলীন হবারও সংকেত দেখা যাচ্ছে। সেই বহু ভাষা বিলীন হবে এক মহাভাষায়, যাকে বলা যেতে পারে একাকারে (পৃ ১১০)। প্রমাণ হিসেবে ভাষার বাঁচার লড়াইয়ের উল্লেখ করেছেন লেখক, গত কয়েক শতকে পৃথিবীর শত শত ভাষার বিলুপ্তির কথাও বলেছেন। যদিও ভাষার লোকালাইজেশনকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লেখক একে বলেছেন গ্লোবাল + লোকাল = গ্লোকাল = গ্লোকালাইজেশান (পৃ ১১৫)। তবু লেখকের বক্তব্য মানব সভ্যতা যত অগ্রসর হবে ততই ভাষার সংখ্যা কমে যাবে, ভাষা ততই 'ক্রিয়াভিত্তিক-বহুরৈখিক- সার্বজনীনতার' দিকে যাবে। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা বহুরৈখিক। একটি শব্দ দিয়ে বহু অর্থ বোঝানো যায়। কাজে কাজেই সেই ভাষার শব্দসংখ্যাও হবে কম, সীমিত। আর শুধু মহাভাষার অর্জনই শেষ কথা নয়, সেই

তাতে। আলোচ্য জাতীয় অভিধানও এতাবৎ প্রকাশিত সমস্ত বাংলা অভিধানের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কথা ছিল কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত হবে এই অভিধান। কিন্তু এই প্রথম খণ্ডে আসতে পেরেছে অ থেকে অকস্মাত্ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি মুখশব্দ। অর্থাৎ স্বরবর্ণ শেষ হওয়া দূরের ব্যাপার, অ-কেও পুরোপুরি আনা গেল না। অনুমান করি, স্বরবর্ণ শেষ করতেই লেগে যাবে আরও পাঁচ-ছটি খণ্ড। তাহলে কী দাঁড়াল? কুড়ি কেন, ত্রিশ খণ্ডেও কি শেষ হবে এই অভিধান? প্রশ্ন জাগে, অভিধানের আকার কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না?

প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভালো যে অন্য কোনো বাংলা অভিধানের সঙ্গে এর তুলনা না টানাই সংগত। কেননা, আকারে, শব্দের অন্তর্ভুক্তিতে এবং প্রতিটি শব্দের বা মুখশব্দের আলোচনা-পদ্ধতিতে এই অভিধান দাবি করতে পারে তুলনাহীন বৃহত্ত্ব। কিন্তু নিছক বৃহত্ত্ব একটা অভিধানকে বেশিদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে না। তার অন্য গুণও থাকা চাই। জাতীয় অভিধান সাধারণ ভাষাব্যবহারকারীর সবসময়ের ব্যবহারের কোনো অভিধান নয়। এই অভিধানকে তাই গবেষকের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং ভাষার সর্বকর্মসাধক একটি আকরগ্রন্থ হিসাবেই দেখতে হবে।

এই অভিধানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এতক্ষণে তৈরি করা গেছে। এবারে দেখব কতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে জাতীয় অভিধান রচনার এই প্রচেষ্টা। যতদূর এই প্রথম খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, এই অভিধানে বাংলা ভাষার সমস্ত শব্দই এসে গেছে। শুধু কি তাই? এক-একটি শব্দের প্রয়োগ দেখানোর জন্য বড়ু চণ্ডীদাসের সময় পর্যন্ত পিছিয়ে গেছেন সংকলকেরা। পরপর পরবর্তী প্রয়োগও সালতারিখসহ এসেছে। তার ফলে পাঠক বাংলা শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের বিবর্তনটিকে চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে দেখতে পাবেন। এই অভিধানের মস্ত বড়ো গুণ।

কোনো কোনো আলোচনার গভীরতা ও ব্যাপ্তি রীতিমতো সম্ভ্রম জাগায়। অভিধানের গোড়ার দিকে প্রথম মুখশব্দে অ-এর আলোচনায় সংস্কৃতে অ-ধ্বনির প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে সংকলকরা উপস্থিত করেছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদে, ঋক্ প্রাতিশাখ্যে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে অ-স্বরধ্বনির আলোচনার কিছু অংশ। অন্য দিকে তেমনই এ প্রশ্নও অনিবার্যভাবে উঠে পড়ে—কেন সমস্ত শব্দের আলোচনা তত গভীর বা সুবিস্তারী নয়? পাশাপাশি এ কথাও মনে হওয়া সম্ভব যে, দুই কলাম জুড়ে অইহোল প্রত্নলেখটির সম্পূর্ণ মূল পাঠ এবং আরও দুই কলামে তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এই অভিধানের পক্ষেও অপরিহার্য ছিল কি না। ভাষার সমস্ত শব্দের বিবৃতি থাকবে এই নীতি ভালো। কিন্তু তা বলে নেতিবাচক শব্দ হিসাবে অঅতনু, অআরবি, অক্রমশ, অউদ্ভট, অঅতিথি এই রকম কল্পিত শব্দকেও টেনে আনতে হবে কেন?

প্রতিটি শব্দের অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন মুখশব্দ হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে সন্দেহ করা চলে আদৌ পার্থক্য আছে কি না, কিংবা এই অতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্য একটি পৃথক মুখশব্দের দাবি গ্রহণীয় কি না। 'অংশ' শব্দটির জন্য আট পৃষ্ঠার ষোলো কলাম নিয়ে আছে চুয়াল্লিশটি মুখশব্দ। 'অকর্তব্য' শব্দটিকে নিয়ে রয়েছে আটটি মুখশব্দ। অনায়াসে এগুলোকে তিন-চারটির মধ্যে সীমিত রাখা যেত।

উচ্চারণ বর্ণনায় নানা রকম বিভ্রম ঘটেছে। ৫০ পৃষ্ঠায় অওঁধ করা মুখশব্দে 'করা' অংশের ধ্বনিসংকেত লেখায় ভুল হয়েছে। ২৬৫ পৃষ্ঠায় অকস্মাত্ শব্দের যে-উচ্চারণ ধ্বনিসংকেতে পাচ্ছি তা হল অকশ্‌শাঁত্। এ তো বানান-প্রভাবিত উচ্চারণ। আদর্শ কথ্য বাংলার উচ্চারণ

অকোশ্‌শাঁত্‌। ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন—'বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে তা মূল শব্দের পরেই আন্তর্জাতিক ধ্বনিসংকেতে দেখান (sic) হয়েছে'। বাংলার ঠিক উচ্চারণ কি বানান-প্রভাবিত উচ্চারণ? তা তো হওয়ার কথা নয়। আন্তর্জাতিক ধ্বনিসংকেতে বহু জায়গায় ড ও দ-এর জন্য এবং ধ ও থ-এর জন্য একই সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্পাদকীয় সতর্কতা কাম্য ছিল।

অংশু (কিরণ অর্থে) শব্দের ইতালীয় প্রতিশব্দ raggio-র উচ্চারণ দেখানো হয়েছে—রাজ্‌জিও। এটা একেবারেই ভুল। প্রকৃত উচ্চারণ রাজ্‌জো। ইতালীয় ভাষায় gi = জ। তাই gia = জা, gio = জো। অকরুণ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে দেওয়া হয়েছে Senza Pieta শব্দটি। কিন্তু ইতালীয় ভাষায় senza pieta মোটেই বিশেষণ নয়, এটি ক্রিয়া-বিশেষণ, অর্থ নির্দয়ভাবে।

বানানেও বিস্তর গোলমাল দেখা যাচ্ছে। একই শব্দের দু-তিন রকমের বানান ছড়িয়ে আছে বইয়ের এখানে-ওখানে—কোনও/ কোনো/ কোন, সাজানো /সাজান, নীচু /নিচু, দেখানো/ দেখান, কোরিয়/কোরীয়, ইতালিয়/ইতালীয় এই রকম বহু দৃষ্টান্ত তুলে আনা যায়। তা হলে কি সংকলকেরা যে যেমন লিখেছেন কোনো রকম সম্পাদনা বা পরিমার্জনা না করেই তা ছাপতে দেওয়া হয়েছে? ছাপার ভুলও নিতান্ত কম নয়। ১২ পৃষ্ঠায় বাগ্‌ধারা শব্দের হস্‌চিহ্ন উধাও। ১৩ পৃষ্ঠায় পাচ্ছি অবিস্থত, যা আসলে অবস্থিত। ইংরেজি শব্দ বা গ্রন্থনাম বাংলায় লিপ্যন্তর করার সময় কোথাও কোথাও ইংরেজি রীতি দেখানোর চেষ্টা লক্ষ করি। যেমন ব্যঞ্জনের আগের The কে দ লেখা। তাই যদি হয়, তবে গ্রামার কেন? কেন গ্র্যামার নয়?

এটিকে কেন জাতীয় অভিধান বলা হল, আর ভূমিকালিপিতে প্রধান সম্পাদক কেন বললেন এটি জাতীয় সংহতি সাধন করবে তাও বোঝা শক্ত। মাঝে মাঝে কোনো একটা শব্দের রূপ হিন্দিতে বা গুজরাতিতে বা সিন্ধিতে বা ওড়িয়াতে কী হবে, এবং তার উচ্চারণই বা কী তা দেখিয়ে দিলেই কি জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারবে এই অভিধান?

এই অভিধানের কাজে বহু গবেষক যে যুক্ত হয়েছেন তা এই প্রথম খণ্ডের প্রথম দিকের বিবৃতি থেকে জেনেছি আমরা। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বহুজনের কর্মপ্রচেষ্টা না থাকলে এমন একটি বিপুল ব্যাপার সম্ভব হয় না। কিন্তু সম্পাদকের একটা কঠিন দায়িত্বও থেকে যায়। তা হল অনেকের অনেক রকম রচনাকে সংহত ও সমন্বিত করে একটা সুসমঞ্জস রূপ দেওয়া। সেই কাজটি ঠিকমতো হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। এক-এক জায়গায় এক-এক বানান তো আছেই, এমন কী ভুলভ্রান্তিও তো নেহাত কম নয়। আর অধিকাংশ অসংগতি ও ভুলত্রুটির কারণ সেই সমন্বয়সাধনের অভাব। বাঙালির অনেক দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে যে অভিধানটি পাওয়া গেল তাতে এত ফাঁক-ফোঁকর থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়। এমনকী আনন্দ পাবলিশার্সের আশ্চর্য রম্য এই মুদ্রণও অভিধানটিকে খুব উঁচুতে নিয়ে যেতে পারল না।

* জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত জাতীয় অভিধান প্রথম খণ্ড।

বাংলায় অভিধানচর্চার অগ্রগতি কতদূর?

যদি ১৮১৭ সালের 'বঙ্গভাষাভিধান' কে প্রথম বাংলা অভিধান বলে ধরে নিই তাহলে বাংলাভাষায় অভিধানচর্চার বয়স দুশো বছরের কাছাকাছি হয়। আর যদি ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত মনোএলের 'বাংলা পোর্তুগিজ শব্দকোষ'কে একটি বাংলা অভিধান বলে বিবেচনা করি, তাহলে তো বাংলা অভিধানের প্রাচীনতা আরও বেড়ে গেল। তবে প্রথম দিককার অভিধানগুলি খাঁটি বাংলা অভিধান নয়। সেগুলি দ্বিভাষিক অভিধান, বাংলা-পোর্তুগিজ, বাংলা-ফারসি ইত্যাদি। উনিশ শতকের সূচনা থেকে একভাষিক বাংলা অভিধানের সংকলনও শুরু হয়ে যায়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও রামকমল বিদ্যালঙ্কারেরা বাংলা অভিধান রচনা করেছিলেন। এইসব অভিধান অভিধান-সংকলনের প্রাথমিক কাজটি করেছে বটে, তবে সেকালের পক্ষেও এগুলো যথেষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়। এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা উচিত হবে না। তবে এগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাভাষায় অভিধান-সংকলন তার শৈশব কাটাতে পারেনি।

অথচ কয়েক দশক পরে, ১৯০৬ সালে সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অভিধান সাবালকত্বের দাবিদার হয়ে উঠল। সত্যিই সাবালক হল কি না সে অন্য বিচার। তবে একথা সত্যি যে, বাংলাভাষায় অভিধান-সংকলনের চেহারাচরিত্র অনেকটাই বদলে গেল। তারপর থেকে বাংলা অভিধানের সংকলকেরা নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। তবে পরবর্তী সংকলকেরা সুবলচন্দ্রের একটি ব্যাপার প্রায় কেউই গ্রহণ করেননি। সুবলচন্দ্র কিছু জীবনচরিত আর বাংলা উপন্যাস ও নাটকের কিছু চরিত্র মুখশব্দ হিসেবে রেখেছিলেন। শব্দাভিধানে এটা অন্য কারও কাছেই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি। সুবলচন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে 'সংসদ বাংলা অভিধান' পর্যন্ত অভিধানগুলোতে কি মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, কোনো বড়ো রকমের উন্নতি কি লক্ষ করা যাচ্ছে? অর্থাৎ অভিধান সংকলনে একশো বছরে কোথাও কি কোনো দিক্‌পরিবর্তন দেখছি? আমাদের আলোচ্য সেটাই।

দুই

বাংলা অভিধানে ব্যাপকভাবে ব্যুৎপত্তি দেখানো শুরু করেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ সুবলচন্দ্র মিত্র, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বা রাজশেখর বসু কেউই প্রতি ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তির হদিশ দেননি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন অনেক ক্ষেত্রেই 'সং' বলে ছেড়ে দিয়েছেন। যোগেশচন্দ্র রায় ও রাজশেখর বসুর অভিধানের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন, ব্যুৎপত্তি নির্দেশ সেই

দৃষ্টিভঙ্গিতে খাপ খায় না ততটা। আরও পরে 'সংসদ বাংলা অভিধান' ও 'আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধান' ব্যুৎপত্তি দেখানো বাহুল্য মনে করেনি। তবে হরিচরণ যে বহু ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে শব্দের বিবর্তনই প্রায় দেখিয়ে দিয়েছেন, সংসদ বা বিদ্যার্থী অভিধান সে পথে হাঁটেনি।

শব্দের অর্থ বোঝাবার কায়দাটায় বাংলা অভিধান কখনোই ইংরেজি ডিকশনারির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেনি। সুবলচন্দ্রের অভিধান থেকে শুরু করে অধিকাংশ অভিধানে মূলত প্রতিশব্দ বা সমার্থ শব্দই শব্দের অর্থ হিসেবে বিবৃত হয়েছে। সংসদ অভিধানের নবতম সংস্করণে এবং 'আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধানে' ব্যাখ্যামূলক অর্থ দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 'জল' শব্দের অর্থ 'আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধানে' আছে—(১) বারি, সলিল, অম্বু, পাণি, উদক। (২) দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক পদ্ধতিতে মিশ্রণজাত তরল পদার্থ যা খেতে স্নান করতে ও কাপড়েচোপড় ধুতে ব্যবহৃত হয়। 'সংসদ বাংলা অভিধানে'র পঞ্চম সংস্করণে—(১) স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন স্বচ্ছ তরল, বারি, সলিল, উদক, অম্বু, নীর;...। অর্থাৎ প্রতিশব্দ বা সমার্থশব্দ পুরোপুরি বর্জন করা না হলেও শব্দের বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক অর্থ দেবার চেষ্টা হয়েছে, যে চেষ্টা এর আগে কোনো বাংলা অভিধানে দেখা যায়নি। সমস্ত শব্দেই যে এভাবে ব্যাখা মূলক অর্থ বিবৃতি করা গেছে তা নয়। তবে কাজটা শুরু করা গেছে, এটাই বড়ো কথা।

শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করতে দৃষ্টান্ত বাক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োগ দেখিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। তবে তাঁর প্রয়োগ সাধারণ পাঠকের যতটা কাজে লাগে, গবেষকদের কাজে লাগে তার চাইতে বেশি। কেননা, বহু শব্দের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন। হরিচরণের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানকোষের আকার নিয়েছে বটে, তবে তাঁর প্রয়োগবাক্য যথেষ্ট নয়, সহজও নয় অনেক ক্ষেত্রে। কাজে কাজেই শব্দের অর্থ ও দ্যোতনাকে স্পষ্টতর করার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টান্তবাক্যগুলো খুব কাজের হয়ে ওঠেনি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রয়োগের ব্যাপারে মোটেই উদার নন। অল্প কিছু শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করতে তিনি প্রয়োগ দেখিয়েছেন। অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ দেখাননি তিনি। রাজশেখর বসু কোনো ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত বাক্য দেননি, দেওয়া তাঁর সংকলন নীতির মধ্যে পড়ে না। শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করতে দৃষ্টান্ত বাক্যের ব্যাপক বাবহার হয়েছে 'সংসদ বাংলা অভিধানে' এবং 'আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধানে'। আমরা বলতেই পারি, এই দুই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শব্দার্থের ব্যাখ্যায় এবং দৃষ্টান্ত বাক্য দেখানোয় বাংলা অভিধান অনেকটাই আধুনিক, উন্নত ও পরিশীলিত হতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা বিশেষ দরকার। 'চলন্তিকার' সময় পর্যন্ত এবং তার পরে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' ও 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (কাজী আবদুল ওদুদ) পর্যন্ত অভিধানগুলিতে সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ব্যতিক্রমহীন ভাবে। অভিধানের গাম্ভীর্য ও ঋজুতার জন্যই যে সাধুভাষার প্রয়োজন ছিল একথা কোনো কোনো সংকলকের মনে হয়ে থাকতেই পারে। বিশেষত রাজশেখর বসুর মতো লেখক (যিনি নিজে চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং চলিত ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কারিগরও ছিলেন) কেন চলন্তিকায় সাধুভাষা ব্যবহার করলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। যাই হোক, 'সংসদ বাংলা অভিধানে'র পঞ্চম সংস্করণে এবং 'আকাদেমি বিদ্যার্থী

অভিধানে' আদ্যন্ত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত জরুরি। সময়োপযোগী এই ভাষা বদল বাংলা অধিধানকে অনেকটাই আধুনিক করে তুলেছে।

তিন

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা কেবল একভাষিক শব্দাভিধান সম্বন্ধেই খাটে। বাংলা ভাষায় অভিধান চর্চার প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেছে অন্যত্র। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে বাংলায় নানা রকমের অভিধান সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাচর্চার যত অগ্রগতি হচ্ছে, নানা বিষয়-অভিধানও তার সঙ্গে তাল রেখে রচিত হয়ে চলেছে। অভিধান এখন একটা বহুমুখী ও বহুরূপী ব্যাপার। বিদ্যাচর্চা যতই ছড়িয়ে পড়েছে, ততই নানান ধরনের অভিধান ও রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। আজ এমনই একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র পড়তে গিয়েও প্রতিদিনই পাঠক এমন কিছু বিশেষার্থক বা পারিভাষিক শব্দের মুখোমুখি হচ্ছেন যেগুলোর মানে কিংবা ব্যাখ্যা চলতি শব্দাভিধানে সুলভ নয়, বা যথেষ্ট নয়। প্যারাডাইম, সমান্তরালতা, প্যারালাক্স এরর, থার্ড থিয়েটার, টাইম জোন, গণজ্ঞাপন, লজিস্টিকস, গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, ব্রিংকম্যানশিপ—এই রকম অজস্র শব্দের দেখা পাওয়া যায় প্রতিদিন। কোনোটি দর্শনের পারিভাষিক শব্দ, কোনোটি সাহিত্যতত্ত্বের, কোনোটি-বা জীবাণু-বিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ। এসব শব্দের ব্যাখ্যার জন্য অতএব প্রায়ই আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় অক্সফোর্ড, কলিন্স, পেঙ্গুইন প্রভৃতি হাউসের subject dictionary বা বিষয় অভিধানের।এইসব হাউসের অভিধান শাখার তালিকা দেখলেই বোঝা যায় বিষয় অভিধান কত বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

প্রায় কুড়ি বছর আগে কোনো একটি সংবাদপত্রে একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম বাংলায় বিষয় অভিধানের চর্চা শুরু হয়েছে মাত্র। আজ বলতেই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিষয় অভিধানের চর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকার বাংলা একাডেমীও পিছিয়ে নেই। তবে ঢাকার একাডেমী বিষয় অভিধানকে বিশেষ প্রকাশনক্ষেত্র হিসেবে দেখেনি। ১৯৮২ সালে একটি নিবন্ধে হুমায়ুন আজাদ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, অভিধান সংকলনের কাজে ঢাকার বাংলা একাডেমী একরকম ব্যর্থই হয়েছে। আজ ২০০৬ সালে অবশ্য অতখানি রূঢ় হওয়া যাচ্ছে না। কেননা, বাংলাদেশের একাডেমী থেকেই প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহাসিক অভিধান, নজরুল শব্দকোষ, চরিতাভিধান, সংগীত সাধক অভিধান। একথা ঠিক যে, চল্লিশ বছরের সময়কালে এই কটি বিষয় অভিধানের প্রকাশ মোটেই যথেষ্ট নয়। একাডেমীর অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেবার ফলে বিষয় অভিধান কিছুটা অবহেলিত হয়ে থাকতে পারে।

চার

তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে বিষয় অভিধানের প্রতি মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে যে প্রচুর বিষয় অভিধান প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিশিষ্ট প্রকাশনা হিসেবে স্মরণ করতে হবে 'আকাদেমি বানান

অভিধান' ও 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ'। তবু বলব, বিষয় অভিধানের প্রতি বাংলা আকাদেমির কিছুটা অমনোযোগই লক্ষ করি। আকাদেমির বাইরে অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থা থেকে অজস্র বিষয় অভিধান গত কয়েক দশকে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে পৌরাণিক অভিধান, রবীন্দ্র অভিধান, বৈষ্ণব অভিধান, লৌকিক অভিধানের মতো চমৎকার অভিধান। এছাড়া আছে রবীন্দ্র শব্দকোষ ও বিবিধার্থ অভিধান। এগুলি অন্তত তিন-চার দশক আগেকার কিংবা তারও আগেকার প্রকাশনা। এবং স্বস্তির কথা এটাই যে, বিষয় অভিধানের সংকলন থেমে থাকেনি, বরং বহুমুখী ধারায় এগিয়ে চলেছে।

সাহিত্যসংসদ যে এ বিষয়ে অগ্রণী তা সকলেই জানেন। এই প্রকাশনালয় থেকে গত কয়েক বছরে পাঠক পেয়েছেন বাঙালি চরিতাভিধান, ব্যাকরণ অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, বাগ্‌ধারা অভিধান, জীববিজ্ঞান অভিধান, ভূবিজ্ঞান অভিধান, ইতিহাস অভিধান, অর্থবিদ্যা অভিধান, যুক্তিবিজ্ঞান অভিধান, সাহিত্যসঙ্গী ইত্যাদি। সবগুলিই যে নিখুঁত, তা হয়তো নয়। তবে এই সব নানা বিষয়ের অভিধান প্রকাশে সাহিত্য সংসদের উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আনন্দ পাবলিশার্সও সম্প্রতি নানা ধরনের অভিধান প্রকাশে আগ্রহী হয়েছে। আর প্রকাশনালয় যখন আনন্দ পাবলিশার্স, তখন বলা যেতেই পারে, এখানকার অভিধানগুলি নির্ভরযোগ্য হবে আর মুদ্রণেও পারিপাট্য সুচারুতা ও রম্যতার অভাব হবে না। এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি অভিধান, লেখক ও সম্পাদকের অভিধান, আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান। এই সব প্রকাশনালয়ের বাইরেও চলেছে বিষয়-বিষয়ান্তরের অভিধানের আয়োজন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে স্ল্যাং-সম্বন্ধীয় দুটি অভিধান। কোনোটিই হয়তো নিখুঁত নয়, সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু এই আরম্ভের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না।

তাহলে কি একথা বলাই যায় যে, বাংলা ভাষায় অভিধানচর্চায় একটা গতি এসেছে, জোর কদমে এগিয়ে চলেছে নানান অভিধানের সংকলন প্রচেষ্টা? বলাই যায় তা। যদি পঞ্চাশ বছর আগেকার পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখি, তাহলে আজকের এই ব্যাপক উদ্যোগে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। তার মানে একথা বলা নয় যে, যা হচ্ছে বা যা হয়েছে তারপর আর চাইবার বা পাবার কিছু নেই। যখন ইংল্যান্ড-আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বিস্ময়কর সব অভিধানের কথা মনে আসে, তখন আমাদেরও চাহিদা বেড়ে যায়, আক্ষেপ পরিণত হয় আশায়। যখন হ্যালিডের শেক্সপিয়ার কম্প্যানিয়ানের মতো বই হাতে নিই তখন মনে হয় আমাদের বঙ্কিম অভিধান বা রবীন্দ্রশব্দকোষ কোনোটিই যথেষ্ট নয়। মনে হয় কোনো দিন হয়তো কেউ কেবল রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়েই নয়, সংকলন করবেন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ কম্প্যানিয়ান। এই কাজের দুরূহতার কথা কারো অজানা নয়। তবু সাহস স্পর্ধা আর দুর্মর নিষ্ঠা নিয়ে কেউ কোনোদিন একাজে ব্রতী হবেন এ আশা নিশ্চয় দুরাশা নয়।

অভিধান সংকলনের কাজ কতদূর শ্রমসাধ্য কতদূর অভিজ্ঞতা-বিহিত তা জানেন কেবল সংকলক নিজে। কয়েক বছরের চেষ্টায় সংকলন করেছি একখানি 'বিবিধ বিদ্যার অভিধান'। এধরনের অভিধান ইংরেজিতে দুষ্প্রাপ্য নয়। অথচ অদ্যাবধি বাংলায় পাওয়া যায়নি তা। এই আক্ষেপ থেকেই জন্ম নেয় এই অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা। আমার সুবিধা ছিল এই যে,

হাতের কাছে ছিল একাধিক ইংরেজি মালটিডিসিপ্লিনারি ডিক্সনারি, যা আমার মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবু কি নিখুঁত আর সব অর্থে সম্পূর্ণাঙ্গ করতে পারা গেছে এটিকে? এই কষ্ট, এই শ্রম, এই অসম্পূর্ণতা একরকম অনিবার্য। তবু খুশির কথাটা এই যে, অভিধান সংকলন এগোচ্ছে। অভিধান—বিষয় অভিধান—এখন আর জনকতক বিশেষজ্ঞের এলাকাভুক্ত বিষয় হিসাবে আটকে নেই। অভিধান সংকলনে এগিয়ে আসছেন অনেকে। বাংলায় বিবিধ ধরনের অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাকে আমরা নিশ্চয় স্বাগত জানাব, নিশ্চয় অভিধান চর্চায় একে উল্লেখনীয় অগ্রগতি বলব।

পরিভাষা ও তার গ্রহণযোগ্যতা

পরিভাষা আসলে একরকমের প্রতিশব্দ, তবে সে প্রতিশব্দ যেকোনো আভিধানিক শব্দের নয়। সে প্রতিশব্দ বিভিন্ন বিদ্যায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের। পরিভাষার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, বাংলায় যে প্রতিশব্দটি উদ্‌ভাবন বা গ্রহণ করব সেটিকে যথেষ্ট অর্থবোধক ও যথাযথ হতে হবে। যে ইংরেজি শব্দের পরিভাষা তৈরি করছি তার অর্থ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একটা ইঙ্গিত যেন বাংলা পরিভাষায় থাকে। দ্বিতীয়ত, একথা কেউ বলে দেয়নি বটে, তবে সাধারণ ধারা হল এই যে, পরিভাষাটি এক শব্দের হওয়া উচিত। অন্তত একটি সমাসবদ্ধ শব্দের হওয়া উচিত। আমরা সচরাচর এক শব্দের পরিভাষাই পছন্দ করি। কিন্তু এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যাচ্ছে যে একাধিক শব্দের পরিভাষাও দুর্লক্ষ্য বা অমিল নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬০) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বইয়ে একাধিক শব্দের পরিভাষাও কিছু আছে। সেখানে percentage শতকরা হার, staminde|বন্ধ্য পুংকেশর আছে। এগুলোকে ব্যতিক্রম ধরতে হবে। এগুলো আছে বলেই উপরে 'সচরাচর' কথাটা বসিয়েছি।

দুই

পরিভাষার প্রসঙ্গ উঠলেই যেন অনিবার্যভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথা মনে পড়ে। অধিকাংশ লোকই বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একথা ঠিক যে, সমস্যা ওই এলাকাতেই বেশি। তবু নিশ্চয় ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিদ্যার সমস্ত শাখাতেই বহু বিশেষার্থক ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেগুলোর যথাযথ পরিভাষা তৈরি না হলে বাংলা ভাষায় সেই বিষয়ের চর্চার গতি ব্যাহত হতে বাধ্য। শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার অনেক শাখাতেই যথার্থ আলোচনার পক্ষে সহায়ক পরিভাষার প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় লেখালেখি করতে গিয়ে শতকরা একশোটিই যে বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে এই তত্ত্ব আমরা মানি না। কিছু ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে পরিভাষার অভাবে ক্রমাগত ইংরেজি শব্দ লিখে যাওয়াও কাজের কথা নয়। যেকোনো সময় দরকার হতে পারে anagram, addendum বা appendix, palaeography, referentialism প্রভৃতি শব্দের বাংলা পরিভাষা। অথচ এগুলো বিজ্ঞানের শব্দ নয়, এর কোনোটি সাহিত্যের, কোনোটি ভাষাতত্ত্বের, আর কোনোটি নন্দনতত্ত্বের শব্দ। তাই বলছিলাম, পরিভাষার কথা উঠলেই কেবল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথা টানলে চলবে না। একটা সামগ্রিক ছবি যাতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটাও দেখতে হবে। বিবিধ বিদ্যায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দেরই পরিভাষার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে।

তিন

পরিভাষা দুরকমভাবে তৈরি হয়। বিদ্যাচর্চার সূত্রে লেখকরা বা গবেষকরা নিজেদের বিষয়ের অনেক পরিভাষা নিজেরাই তৈরি করে নেন। সেসব পরিভাষার কতক পরে সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে যায়, কতক ততটা গৃহীত হয় না। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক পরিভাষা রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকে বাংলায় কিছু আইনগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেইসব বইয়ে বেশকিছু আইনি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। ওই সময় চিকিৎসাবিদ্যারও বহু বই রচিত হয় এবং সেইসব বইয়ে অনেক চিকিৎসা-বিষয়ক বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপাস্থি, মজ্জা, অস্থিত্বচ্ প্রভৃতি শব্দ সেকালেই ব্যবহৃত হয়েছে। পরিভাষা রচনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সংস্থাগত উদ্যোগে পরিভাষা তৈরি করা। সেটা অবশ্য তুলনামূলকভাবে একালের কথা।

পরিভাষার যে উদ্যোগই হোক না কেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়াস বা সংস্থাগত প্রয়াস যাই হোক না কেন, কতকগুলো সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মূলত দুটো সমস্যার কথা বলতে পারি। প্রথমত, অনেক পরিভাষাই যথাযথ নয়। দু-একটা উদাহরণ দিই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি heterostyly-কে বলেছেন অসম পুংদণ্ড। অথচ অসম গর্ভদণ্ড হলেই ঠিক হয়। Exospore-কে বলা হয়েছে রেণুবহিস্ত্বক যা বহিঃরেণু হওয়ার কথা। এগুলো ভ্রমাত্মক পরিভাষার দৃষ্টান্ত। এছাড়া এমন পরিভাষাও আছে যেগুলো এমনই উৎকট যে পাঠকের পক্ষে তার মর্মোদ্ধার খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। Postmaster-General-কে যদি মহাপ্রৈষাধিকারিক বলা হয় কিংবা personal এর মতো একটা অতি সাদামাটা সরল শব্দকে যদি প্রাতিজনিক বলা হয় তবে আমাদের বিবেচনায় পরিভাষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

পরিভাষার ব্যাপারে দ্বিতীয় সমস্যাটা এই যে, পরিভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে না। যে পরিভাষা সংস্থাগতভাবে স্বীকৃত তা অনেকসময়ই সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা পাঠক ব্যবহার করছেন না। শুধু তা-ই নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির পরিভাষা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ গ্রহণীয় মনে করছে না। পর্ষদের প্রকাশিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিতে অন্যরকম পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। একই শব্দের একাধিক পরিভাষা চলছে এর ফলে। Percent কোথাও প্রতিশত, কোথাও শতাংশ, কোথাও শতকরা। Osmosis-কে কেউ বলেন আস্রবণ, কেউ বলেন ও লেখেন অভিস্রবণ। Vertical section কোথাও হয়েছে ঊর্ধ্বাধ ছেদ, কোথাও উল্লম্ব ছেদ। এইসব বিভিন্নতা একান্তই অনভিপ্রেত।

চার

পরিভাষা যদি জনপ্রিয় না হয়, যদি সর্বস্তরে একই পরিভাষা গৃহীত ও ব্যবহৃত না হয় তবে আর পরিভাষার মানে কী? কিন্তু পরিভাষা কেন সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে না তাও তো দেখতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতির যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতা নিয়ে কেউ কখনো কোনো প্রশ্ন তোলেননি বা সন্দেহ পোষণ করেননি। কিন্তু তবু তাঁরা এমনসব পরিভাষা তৈরি করলেন যেগুলো একশো ভাগ যথাযথ নয় বা সরল নয়। সমিতির সদস্যরা পরিভাষা রচনায় পুরোপুরি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছেন। নীতিগতভাবে তাঁরা বোধহয়

স্থির করেই রেখেছিলেন যে, সংস্কৃত শব্দই কেবল পরিভাষার উপযোগী। সংস্কৃতের প্রতি এই মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতার ঝোঁকে কখনো-কখনো তাঁরা অত্যন্ত জটিল দুর্বোধ্য শব্দকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

তাঁদের রচিত পরিভাষা জনপ্রিয় না হবার এটি একটি বড়ো কারণ। পরিভাষা রচনার সময় দুটো কথা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজন। প্রথমত, পারিভাষিক শব্দটিকে যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ ও সরল হতে হবে, এবং তা অবশ্যই যথাযথতার সঙ্গে আপস না করে। কিছু সহজ প্রতিশব্দ আমরা হরদম ব্যবহার করি। প্রয়োজনে সেগুলোকে গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই রচিত পরিভাষা থেকে কতকগুলো উদাহরণ নেব। Feather পালক, , Dimorphism দ্বিরূপতা, diaphragm মধ্যচ্ছদা, Gall-bladder পিত্তাশয়, infra-red অবলোহিত, humidity আর্দ্রতা, caulescent সকাণ্ড প্রভৃতি পরিভাষা সহজ পরিচিত স্বচ্ছ এবং এই কারণে এগুলো সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অসংস্কৃত শব্দকেও পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। এক-আধটা অসংস্কৃত পরিভাষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতিও গ্রহণ করেছেন অবশ্য, যেমন crystal দানা, estuary মোহানা, gravel গুটি, vinegar সির্কা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে কিছু অসংস্কৃত পরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। আইন আদালতের পরিভাষায় আরবি-ফারসি ছাড়া গতি নেই। এক্ষেত্রে যদি সেটা মেনে নিতে পারি, তবে কেন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতেও মেনে নেব না?

তৃতীয়ত, অনেক ইংরেজি শব্দের পরিভাষা একরকম জোর করেই তৈরি করা হয়েছে। তার কোনোই দরকার ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দটা রেখে দিলে ভালো হয়, কেবল বাংলা হরফে শব্দটা লিখলেই হল। লেন্স, পেরিস্কোপ, নিউক্লিয়াস, মোটর, কডিক্‌ল্ (caudicle), ক্যাটকিন, আরথ্রোপোডা (arthropoda) ইত্যাদি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতির বইয়েই পাচ্ছি। ওখানেই আছে আরও অনেক এইরকম বাংলা-না-করা পরিভাষা। এতে কোনো দোষ নেই বরং এই ব্যাপারটাকে আরও প্রসারিত করা উচিত। অনেক বছর আগে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই কথাই বলেছিলেন। বাত্যাবর্ত-র বদলে সাইক্লোন, অরণিপ্রস্তর-এর বদলে ফ্লিন্ট, কর্ণদর্ভট-এর বদলে ভেস্টিবিউল লেখাই আমরা সমর্থন করি। তাতে পরিভাষার কাজটাও হবে, পরিভাষা জনবোধ্য হবে এবং সেই কারণে জনপ্রিয়ও হবে।

বানানের সমস্যা ও বানান অভিধানের শাসন

বাংলা ভাষার এখনকার ব্যাবহারিক রূপের বোধহয় সবচাইতে বড়ো সমস্যা বানানকে ঘিরে। বানানের সমস্যা যেমন জটিল তেমনই বিচিত্র ও বিমিশ্র। এতটাই যে, নানা দিকে সমস্যার সমাধানে একটা জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে, গড়ে উঠেছে নানান সমিতি, সংস্থাগত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা বানানের সমস্যা সমাধানের একটা ব্যস্ত আয়োজন চোখে পড়ছে। কিন্তু বানান সংস্কারের কাজটা সহজ নয় মোটেই। বানান সংস্কারের চেষ্টা স্বভাবতই একরৈখিক পথে এগোয়নি। নীতির বিভিন্নতা তাই বানান সংস্কার প্রচেষ্টার অনুষঙ্গ হিসেবে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ফলে কখনো-কখনো এমন শব্দেরও বানান বদলে যাচ্ছে যার বানান নিয়ে সংশয় বা বিতর্ক আগে তেমন ছিল না। কখনো-কখনো সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে, সংশয় হচ্ছে গভীরতর। অবিজ্ঞ সাধারণ বাঙালি এই কূটযজ্ঞে দিশেহারা হয়ে বলে ফেলছেন যে, বানান সংস্কার না হওয়াই বরং ছিল ভালো। বানান সংস্কারের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা অবশ্য কোনো কাজের কথা নয়। একথা নিশ্চয় বলা সম্ভব নয় যে, যতদিন বানান সংস্কারের আয়োজন ছিল না ততদিন বাংলা বানানরাজ্যে কোনো নৈরাজ্যও ছিল না। বরং এইটুকুই বলা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে যে-অনিয়ম চলতে থাকে, তাকে মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়, তাকেই নিয়ম বলে মনে হয় তখন। কিন্তু ভাষাপরিকল্পনার একটা সচেতন প্রয়াস যখন নানাদিকে শুরু হয়, তখন বানান সংস্কার প্রচেষ্টাকেও সেই কর্মধারায় অন্তর্গত করে নিতেই হয়। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা বানান নিয়ে, কিংবা বলা ভালো বাংলা বানানের সমস্যা নিয়ে তেমন বড়ো কোনো আলোড়ন হয়নি। বিক্ষিপ্ত আলোচনা কিছু অবশ্য হয়েছে এখানে-ওখানে। তাই বলে একথা নিশ্চয় বলা সংগত হবে না যে, তখন বাংলা বানানে সমস্যা কিছুই ছিল না। আগেই বলেছি সমস্যা ছিলই, কেবল আলোড়ন ছিল না তা নিয়ে, এই যা। হাজার হাজার অতৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম আরোপ করে সেগুলোর একরকম 'সংস্কৃতায়ন' করা হয়েছিল। গভর্ণর, ষ্টেশন, কর্ণওয়ালিস, ষ্টোর প্রভৃতি বানান আজকের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হলেও তখন এগুলো নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তীর (বাণ), পীর, যীশু প্রভৃতি শব্দে কেন দীর্ঘ-ঈ লাগানো হত তার সদুত্তর নেই। মফস্বল শব্দের এ হেন কিম্ভূত বানানেরই বা কারণ কী? কাজেই অসুবিধা ছিল না, সমস্যা ছিল না একথা বলা যায় না।

দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হতে হতে সাধুভাষার একটা নিরূপিত চেহারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটা শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল তৎসম শব্দের বানানে। সেই টানে অতৎসম শব্দের বানানকেও তৎসমর কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছিল। এ কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু এই শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ সেই 'আরোপিত শৃঙ্খলা'য় ফাটল ধরল। চলিত রীতির ক্রমশ প্রচলন হতে থাকলে লৈখিক ভাষায় কথ্য রীতির প্রভাব বাড়তে থাকে। এমন সব শব্দ লেখ্য ভাষায় এসে পড়ে যেগুলো আগে প্রবেশাধিকার পায়নি কখনো। সেইসব নতুন শব্দের বানান অনেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট বা সুনিরূপিত ছিল না। তাছাড়া বাংলা ভাষা যতই এগোতে থাকে ততই মৌখিক রীতির প্রভাব বাড়তে থাকে। তৎসম শব্দকেও কীভাবে নেব সে-সমস্যাও এসে পড়ে। এই অবস্থায় ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়। রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ এই সংস্কার প্রচেষ্টায় যুক্ত হন। তাঁদের মাথায় ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। এই সমিতি যেসব সুপারিশ বা প্রস্তাব করেছিলেন তার কোনো-কোনোটি গৃহীত হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, আবার অনেক প্রস্তাব লোকে মেনে নেয়নি। আবার ইতিমধ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিতর্ক, নতুন সমস্যাও তৈরি হয়েছে। ১৯৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আরও একটা সমিতি তৈরি হয়েছিল বটে, তবে কিছুদূর অগ্রসর হবার আগেই সেই সমিতির অপমৃত্যু ঘটে।

দুই

একসময় ভাবা গিয়েছিল যে, তৎসম শব্দের বানান নিয়ে কোনো বিতর্ক বা সংশয় নেই। সত্যিই তৎসম শব্দের বানান নিয়ে বড়ো সমস্যা কমই আছে। শব্দের শেষের বিসর্গ (বিশেষতঃ, মূলতঃ, আপাততঃ) একরকম বাতিল হয়েই গেছে। শব্দশেষের হস্‌চিহ্নও এখন অচলিতের পর্যায়ে পড়ে (সম্রাট্, বিরাট্, হনুমান্, ভগবান্)। কিন্তু শব্দের মধ্যের বিসর্গ (মনঃসংযোগ, বয়ঃক্রম) এবং হস্‌চিহ্নকে (বাগ্‌ধারা, দিগ্‌ভ্রম, বাক্‌সংযম) বাতিল করা হয়নি। এগুলোকে নিয়ে এখন আর তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু যেসব তৎসম শব্দের একাধিক বানান সিদ্ধরূপ হিসেবেই আছে তার মধ্যে কোনটাকে নেব? সূচি ও সূচী, অন্তরিক্ষ ও অন্তরীক্ষ, কিশলয় ও কিসলয়, তরি ও তরী, যুবতি ও যুবতী, ধমনি ও ধমনী—এসব বানানের কোনটা গ্রহণীয়? তৎসম শব্দের আর একটা অস্বস্তির জায়গা হল ইন্-ভাগান্ত শব্দ। প্রাণিবিদ্যা, শশিশেখর, প্রাণিজগৎ, এসব বানান দীর্ঘকাল চলছে। সম্প্রতি কোনো-কোনো দিক থেকে প্রস্তাব এসেছে প্রাণীবিদ্যা, শশীশেখর, প্রাণীজগৎ লেখার। এই প্রস্তাব বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির এবং সাহিত্য সংসদের। এক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন মানার তেমন দরকার নেই বলেই সংস্কারকরা মনে করেন। তাঁরা বলেন ইন্-ভাগান্ত ওই শব্দগুলোর বাংলায় দীর্ঘ-ঈকারান্ত রূপই চলে। অতএব সমাস হোক দীর্ঘ-ঈকারান্ত রূপের সঙ্গেই। এখানে একটা খটকা থেকেই যায়। সেটা এই যে, প্রত্যয়ের সময় কেন হ্রস্ব-ইকার তবে? সংস্কারকরা যখন প্রতিযোগিতা, স্থায়িত্ব বাতিল করছেন না, তখন প্রাণিজগৎ, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতিকেই-বা বাতিল করবার কী প্রয়োজন ছিল?

তৎসম শব্দের বানান নিয়ে কিছু অসুবিধে থাকলেও একথা ঠিক যে, এখন অনেক বেশি সমস্যা তদ্ভব, দেশি, বিদেশি প্রভৃতি অতৎসম শব্দের বানান নিয়ে। প্রথমত, ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে অসুবিধে আছে। গেল/গেলো, যেত/যেতো, খেও/খেয়ো, শুও/শুয়ো, কর/করো, পড়/পড়ো, এর মধ্যে কোন বানান গ্রহণীয়? দ্বিতীয়ত, অসংস্কৃত শব্দে বহু ক্ষেত্রেই হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-ইকার প্রচলিত হলেও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দেও কি হ্রস্ব-ইকার লেখা হবে? তৃতীয়ত,

উচ্চারণানুগ বানান কতদূর গ্রহণীয়? তদ্ভব শব্দের গোড়ায় দীর্ঘ-ঊ, দীর্ঘ-ঈ হবে কি? চতুর্থত, অতৎসম শব্দে ব-ফলা ও য-ফলা রাখব কি? স্বপন, সূয্যি, সন্ধ্যে হবে কি? এইগুলোই এখন পর্যন্ত বানানের সমস্যার এলাকা। যাবতীয় তর্ক-বিতর্ক এসব নিয়েই মূলত। মোদ্দা সমস্যা এগুলোকে নিয়ে হলেও প্রতিটি বিষয়ে প্রচুর খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অবিরাম তর্ক আছে। একথা যদিও অস্বীকার করা যায় না যে, বিতর্কিত বিষয় আগের তুলনায় এখন কমে এসেছে অনেকটাই, কিন্তু তাই বলে একথাও বলা সম্ভব নয় যে, বিতর্কের এলাকা একেবারেই ছোটো হয়ে গেছে। বিতর্ক এখনও আছে অনেক বিষয়েই।

তিন

আগেই বলেছি যে, বানান নিয়ে বিতর্ক কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু কমে যাওয়ার কারণটা কী? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির প্রচেষ্টা যেমন এর পিছনে আছে, তেমনি আছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাহিত্য সংসদের মতো কিছু প্রতিষ্ঠানের বানান সংস্কারের উদ্যোগ। এইসব প্রতিষ্ঠান ঠিক-যে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছেন তা নয়। এঁদের চেষ্টা মূলত বানানের জটিলতা নিরসন ও একরূপতা সাধনের জন্য। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা বা আকাদেমির প্রয়াসের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাহিত্য সংসদের প্রয়াসের একটা বড়ো তফাত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যে 'বানান-বিধি' রচনা করেছিলেন তা মূলত আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্যবহারের জন্যে। পরে এই বানান-বিধিকে প্রসারিত করে তৈরি হয় 'বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন'। সাহিত্য সংসদও তেমনই একটি সমিতি তৈরি করেছেন। সেই সমিতি দীর্ঘ ও পৌনঃপুনিক বৈঠকে বানানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিছু নিয়মের সুপারিশও করেছেন। কতকটা সেই নিয়ম অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে 'সংসদ বানান অভিধান'। বলা হয়েছে 'এই বইয়ের বানান ভবিষ্যতে শিশু সাহিত্য সংসদ ও সাহিত্য সংসদের সব বই ও অভিধানে ব্যবহৃত হবে'। অন্য দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নিছক প্রকাশনাসংস্থা মাত্র নয়। এঁরা সমগ্র বাংলাভাষীর কথাই ভেবেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সুপারিশ তাই সমস্ত বাঙালির জন্যেই। তাঁদের আশা, সকলেই তাঁদের প্রস্তাবিত বানান অনুসরণ করবেন। একথা সত্যি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সুপারিশই জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু অনেক সুপারিশ গৃহীতও হয়েছে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সমস্ত সুপারিশ বা প্রস্তাব গৃহীত না হলেও আকাদেমির প্রস্তাবই এখন পর্যন্ত সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে, কাজে-কাজেই ব্যাপকভাবে গৃহীতও হয়েছে। বানান সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাবার এটা একটা কারণ নিশ্চয়।

এইসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের বাইরেও বানান সমস্যা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ১২৯২ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তাঁর বানানবিষয়ক মতামতের ইশারা পাওয়া গেছে। তবে তাঁর বানান ভাবনার বিশদ আলোচনা পাওয়া গেছে 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইয়ে। তাছাড়া ১৩২৩ ও ১৩৩৯ সালে দুটি, ১৩৪৩ সালে দুটি এবং ১৩৪৪ সালে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানান সম্পর্কে তাঁর অবস্থান মতামত স্পষ্টই

জানিয়েছিলেন। উপরন্তু একথাও অনেকেরই জানা আছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগের পিছনেও ছিল তাঁরই আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের পরে রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও পরে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিত ও লেখকদের ক্রমাগত চিন্তা ও বিবেচনা বাংলা বানানের অনেক অস্পষ্টতা দূর করেছে, সংস্কারমুক্ত বানানের পথে অগ্রসর হতে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছে।

শব্দের শেষের বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন সহজে বিদায় নেয়নি। আজও যে একশো ভাগ লোপ পেয়েছে তাও নয়। তবে, মোটামুটিভাবে এখন শব্দশেষের বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন আর ব্যবহৃত হয় না এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্বও একেবারেই অচলিত হয়ে গেছে এখন। তৃতীয়ত, অসংস্কৃত বা অতৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ষ ও মূর্ধন্য-ণ কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় এখন। অকারণ স্ত্রীলিঙ্গ এবং অকারণ দীর্ঘ-ঈকারের ব্যবহারও অনেকটাই কমে এসেছে। এইসব সরলতা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই পরিণাম, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবে, আগেই বলেছি, সমস্যা এখনও আছে এবং ভালোরকমই আছে।

এবার তাহলে দেখা যাক, বাংলা বানানের রাজ্যে এখনও সমস্যা কোথায় আছে, কোথায় আছে বিশৃঙ্খলা আর জটিলতা। প্রথম কথাটাই এই যে, অনেক বাংলা শব্দের বিকল্প বানান আছে। তৎসম শব্দেও বিকল্প বানান যেমন আছে, তেমনি বিকল্প আছে অতৎসম শব্দের বানানের। এক-এক জায়গায় এক-এক বানান যদি লেখা হয়, তবে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যেই অন্য অনেকে যখন বানানের জটিলতা বা বিভ্রান্তি নিরসনের কথা ভাবছিলেন, তখন অরুণ সেন ভেবেছেন বিকল্প বর্জনের কথা। কেননা বিকল্পের স্বীকৃতি অযথা সমস্যাকে জিইয়ে রাখে। একথা মণীন্দ্রকুমার ঘোষও খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এখনও প্রচুর শব্দের বিকল্প বানান থেকে গেছে।

এর পরের প্রশ্নটা এই যে, বিকল্প যদি বর্জন করতেই চাই, তাহলে, তৎসম শব্দের যেসব বিকল্প বানান আছে তার মধ্যে কোনটা গৃহীত হবে, আর কোনটাই-বা বর্জিত হবে? সূচিপত্র, সূরি, কিশলয়—এসব বানান একরকম চলে গেছে। ইতিমধ্যে চালু হয়েছে শ্রেণি বানান। তরি, ধমনি বানানও প্রায়ই দেখতে পাই। কিন্তু রজনি, যুবতি, লহরি, অবনি এখনও সেভাবে চালু হয়নি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কী? তৃতীয়ত, বিদ্রূপ ও কাহিনী এই দুটো শব্দকে দীর্ঘকাল যাবৎ একটা ভুল ধারণার কারণে দীর্ঘ-স্বরচিহ্ন দিয়ে লেখা হয়ে আসছে। কোনোটাই তৎসম শব্দ নয়। কাজেই বিদ্রুপ ও কাহিনি লেখায় কোনো বাধা নেই। বহু লোকে এখন বিদ্রুপ লিখছেন, কাহিনি লিখছেন। যদিও সবাই এখনও মানতে পারছেন না। এই পরিবর্তিত বানান সকলের সহ্য হবে? চতুর্থত, সাধারণভাবে অতৎসম শব্দে দীর্ঘ-ঈকার অপ্রয়োজনীয় একথা আমরা মেনে নিয়েছি। তাই মাসি, পিসি, কাকিমা, বুড়ি বেশ ভালোই চলছে। সেই সঙ্গে তাঁতিনি, সাপিনি, বাঘিনি, চাঁদিনি, ইদ, ইসপ, ইগল এই সব হ্রস্বই-কারান্ত শব্দকেই সমর্থন করি। সকলে অবশ্য অতদূর যেতে চান না এখনই। পঞ্চমত, অতৎসম শব্দে ব-ফলা, য-ফলা কতদূর রাখব? মফস্বল বানান আস্তে আস্তে চলে গিয়ে মফস্‌সল চালু হচ্ছে। কিন্তু স্বপনকে সপন লেখা চলবে কি? জেঠুও চালু হয়ে গেছে। তাই যদি হয় ভব্যির বদলে ভব্বি, কাব্যির বদলে কাব্বি লেখা যাবে কি? কিংবা ওভাবে লেখার দরকার আছে কি আদৌ? বিদেশি না বিদেশী? দেশি না দেশী? বন্দী (কয়েদি) বা বন্দি? ষষ্ঠত,

বাংলা বানানে ব্যুৎপত্তিকে কতদূর অনুসরণ করা সম্ভব, করা উচিত? জিনিস বানানে ব্যুৎপত্তিকে অনুসরণ করব, শরবত বানানেও ব্যুৎপত্তির দোহাই দেব, অথচ মশকরা, মশলা এসব বানানে কেন ব্যুৎপত্তির কথা মনে রাখছি না? কাজেই কোথাও ব্যুৎপত্তি কোথাও বাংলা উচ্চারণের রীতি অনুসরণ করে বানান লেখার নিয়ম করছি আমরা। সাদা, সাহেব, সাবান এসব শব্দে উচ্চারণকে মানছি না। এ কি কম বিভ্রান্তিকর ব্যাপার? সপ্তমত, অসংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষর কতদূর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাখব? পরদা না পর্দা? লেন্স না লেনস? কোম্পানি বা কোমপানি? দর্জি না দরজি? খোন্তা বা খোনতা? অষ্টমত, ধরন বানান জনপ্রিয় হলেও ধরণ বানান যে অসংগত নয় তাও জানা গেছে। তাহলে আবার কি ধরণে ফিরে যাব? নবমত, অসংস্কৃত শব্দ বলে চৌধুরি, লাহিড়ি, বাগচি, হুগলি, নদিয়া এসব বানানই সংগত। চাষি, সাথি, মরমিও এখন জনপ্রিয় হয়েছে। দশমত, সংস্কারকরা চোদ্দো লিখতে বলছেন; মোটামুটিভাবে চোদ্দো গৃহীতও হয়ে গেছে। এর কি দরকার ছিল কোনো? তাহলে এই একই যুক্তিতে হদ্দোমুদ্দো লিখতে হয়। পঞ্চান্নো, ছাপ্পান্নো লিখতে হয়, বাহাত্তর বদলে দিয়ে বাহাত্তোর, নব্বই বদলে নব্বোই লিখতে হয়। পারব এসব লিখতে? সংগত হবে এসব বানান?

চার

দেখতে পাচ্ছি যে, এখন ও বানানে সরলতা সাধনের নানান প্রচেষ্টা ও প্রয়াস সত্ত্বেও বানানের এই জটিলতা ও সমস্যা সকলকেই অল্পবিস্তর অসুবিধেয় ফেলছে। শিক্ষার্থী ও স্বল্পজ্ঞ ভাষাব্যবহারকারীদের তো কথাই নেই, এমনকী শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেই বানান নিয়ে সংশয়ে পড়েন প্রায়ই। মামী না মামি, পাগলী না পাগলি, কিংবা না কিম্বা, উদ্ধৃতি না উদ্ধৃতি, উদ্বোধন না উদ্‌বোধন? এসব নিয়ে কখনো-কখনো বিভ্রান্ত হন অনেক শিক্ষিত বাঙালিও। কে তাঁদের সংশয় নিরসন করবে? কে বলে দেবে উপরের ওই বানানগুলোর মধ্যে কোনটা ভুল কোনটা-ই-বা শুদ্ধ, কিংবা কোনটা অচলিত কোনটা প্রচলিত, কিংবা কোনটা সংগত কোনটা অসংগত? ঠিক এখানেই এগিয়ে আসবে একখানা উত্তম বানান অভিধান। সাধারণ ভাষাব্যবহারকারী নিয়ম নিয়ে অতশত ভাবেন না, তাঁরা হাতের কাছে চান এমন কোনো বই যাতে তাঁরা শব্দের যথার্থ বানানটি পেয়ে যাবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৩৬ সালে ৮ মার্চ সংখ্যায় জ্যোতির্ময় ঘোষ বানান অভিধানের গুরুত্ব কতদূর তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, কেবল বানানের নিয়ম রচনা করলেই কিংবা নতুন ব্যাকরণ প্রণয়ন করলেই বানান-নিয়ন্ত্রণ করা বা নতুন বানান জনপ্রিয় করা আদৌ সম্ভব হবে না। নতুন বানান প্রচলিত ও জনপ্রিয় করতে হলে 'একখানি মাঝারি আকারের অভিধান প্রণয়নই' একমাত্র উপায় 'বলিয়া মনে হয়'। মনে রাখতে হবে যে, জ্যোতির্ময় ঘোষ এই কথাগুলো বলেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতির সুপারিশ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু অরুণ সেন সখেদে বলেছেন, জ্যোতির্ময় ঘোষের ওই বিচক্ষণ ও যথার্থ নিদানের কথাটা তেমন আমল পায়নি বহুকাল। বানান অভিধান প্রণয়ন করে বানানকে শাসনে রাখার এবং সংগত বানানকে প্রচলিত ও জনপ্রিয় করার চেষ্টা অন্তত পক্ষে জ্যোতির্ময় ঘোষের মন্তব্যের পরবর্তী আটান্ন বছরেও হয়নি। যতদূর জানি, অরুণ সেনের বানানের অভিধানই

(ডিসেম্বর ১৯৯৩) প্রথম বাংলা বানান অভিধান। (১৯৯১ সালে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার ব্যবহারবিধি 'বাংলা-কী লিখবেন কেন লিখবেন' বইটিকে ঠিক বানান অভিধান বলা যায় না। তাই একে এই তালিকায় রাখছি না।) তাঁর এই প্রয়াসের ফল ফলেছে খুবই তাড়াতাড়ি। একে একে জামিল চৌধুরীর বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান, পবিত্র সরকার ও অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের (পরে তৎসহ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের) আকাদেমি বানান অভিধান এবং অশোক মুখোপাধ্যায়ের সংসদ বানান অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ এর জানুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে। গত দশ বছরে এই বানান অভিধানগুলির পর পর একাধিক সংশোধিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের পক্ষে এবং সমস্ত ভাষাব্যবহারকারীর পক্ষে এ এক শুভ সংবাদ।

তাহলে আমরা চার-চারটি বানান অভিধান পেয়ে গেলাম হাতের কাছে। ভাবা যেতে পারে বাঙালি ভাষাব্যবহারকারীরা হাতের কাছে পেয়ে গেছেন মুশকিল-আসান। আর কোনো অসুবিধে থাকল না, আর দীর্ণ হতে হবে না দ্বিধায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? চারটি বানান অভিধানে বহু বিষয়ে মতৈক্য আছে এ কথা ঠিক। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বহু বিষয়ে এদের মধ্যে আছে মতভেদ। তাহলে কোথায় দাঁড়াবেন শিক্ষার্থীরা? কোথায় দাঁড়াবেন সাধারণ ভাষাব্যবহারকারীরা? কোনটিকে বিশ্বস্ত অভিধান বলে মেনে নেব তবে? একটুখানি বিশদ ব্যাখ্যা করে নিলেই ভালো হয়।

পাঁচ

অরুণ সেনের বানানের অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৩ এর ডিসেম্বর মাসে। এটিই বাংলা ভাষার প্রথম বানান অভিধান। যে-কোনো বিষয়ের প্রথম বই সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাতে ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু থাকলেও। অরুণ সেনের বইটিও যথারীতি সহজেই সকলের নজরে এসেছে। তবে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন বইটি প্রকাশিত হবার আগে প্রতিক্ষণ পত্রিকায় বাংলা বানানের বিকল্প বর্জনের বিষয়টি নিয়ে বেশ এক প্রস্ত আলোচনা হয়ে গেছে। সেই আলোচনায় বানান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেন এমন অনেক বিশেষজ্ঞ যোগ দিয়েছিলেন। অরুণ সেন যে একটি বিকল্পবর্জিত বানানের অভিধান প্রস্তুত করছেন তার আঁচ তখনই পাওয়া গিয়েছিল।

অরুণ সেনের অভিধানে বিকল্পবর্জিত বানানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিকল্পবর্জনের কাজটা কিন্তু সহজ নয় মোটেই। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার উপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল, বানানের ব্যাপারটা একরৈখিক সূত্র ধরে এগোবে না। কোথাও 'একান্তভাবে নিয়মনিষ্ঠ মনোভাবকে অবলম্বন করতে হবে' এবং কোথাও প্রচলনকে মান্য করতে হবে। এইভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে একটা ঐকমত্য, একটা সামঞ্জস্য।

অরুণ সেনের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই। ঐক্যমত্য বা সামঞ্জস্য সকলেই চান, বানানের ব্যাপারে। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। এখন অরুণ সেন কীভাবে বিকল্প বর্জন করেছেন সেটাই দেখার। আর সেই সঙ্গে এও দেখে নিতে হবে তাঁর প্রস্তাবিত বিকল্পবর্জনের গ্রহণযোগ্যতা কতদূর! তৎসম শব্দের বানান প্রসঙ্গে অরুণবাবু সাধারণভাবে আধুনিক মনের

পরিচয় দিয়েছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া। সূচি, ভঙ্গি, আবলি(রচনাবলি) প্রভৃতি বানানই রাখতে চান তিনি। কিন্তু প্রচলনের যুক্তিতে ধমনী, অবনী, রজনী, তরণী, তরী, অন্তরীক্ষ বানানের গায়ে হাত দিতে তাঁর আপত্তি। এখানে একটা অসুবিধের কথা উঠবে। সূচী, ভঙ্গী, সূরী এসবও একসময় প্রচলিত ছিল। সেগুলোকে পালটানো হল যখন, তখন ধমনি, তরণি, তরি, অন্তরিক্ষ বানান চালু করবারই বা বাধা কীসের? তাছাড়া সর্বত্রই যে আমরা প্রচলিত বানান রেখে দিচ্ছি তা তো নয়। প্রচলিত ইঁটকে ইট করছি, প্রচলিত পুঁথিকে পুথি করছি। হতে পারে এগুলো তৎসম শব্দ নয়। কিন্তু তৎসম শব্দের বেলায়ও তো এইরকম ব্যাপার হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে যা ছিল মন্ত্রিসভা, পক্ষিতত্ত্ব, তাকে মন্ত্রীসভা পক্ষীতত্ত্ব করা হয়েছে। এমনকী, কিংবদন্তীকে অরুণবাবু কিংবদন্তি করতে চেয়েছেন। প্রথমটাই তো প্রচলিত। তবে?

সংগত, সংগীত, বারংবার, কিংবা এসব শব্দে অনুস্বারকে সংগত বলেছেন তিনি। নিস্পৃহ, দুস্থ শব্দের বিসর্গ যেহেতু বৈকল্পিক, তাই এই বিসর্গ বর্জনের পক্ষে তিনি। শব্দান্তের বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন বর্জিত হয়ে গেছে, তাকেই অনুমোদন করেন তিনি। এগুলো নিয়ে কোনো মতভেদের সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে তাঁর কয়েকটি বিবেচনা নিয়ে। দারিদ্র্য শব্দের য-ফলাবর্জিত বানানও সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। য-ফলাওয়ালা এবং য-ফলাহীন দুটি বানানই যখন প্রচলিত, তখন য-ফলাহীন বানানকে স্বীকার না করায় প্রশ্ন উঠবে। দেশী ও বিদেশী এই দুই বানানের পক্ষে তাঁর বক্তব্যে জোর আছে। কিন্তু উদ্‌ উপসর্গকে কোথায় পৃথক রাখা হবে এবং কোথায় তাকে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে যুক্তবর্ণের চেহারা দেওয়া হবে তা নিয়েও আমরা সংশয়ে থাকি। উদ্‌গার, উদ্‌গিরণ, উদ্‌গ্রীব, উদ্‌ঘাটন, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌যাপন কেবল এই শব্দগুলির বেলায় উদ্‌ পৃথক থাকছে। অন্যত্র যুক্তবর্ণ হবে—উদ্ধৃত, উদ্বন্ধন, উদ্বায়ী, উদ্বাস্তু, উদ্বিগ্ন, উদ্বুদ্ধ, উদ্বেগ, উদ্বেজিত, উদ্বেল, উদ্বোধন, উদ্ভব, উদ্ভাবন, উদ্ভিদ, উদ্ভূত। এখানে তিনি দুটি যুক্তিতে দুরকম বানান রেখেছেন। যেখানে 'যুক্তবর্ণ বিযুক্ত করলে লেখার (হয়তো মুদ্রণেরও) সুবিধা হয়' সেখানে ভেঙে লেখা হবে। তাই উদ্‌গার, উদ্‌গ্রীব, উদ্‌ঘাটন, উদ্‌যাপন। এবং যেখানে (বস্তুত, তাঁর ভাষায়, 'বহু জায়গাতেই') প্রচলনের কারণে যুক্তবর্ণ রেখে দেওয়া হবে। এই যুক্তিতে উদ্ধৃত, উদ্বন্ধন, উদ্বায়ী ইত্যাদি। হাতে লেখার সুবিধের কথা বানানের ক্ষেত্রে না তোলাই ভালো, যদিও মুদ্রণের সুবিধে-অসুবিধের কথা আমরা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু নিয়মের কথা বলতে গিয়ে পদে পদেই যদি প্রচলনের জন্যে বাধা পেতে হয় তাহলে বিকল্প বর্জনের ব্যাপারটা দাঁড়াবে কি? যদি প্রচলনের কথাই বলি, তবে উদ্‌ উপসর্গকে পৃথক করে নিয়ে বানান লেখা এখনও প্রচুর দেখা যায় না একথা মানতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই উদ্‌-কে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। এবং আমরা কেউ-কেউ তাঁকে অনুসরণ করে বানান লিখি। কিন্তু একথা তো ঠিক যে উদ্‌বেগ, উদ্‌ঘাটন, উদ্‌গার, উদ্‌বোধন এসবের চাইতে উদ্বেগ, উদ্বোধন ইত্যাদি এখনও অনেক বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। তাহলে, যদি প্রচলনের কথাই ভাবতে হয়, তবে তো যুক্তবর্ণই সবক্ষেত্রে লেখার ব্যবস্থা করতে হয়। তাহলে অন্তত একটা যুক্তির জোর থাকে। অথবা, সবক্ষেত্রেই উদ্‌-কে পৃথক রাখার নিয়ম করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রচলনের কথা ভাবা চলবে না।

অতৎসম শব্দের বানান সম্পর্কেও অরুণবাবু তাঁর অভিধানে কতকগুলো নিয়ম বা সূত্রের কথা বলেছেন। কতকগুলো সূত্র মেনে নিতে আপত্তি হবার কথা নয়। উঠোন, পুরোনো,

দৌড়োনো, অঝোর, তো, হয়তো প্রভৃতি শব্দে ও-কারের ব্যবহার অসংগত নয়। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম রাখতে চান তিনি—পৌঁছনো। এই ব্যতিক্রমটির তেমন প্রয়োজন ছিল না বলেই মনে করি। অনুস্বারের ব্যবহার নিয়ে তাঁর বিবেচনাও সংগত। আমরা লিখব রং রঙের রঙিন, সং ও সঙের, বাংলা ও বাঙালি, ব্যাং ও ব্যাঙাচি। চন্দ্রবিন্দু বর্জন করে লিখব পুথি, ইট, কাচ। এমনকি নয়, লিখব এমনকী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অভিধানে অবশ্য আছে 'এমনকি'। অব্যয় যখন তখন কি, সর্বনাম যখন তখন লিখব কী। জোড়, জোগান, জোয়ান, জোগাড় প্রভৃতি শব্দে বর্গীয়-জ লেখার প্রস্তাবেও আপত্তি করা চলে না। অরুণবাবু সাধারণভাবে অতৎসম শব্দে হ্রস্ব স্বরচিহ্নই লেখার পক্ষপাতী। তিনি পছন্দ করেন তৈরি, খুশি, গায়কি, মাসি, পিসি। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে পুরোনো দীর্ঘ-ঈকারান্ত বানানই তিনি রাখতে চান। তাই নাপতিনী, পাগলী, ভাগনী, নাতনী, নাচওয়ালী, নবাবজাদী, গস্তানী বানান লেখার সুপারিশ করেছেন তিনি। তাঁর যুক্তি এই যে, তৎসব শব্দে 'ঈ' এবং অতৎসম শব্দে 'ই' 'এই দুয়ের সহাবস্থান অনেক সময়ই বানানে বেশ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।' তাঁর আরও বলার কথা, 'কোনটি তৎসম শব্দ এবং কোনটি তদ্ভব, তা সব পাঠক সবসময় মনে রাখতে পারবেন আশা করা অন্যায়।' এখানে একটু গোল বাধে। কোন শব্দ তৎসম এবং কোন শব্দ তদ্ভব তা সব পাঠককে যে মনে রাখতেই হবে এমনই বা কেন দাবি করব আমরা? তাঁরা অভিধান দেখে বানান ঠিক করে নেবেন, সংশয় হলে নিয়ম বুঝে নেবেন। তৎসম এবং অতৎসম সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে বানানের একই নিয়ম যে হবে না, তা তো গোড়াতেই মেনে নিয়েছি আমরা। তৎসম আর অতৎসমতে তফাত করা শক্ত বলেই যদি তৎসমর নিয়ম অতৎসম শব্দের ওপর চাপাতে হয়, তাহলে কিন্তু চাকাটা আবার পিছনে ঘোরাতে হবে। তার চাইতে বরং সমস্ত অতৎসম শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দেও, হ্রস্ব স্বরচিহ্ন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে।

অতৎসম শব্দে খণ্ডৎ-এর ব্যবহার না হওয়াই ভালো তাঁর মতে। এতেও আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানে কয়েকটি যে ব্যতিক্রম রেখেছেন, সংগত ব্যতিক্রমই রেখেছেন, তার উল্লেখও থাকা উচিত ছিল। ধ্বন্যাত্মক শব্দে ৎ ব্যবহৃত হতে পারে—কটাৎ, মড়াৎ। কিন্তু তিনি যে ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন তার খুব-একটা প্রয়োজন ছিল কি না তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। বিদেশি শব্দে তিনি ৎ রেখেছেন—ফৌৎ, বয়েৎ, শিকায়েৎ, শরিয়ৎ, সাঙাৎ। এই শব্দগুলো ৎ নয় ত দিয়ে লেখার একটা অভ্যেস কিন্তু প্রায় তৈরি হয়ে গেছে আমাদের। নতুন করে ৎ-কে আনা উচিত হবে কি? এ কথা ঠিক যে, পুরোনো অভ্যেস সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। তাই অসতর্কভাবে আমরা নাৎসি লিখে ফেলি অনেকসময়। তবু বলব নাত্‌সি লেখার অভ্যেসটা রপ্ত করা যেতেই পারে, যদি নিতান্তই বিকল্প বর্জন করতে হয়।

অতৎসম শব্দে হস্‌চিহ্নকে অরুণবাবু পুরোপুরি ছাড়তে নারাজ মনে হয়। তিনি লেখেন—দিলখোশ্‌, দিলখুশ্‌, দফ্‌তর, দফ্‌তরি। তাঁর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য দিলখোশ আর দিলখুশ হস্‌বিহীন হয়েছে। আমরা বরং মনে করি, প্রয়োজনে ধ্বন্যাত্মক শব্দে, বিভ্রান্তি এড়াতে হলে, কোথাও কোথাও হস্‌চিহ্ন রাখা যায়, কিন্তু দফতর, দফতরি প্রভৃতি শব্দ হস্‌বিহীন হলেই ভালো।

এর পরে আসছে বিদেশি শব্দে অরুণবাবুর শ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। বিদেশি শব্দের মূল

উচ্চারণে যদি শ বা sh থাকে এবং আমাদের উচ্চারণেও যদি শ বা sh হয় তবে তাকে তালব্য শ দিয়ে লেখারই পক্ষপাতী অরুণবাবু। ইসমাইল, ইসলাম, ইস্তাহার, সিগারেট, স্টিমার, সেলাম, মসজিদ, গোমস্তা এইরকম কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অন্যত্র উচ্চারণ অনুসারে তালব্য শ হবে—শৌখিন, চশমা, শেক্সপিয়ার, শার্ট, শহর, শরবত, মরশুম, শহিদ, শখ, পুলিশ, শানাই, শিকদার। এগুলো নিয়ে মতভেদ না হতেই পারে। কিন্তু তিনি যখন শাদা, শাহেব, ফারশি, শাবান লেখেন তখন অনেকেই চমকে ওঠেন। শাদা, ফারশি ও ফরাশি যদি-বা দেখতে পাওয়া যায় কখনো-কখনো (বুদ্ধদেব বসু ও অশোক মিত্র লিখেছেন ওই বানান), কিন্তু শাবান আর শাহেব পর্যন্ত এগোতে অনেকেই নারাজ হবেন। অরুণবাবুর এই বানান সম্পর্কে দুদিক থেকে কথা উঠবে। প্রথমত, যে প্রচলনের যুক্তি তিনি নিজেই অন্যত্র তুলেছেন, এখানে সেই প্রচলনকেই উপেক্ষা করে শাবান আর শাহেব লিখেছেন। আমরা বুঝতে পারি, এ ক্ষেত্রে সর্বত্র একটা নিয়ম নির্দিষ্ট করা যায় না। আর যায় না যে, তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখেছেন। নইলে শিলমোহর যদি হবে, তবে কেন শর্দার হবে না? শমন যদি হবে, তবে কেন শরফরাজি হবে না? তাছাড়া তিনি যখন ফারশি লিখতে পেরেছেন, তখন ফরাশি, শাঙাৎ, শাইবানি লিখতে পারলেন না কেন? পারলেন না, কেননা এসব ক্ষেত্রে প্রচলন ও যুক্তি এই দুয়ের মধ্যে দোলাচলে আমরা অনেকেই। তাই তাঁকেই-বা দোষ দেব কীভাবে? এখানে পরিশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করতে চাই, অরুণ সেন তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৯৬) ফৌত, বয়েত লিখেছেন, পৌঁছোনো রেখেছেন ফরাসিতে স এনেছেন। সাঙাত ও সাইবনিতে দন্ত্য-সকে ফিরিয়ে এনেছেন।

ছয়

ঢাকার বাংলা একাডেমী (ওঁরা এই বানানই লেখেন) ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা বানানকে প্রমিত করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতির রিপোর্ট ১৯৯২ সালের নভেম্বরে পেশ করা হলে তার সুপারিশ মতামত জরিপের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয়। সেই মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একাডেমীর চূড়ান্ত প্রমিত বানান গৃহীত হয়। সেই প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী সংকলিত হয় জামিল চৌধুরীর 'বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান' (প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৪)।

তৎসম শব্দের বানানের সূত্র নির্দেশে জামিল চৌধুরীর অভিধানে একটা বিমিশ্র নীতি দেখতে পাচ্ছি। তিনি সূচি, সূরি, অবনি, অন্তরিক্ষ, ধমনি, তরনি, তরি, তো স্বীকার করেছেনই, এমনকী শ্রেণি বানানও দেখতে পাওয় যাচ্ছে তাঁর অভিধানে। নিঃসন্দেহে এটাকে সামনের দিকে একটা বড়ো পদক্ষেপ বলব। কিন্তু ধাক্কা লাগে যখন 'রজনী' বানান দেখি তাঁর অভিধানে। তিনি, বাংলা একাডেমীর নিয়ম অনুসারে নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে, যেসব তৎসম শব্দের দুটি বৈকল্পিক বানান আছে, তাদের সেই দুটি বানানের মধ্যে সহজটি অর্থাৎ হ্রস্ব-স্বরচিহ্নযুক্ত বানানই গৃহীত হবে। তাহলে কেন রজনী? সমস্ত সংস্কৃত অভিধানেই রজনি বানান পাওয়া যায়।

এই নীতির পাশাপাশি আরও একটা নীতি হতে পারত বিকল্পে যেখানে য-ফলা, সেখানে সেই য-ফলার বর্জন—দারিদ্র, বৈচিত্র। কিন্তু জামিল দারিদ্র্য ও বৈচিত্র্যই রেখেছেন। কারণটা অনুমান করে নেওয়া যায় সহজেই। বাহুল্য হলেও ওই য-ফলা বর্জন না করার সিদ্ধান্তের কারণ প্রচলনকে

মান্য করা। কিন্তু যেখানে তাঁর অভিধানে দীর্ঘপ্রচলিত অনেক অসংগত বানানকে পালটে সংগত নতুন বানান রাখা হয়েছে সেখানে অতৎসম এবং সেই কারণে অসংগত কাহিনী ও বিদ্রূপ বানান একটু বিস্মিত করে আমাদের। মনোবেদনা, মনোগত, মনোবিকার ও মনোবাঞ্ছা বানানে এবং মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিমণ্ডল বানানে অনেক দিনের পুরোনো নিয়মের প্রতি আনুগত্য দেখি। সেই সঙ্গে অবশ্য মনচোর, মনগড়া, মনমরা, এইসব খাঁটি বাংলা সমাসকে বাংলা নিয়মেই লিখেছেন। উদ্ উপসর্গকে কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রে আলাদা রেখেছেন জামিল চৌধুরী—উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌যাপন, উদ্‌যোগ। অন্য সমস্ত শব্দই যুক্তাক্ষরে লিখিত। এর নিয়মটা কী তা বোঝা যাবে না এ থেকে। নিয়মের মধ্যেও স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। কাজেই উদ্ উপসর্গ নিয়ে তাঁর এবং বাংলা একাডেমীর বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

সমস্ত অতৎসম শব্দে জামিল চৌধুরী হ্রস্ব-ইকার লিখেছেন। তিনি নবাবজাদি লেখেন, পাগলি, নাতনি, নাপতিনি লেখেন, বাঘিনিও লেখেন। কিন্তু কেন তাঁর অভিধানে সাপিনী বানান লেখা হল তা বুঝতে পারি না। অনুস্বার সম্বন্ধে তাঁর বাতিক নেই। তিনি রং, সং, ঢং লেখেন অবলীলায়। কেবল তৎসম শব্দে বিকল্পসিদ্ধ অনুস্বার তিনি পরিহার কেন করেন জানি না। তিনি লেখেন সঙ্গম, সঙ্কুল, সঙ্গত, সঙ্গীত, সঙ্ঘ। অথচ তাঁর অভিধানের শেষে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'-এর ১.০৪-এ বলা আছে 'ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে'। কেন তবে দ্বিতীয় বিকল্পটিকেই অভিধানে গ্রহণ করা হল? অভিধানে সংঘ নয় সঙ্ঘ, সংগত নয় সঙ্গত, অহংকার নয় অহঙ্কার কেন? এসব ক্ষেত্রে অনুস্বারকে স্বীকার করলে বানানকানা লোকে টানে-টানে অংক গংগা সংগ ভংগ লিখে ফেলবে সেই ভয়েই কি? জামিল চৌধুরীর ঙ্গ, ঙ্ঘ বানান সমর্থন করি না আমরা। এই বানানের সমর্থন মেলে কেবল আনন্দবাজার পত্রিকার বানাননীতির সঙ্গে।

অনেক ক্ষেত্রে জামিল চৌধুরী পুরোনো বানান রেখে দেওয়ারই পক্ষে। মফস্বল, বিদ্রূপ, কাহিনী, মরসুম লিখে পুরোনো অভ্যাসকেই বজায় রাখতে চেয়েছেন তিনি। মফস্বল বানানটি অতি উৎকট। দীর্ঘকাল ধরে এটি চলছে বটে, তবে এটিকে সংরক্ষণ করার কোনোই কারণ নেই। বিদ্রূপ ও কাহিনী এই দুটি শব্দে দীর্ঘ স্বরচিহ্নের প্রয়োজন নেই, শব্দদুটি যেহেতু তৎসম নয়। আর মরসুম বানানের বদলে মরশুম শুধু সংগতই নয়, এটি এখন যথেষ্ট প্রচলিত।

এসব সত্ত্বেও পঞ্চাশ হাজারের ওপর শব্দ নিয়ে জামিল চৌধুরীর বানান-অভিধান লেখক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই নির্ভরযোগ্য। ছাপার ভুল প্রায় চোখেই পড়ে না, প্রয়োজনীয় অধিকাংশ শব্দই উপস্থিত, যে কথা অরুণবাবুর অভিধান সম্পর্কে খাটে না, অরুণবাবুর অভিধানটি তাঁরই ভাষায় কেবল একটি প্রস্তাব বলেই হয়তো। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে অরুণ সেনের অভিধান অনেকটাই ত্রুটিমুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে এসে। জামিল চৌধুরীর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বা সূত্রের সঙ্গে আমরা একমত হতে হয়তো পারব না। কিন্তু সেটা খুব বড়ো কথা নয়, বাংলা বানান যতদিন পর্যন্ত একরৈখিক পথে না চলবে, এবং তার সম্ভাবনা খুবই কম, ততদিন পর্যন্ত কিছু মতভেদ কিছু সংশয় থেকে যাবেই।

সাত

একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা এতই প্রশ্নাতীত ছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার সমিতি সংগতভাবেই আশা করেছিলেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত বানান গৃহীত হবে, জনপ্রিয় হবে। তাঁদের এই আশা পুরোপুরি মেটেনি। কিন্তু তার নানা কারণ ছিল। আমাদের বলবার কথাটা এই যে, সেইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা ও ওজন ছিল আজ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তো তা নেই-ই, এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ আর ততটা সম্মান বা মান্যতার অধিকারী নয়। ঢাকার বাংলা একাডেমী বানানের যে নিয়মাবলি প্রস্তুত করেছেন, তা কতদূর যুক্তিযুক্ত তার চাইতে বড়ো কথা এই যে, সেই বানান সারা বাংলাদেশে মোটামুটি গৃহীত হয়েছে। অথচ গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করি যে, পশ্চিমবঙ্গে আজ এমন-কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যার মান্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না। তবু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গঠনে যতটা নিরপেক্ষ হতে পেরেছে, তার কর্মতৎপরতা ততটাই আস্থা অর্জনে সফল হয়েছে। আর সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানসংস্কারের উদ্যোগ (যাকে আকাদেমি নাম দিয়েছিলেন 'বাংলা বানানের সমতাবিধান') সম্পর্কে নানাদিকে প্রভূত উৎসাহ কৌতূহল ও আশার সঞ্চার হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৫ সালের বাংলা ভাষা বিষয়ক সেমিনারের সাফল্যের পরে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি বানানসংস্কার সমিতিও গঠন করেন। সেই সমিতির আলোচনা ও বিবেচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় একটি ভিত্তিপত্র, যাতে বাংলা বানানের কতকগুলো সূত্র উদাহরণসহ বর্ণনা করা হয়। সেই ভিত্তিপত্র নানা জায়গায় মতামতের জন্যে পাঠানোও হয়। যেসব মতামত আসে তাতে অনেক গ্রহণ-বর্জন-সংশোধনের প্রস্তাবও ছিল। সেসব সুপারিশ দেখে এবং আরও কয়েক প্রস্ত আলোচনার পরে ১৯৯৫-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ—সুপারিশপত্র'। এবার পাওযা গেল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই নিয়মসূত্রকে অনুসরণ করে পবিত্র সরকার ও অমিতাভ মুখোপাধ্যায় লেখেন আকাদেমি বানান অভিধান (এপ্রিল ১৯৯৭)। এক বছর পরে (জুন ১৯৯৮) দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংশোধিত এবং বিপুলভাবে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে সংকলক হিসেবে প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের নামও যুক্ত হয়। ক্রমাগত গ্রহণ-বর্জন-পুনর্বিবেচনা ইত্যাদির ফলস্বরূপ ২০০৫-এর আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় আকাদেমি বানান অভিধানের পঞ্চম সংস্করণ। ষষ্ঠ সংস্করণও প্রস্তুয়মান।

আগেই বলেছি, বাংলা আকাদেমির বানান অভিধান রচনার আগে আকাদেমির বানানের সূত্রগুলো সুপারিশের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল দুবার। প্রথমটিকে বলা হয়েছিল ভিত্তিপত্র। বলা বাহুল্য, ভিত্তিপত্রের প্রস্তাব অনেকটাই বদলে গিয়েছে পরের সুপারিশপত্রে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। তবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, এই প্রথম বানানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সুপারিশপত্রে লিখনরীতির প্রসঙ্গও আলোচনা করা হল, দেওয়া হল কিছু সূত্রও। হাইফেনের ব্যবহার হবে কি না, দুটো সমাসবদ্ধ শব্দ একসঙ্গে জুড়ে লেখা হবে, না কি আলাদাভাবে, এইসব সম্পর্কে নিয়মের নির্দেশই লিখনরীতির মধ্যে পড়ে। এতকাল সকলে কেবল একটা শব্দের বানান নিয়েই ভেবেছেন, দুটো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ কীভাবে লেখা হবে

তা নিয়ে তেমন ভাবেননি। অবশ্য বর্তমান লেখক পনেরো বছর আগে তাঁর একটি অভিধানে ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই কিছু ভেবেছিলেন এবং অভিধানে কয়েকশো শব্দ একশব্দ হিসেবে লেখা হবে না পৃথকভাবে না হাইফেনযুক্তভাবে তার নির্দেশ করেছিলেন। তবু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির এই সুপারিশপত্রটি এই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, এ বিষয়ে কতকগুলো সূত্র এই প্রথম নির্দেশ করা হয়েছে। তৎসম শব্দের বানানের যেসব সূত্র আকাদেমি নির্দেশ করেছে তাতে কেবল একটি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন থেকে যায়। ইন্-ভাগান্ত শব্দে সমাসবদ্ধ শব্দের বানানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অন্য প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় হবে এবং তা নিয়ে তেমন মতভেদ দেখাও যায় না। যেমন দুটি বানান সিদ্ধ হলে হ্রস্ব স্বরচিহ্নযুক্ত বানান গৃহীত হবে; শব্দান্তে বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন বর্জিত হবে, তবে শব্দের মধ্যে হস্‌চিহ্ন ও বিসর্গ বজায় থাকবে; রেফের নীচে ব্যাঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জিত হবে; ঙ ও ং বৈকল্পিক হলে ং হবে, কিন্তু যেখানে ম্-এর সন্ধির ফলে ং আসেনি, সেখানে শুধুই ম্ হবে। আকাদেমি মনে করে যে, ইন্-ভাগান্ত শব্দগুলির কর্তৃকারকের প্রথমার একবচনের দীর্ঘ ঈকারান্ত রূপই বাংলা শব্দ হিসাবে গৃহীত হয়ে আসছে। তাই সমাস হোক সেই দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দের সঙ্গে, তার প্রাতিপদিক রূপের সঙ্গে নয়। তাই আকাদেমি মনে করে সমাসবদ্ধ শব্দ হিসেবে প্রাণীজগৎ প্রাণীবিদ্যা প্রাণীহিংসা মন্ত্রীসভা মন্ত্রীপরিষদ তো হবেই, এমনকী শশীভূষণও মেনে নেওয়া উচিত। অবশ্য প্রত্যয়ে আগেকার নিয়মই চলবে—সত্যবাদিতা, প্রতিযোগিতা মন্ত্রিত্ব স্থায়িত্ব ইত্যাদি চলবে।

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে আকাদেমির নিয়ম বা সূত্রগুলো সাধারণভাবে বাংলা বানানের বর্তমান প্রবণতাকেই অনুসরণ করেছে মূলত। তৎসম শব্দে আকাদেমি সর্বত্র ব্যতিক্রমহীনভাবে হ্রস্ব-স্বরচিহ্নের প্রস্তাব করেছে, এমনকী স্ত্রীলিঙ্গেও। প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নসূচক সর্বনাম 'কী' এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট করেছে আকাদেমি; তবে তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলে মূল বানান ব্যুৎপত্তির স্মারক হিসেবে রাখা হয়েছে, তাই মূর্খামি, ভূতুড়ে, পূজারি। ও-ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাতে বড়ো ছোটো চোদ্দো পনেরো কালো মতো ভালো বানানের সপক্ষতা করা হয়েছে; কোনো/কোনও, আরো/আরও, এখনো/এখনও, কখনো/ কখনও প্রভৃতি শব্দে বিকল্প রাখা হয়েছে, তবে যত তত কত এত এইসব শব্দে ও-কার নিষেধ করা হয়েছে; অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ায় এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে ও-কারই সংগত—খেয়ো যেয়ো করো ঘুমোনো বাজানো দেখানো পাঠানো। উচ্চারণ যেখানে ঙ্গ কে ঙ করে নিয়েছে সেখানে ঙ্গ নয় ঙ লিখতে হবে—ভাঙা কাঙাল রাঙা লাঙল রঙিন নোঙর ডিঙি ঢ্যাঙা; ব্যুৎপত্তির স্মারকতা রক্ষার জন্য যে যিনি যত যন্তর যা যাওয়া-তে য রাখা হলেও প্রচলিত বলে জুঁই জো জোগাড় জোয়ান জোড়া-তে জ থাকবে। মূর্ধন্য-ণ অতৎসম শব্দে থাকবে না—ঠাকরুন কর্নওয়ালিস ঝরনা কোনাকুনি গোনা। শ বা স হবে প্রচলন অনুসারে—ইসলাম সেলাম মাসি সাদা পিসি তসবির সুলতান ফারসি মুসলিম। কিন্তু শরিফ শহিদ শরবত শহর আয়েশ বাদশাহি। বিদেশি (বিদেশী) শব্দে ঋ-কার নয়, র-ফলা ও হ্রস্ব-ই—ব্রিটিশ খ্রিষ্টান।

বিদেশি শব্দের অনুচ্ছেদে আলাদা করে বলা হয়েছে যে, 'st বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দে স্ট ব্যবহার করে লিখতে হবে'—ইস্ট পোস্ট স্টেশন স্টোর। কিন্তু যা ছিল খ্রিস্টান খ্রিস্ট তাকে কেন আবার ঘুরিয়ে খ্রিষ্টান খ্রিষ্ট করা হল তার উল্লেখ দেখছি না। যে আলোচনার ফলে এইসব সূত্র

তাতে বর্তমান লেখকও যেহেতু হাজির ছিলেন তাই এখানে অনুক্ত সেই কারণটির উল্লেখ করা যেতে পারে—খ্রিষ্টান শব্দটিকে আমরা বাঙালিরা ইংরেজদের মতো করে উচ্চারণ করি না (কোন্ শব্দই বা করি), বরং বলা যায় শব্দটাকে আমরা বদলে নিয়েছি। এই স্ট আমাদের উচ্চারণে কতকটা ষ্ট বা শ্‌ট-এর মতো, তাই খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টান করা হল। এই সূত্রটিকে ঘিরে প্রচুর বিতণ্ডা হওয়া সম্ভব। কেননা বহু এমন বিদেশি শব্দও তো আছে যেগুলোতে দন্ত্য-স লিখছি কিন্তু উচ্চারণ করছি তালব্য-শ। তার বেলা?

যাই হোক, এইসব সূত্র অনুসারে সংকলিত হয়েছে 'আকাদেমি বানান অভিধান'। মোটামুটিভাবে সূত্রগুলোকে সামনে রেখেই যদিও এই অভিধান সংকলিত হয়েছে, তবু কতকগুলো প্রশ্ন থেকেই যায়। সূত্রেই বলা হয়েছে অতৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ লেখা হবে না। তাই গন্ডা, গন্ডগোল, গন্ডার ইত্যাদি শব্দে দন্ত্য-ন লিখতে হবে। সংগীতে ষড়্‌জ একটা অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। কিন্তু তার বানান নিয়ে অনেকেই দ্বিধান্বিত। অভিধানে ষড়্‌জ নেই। পেটরা না প্যাটরা? সিকদার না শিকদার? কতকগুলো শব্দের বানান নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। আঁতাত এসেছে ফরাসি entente-এর উচ্চারণকে অনুসরণ করে। তার উচ্চারণে দুটো চন্দ্রবিন্দু থাকার কথা। কিন্তু আকাদেমি বানান অভিধানে আছে আঁতাত। আমরা বাঙালিরাও তো আঁতাঁত্ উচ্চারণই করি। তবে কেন শব্দটার বানানে একটা চন্দ্রবিন্দু? আকাদেমি বানান অভিধানের সর্বশেষ সংস্করণে মুক্‌খু রাখা হয়েছে। মুখ্যুও রাখা চলত। কেননা পথ্যি, বিদ্যে প্রভৃতির বদলে পত্থি বা বিদ্দে কি হতে পারে? আকাদেমি বানান অভিধানের পঞ্চম সংস্করণে তৎসম শব্দসমূহকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভালো ব্যবস্থা, কিন্তু সেই চিহ্ননে ছিল বিস্তর ভুল। এই ধরনের ভুল কিন্তু খুবই দুঃখজনক।

আট

যে চারটি বানান অভিধান নিয়ে আমাদের এই আলোচনা তার মধ্যে সবচাইতে শেষেরটি সাহিত্য সংসদের বানান অভিধান যার সংকলক অশোক মুখোপাধ্যায়। বাংলা বানানের সরলতাসাধন ও সমতাবিধানের জন্যে সাহিত্য সংসদও একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। সেই সমিতি বারবার বৈঠক করেছে, আলোচনা হয়েছে বিস্তর। সেইসব আলোচনা ও বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসে কিছু সূত্র। অশোক মুখোপাধ্যায় সেই সূত্রগুলোকে অনুসরণ করেই সংকলন করেছেন এই বানান অভিধানটি। যদিও মতানৈক্যও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সংকলিত বানান অভিধানে দেখছি সংকলকের মতই প্রাধান্য পেয়েছে। সংসদের বানানসূত্র আকাদেমির বানানসূত্র থেকে যে অনেক আলাদা তা মোটেই নয়। ভূমিকায় সংকলক লিখছেন 'এই দুই বিধির মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।' পার্থক্য কম হলেও আছে কিছু। সেকথা পরে। আগে দেখব মিল কোথায়। তৎসম শব্দে বিকল্পের ক্ষেত্রে হ্রস্বস্বরচিহ্ন, অতৎসম শব্দে সর্বত্র হ্রস্ব স্বরচিহ্ন, অতৎসম শব্দে দন্ত্য-ন, প্রশ্নসূচক সর্বনামে কী এবং অব্যয়ে কি, তৎসম শব্দের শেষের বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন বর্জন, 'ছন্দ' শব্দটিকে বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে সমাসে ছন্দলিপি ছন্দগুরু ইত্যাদি লেখা, অতৎসম শব্দে ৎ বর্জন, সংখ্যাবাচক ও-কারান্ত শব্দে ওকার (তেরো পনোরো চোদ্দো), নীচ কিন্তু নিচু, ইন্‌ভাগান্ত শব্দে কর্তৃকারকের একবচনের রূপের সঙ্গে সমাসের নির্দেশ, এইসব মিল তো আছেই, আছে

আরও কিছু মিল। কিন্তু কয়েকটা লক্ষণীয় অমিলও রয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে। আকাদেমি কোনো এবং কোনও, আরো এবং আরও, কখনো এবং কখনও এই বিকল্প স্বীকার করে, সংসদ করে না; আকাদেমি মনে করে দেশী ও দেশি, বিদেশী ও বিদেশি বৈকল্পিক হলেই ভালো, সাহিত্য সংসদ তা মনে করে না। সংসদ বানান অভিধানের পরবর্তী সংস্করণে লক্ষণীয়ভাবে নিচু-কে বাদ দিয়ে নীচু করা হয়েছে।

কাজেই তফাত যে খুব নগণ্য তা মনে হয় না। এই তফাতের কথা পরে বিশদ আলোচনা করা যাবে। তার আগে সাহিত্য সংসদের অভিধানটির কথা বলা দরকার। প্রথম কথা, সূত্রে 'আরও' বানান হবে এই ইঙ্গিতই আছে, অভিধানের ভিতরেও আছে—আরও, অর্থাৎ 'আরো' বানান হবে না। অথচ ৫ (ছ) সূত্রে দৃষ্টান্তে দেখছি—আরোই ঘাবড়ে গেল। এই অসংগতির কারণ কী? ১৩ সংখ্যক সূত্রে সংখ্যাবাচক শব্দের প্রসঙ্গে চোদ্দো বানানের কথা বলা হয়েছে। বাংলায় সাধারণত শব্দান্তে যুক্তব্যঞ্জন ও-কারান্তই উচ্চারিত হয়, তার জন্য বানানে ও-কার বাহুল্য মনে হয়। আর যদি তাই হয়, তবে তো একান্নো বাহান্নো আটান্নো আটাত্তোর এসব বানানও মেনে নিতে হয়। চীন শব্দটিকে তৎসম ধরে নেওয়া হয়েছে এবং তা থেকে প্রত্যয়যুক্ত চীনা চীনে বানানও প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ পাশাপাশি হিরা ও হিরে আছে। হীরক থেকে তাহলে হীরা হীরে নয় কেন?

এ তো গেল সূত্রের কথা। অভিধানে অনেক বানান থাকে যেগুলো সূত্র দিয়ে বাঁধা থাকে না। যেমন (acoustics) শব্দটি। আধুনিক ইংরেজিতে এর উচ্চারণ অ্যাকুস্টিকস। এখনও পুরোনো রীতি যাঁরা আঁকড়ে আছেন বলে কেবল তাঁরাই অ্যাকাউস্টিকস বলেন, এবং এঁদের সংখ্যাও বেশি নয়। ড্যানিয়েল জোনজ় তাই ওই উচ্চারণকে archaic বলে চিহ্নিত করেছেন। নিক্ষেপ করা অর্থে ছোড়াতে চন্দ্রবিন্দু থাকার কথা নয়, যদিও অনেকের উচ্চারণে ভুলক্রমে ছোঁড়া এসে যায়। সংসদ বানান অভিধানে ছিল ছোঁড়া। পরে অবশ্য তা সংশোধিত হয়েছে। ভুল উচ্চারণকেও যদি স্বীকৃতি দিতে হয় তবে তো কাঁচ লিখতে হয়, হাঁসাহাঁসি লিখতে হয়। উত্তরভাগ উত্তরমেঘ উত্তরসাধক হলে উত্তর মেরু আলাদা কেন? ছিনাল ও ছেনাল দুটোতেই □ চিহ্ন কেন? তবে কি সংকলক দুটোকেই সমান পছন্দ করছেন?

এই অভিধানে এমন বহু শব্দ আছে যেগুলো চালু নয় মোটেই, বাঙালির মুখের ভাষায় বা লিখিত সাহিত্যে যেগুলোর দেখা সচরাচর মেলে না। মাত্র কয়েকটার উল্লেখ করি— আরঢ়ী উদুনা প্রোজ্ঝন প্রোজ্ঝিত যবীয়ান। এগুলো রাখার কোনো দরকার ছিল না।

প্লান্টকে (plant) প্ল্যান্ট, প্রেয়ারি অঞ্চলকে (Prairy) প্রেইরি অঞ্চল, বেয়ারিংকে (bearing) বিয়ারিং লেখা হয়েছে। মারাত্মক ভুল এগুলো। এগুলো নিশ্চয় এ অভিধানের দুর্বলতা। পরে বিয়ারিংকে বেয়ারিং করা হলেও কুষাণ-কে সংশোধন করা হয়নি। তবে এসব দুর্বলতা নিয়েও সংসদ বানান অভিধান মোটামুটি প্রয়োজনসাধক। প্রথমত, অন্য সমস্ত বানান অভিধানের চাইতে এতে শব্দ আছে বেশি; দ্বিতীয়ত ছাপার ভুল নেই বললেই চলে; তৃতীয়ত বিতর্কিত বানান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিকল্পের নির্দেশ আছে। তবে বুঝতে পারি না কেন অশোক মুখোপাধ্যায় গৃহীত নীতির বাইরে গিয়ে 'যুবতি'-কে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেন।

নয়

যে চারটি বানান অভিধান নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করলাম তাদের মধ্যে সময়ের বিচারে প্রথমটি অরুণ সেনের 'বানানের অভিধান'। কিন্তু সেই অভিধানটি প্রকাশিত হওয়ার অন্তত দুবছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন'। আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি অনুসারে এই বইটি সংকলন করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এটি যদিও মূলত আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি (ওঁদের লেখায় 'বানান-বিধি') অনুসারেই সংকলিত, তবু এটিকে ঠিক বানান অভিধান বলা যায় না। কেননা বানানই এর একমাত্র বিষয় নয়। হরফের মাপ, প্রেসের মুদ্রণসংক্রান্ত নানান টেকনিকাল খুঁটিনাটি, বিরামচিহ্ন, সংবাদপত্রে গদ্য রচনার নানা দিক, খবর পরিবেশনের নানা তথ্য এসবও আছে এই বইটিতে। তাই বানান অভিধান একে বলছি না আমরা। কিন্তু যেহেতু অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে বানানও আছে, এবং যেহেতু অন্য সব বিষয়কে ছাপিয়ে গেছে বানান, অর্থাৎ বানান যেহেতু এই বইয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে, তাই বানানের আলোচনায় এই বইটিকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ১৯৯০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধির 'প্রাথমিক প্রস্তাব' রচিত হয়েছিল। সেই প্রস্তাব নানাজনকে পাঠিয়ে মতামত আহ্বান করা হয়েছিল। সেই মতামত বিবেচনায় আনাও হয়েছিল কতক পরিমাণে। এক বছর পরে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে উক্ত 'বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন' প্রকাশিত হয়। সমগ্র বিষয়টিতে এবং পুস্তকটির সংকলনে প্রধান মানুষটি ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বারবার সংশোধিত ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বইটি, যা এর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ।

এই বইটিকে আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি বলা হয়েছে। তবে সামগ্রিক বানান সমস্যার নিরসনে এই বইটির ভূমিকা কম নয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে সাম্প্রতিক বানান ভাবনার সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাবনাচিন্তার বড়োরকমের তফাত নেই। তফাত কিছু অবশ্যই আছে এখানে-ওখানে। তবে একথা বলাই যায় যে, মতপার্থক্যের এলাকা ছোটো হয়ে আসছে। তৎসম শব্দে রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন, শব্দান্তে বিসর্গ ও হস্‌চিহ্ন বর্জন, বিকল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বর বর্জন করে হ্রস্ব স্বর গ্রহণ বাংলা আকাদেমির সূত্রের সঙ্গে এবং সাহিত্য সংসদের সূত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অতৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বর বা দীর্ঘ স্বরচিহ্নের ব্যবহার বর্জন, মূর্ধন্য-ণ বর্জন এবং ঋ-কার বর্জনও পূর্বালোচিত সূত্রগুলোরই অনুরূপ। অনুজ্ঞায় ছাড়া অন্যত্র ক্রিয়াপদে ও-কার ব্যবহৃত হবে না; সর্বনামে কী এবং অব্যয়ে কি ব্যবহৃত হবে; নি (নাই অর্থে) ক্রিয়াপদের সঙ্গে জুড়ে লেখা হবে (বলিনি করিনি); ক্রিয়াবিশেষ্যে ও-কার হবে, জাগানো দেখানো; কিনা (যেহেতু) ও কি না (কিংবা না) এই দুইয়ের মধ্যে তফাত রক্ষিত হবে; ঙ-এর বদলে ং-ই ব্যবহৃত হবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় যে বানানসূত্র গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এই পত্রিকার বানান অর্থাৎ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বইয়ের বানান অন্যান্য সংস্থার বানান থেকে একেবারেই আলাদা। আনন্দবাজার পত্রিকা স্বীকার করে না যে 'চীন' শব্দটাকে তৎসম বলে ধরে নিতে হবে, যতই কিনা 'চীনাংশুক'-এর কথা বলা হোক; ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে সমাসে সংস্কৃত নিয়মই সংগত মনে করে আনন্দবাজার। তাই, যাত্রিবাহী আগামিকাল পরবর্তিকাল; অন্যেরা কেউ লেখেন কোনো কখনো আরো, কেউ-বা বিকল্প মানেন, কোনো/কোনও, কখনো /কখনও আরো/ আরও। কিন্তু আনন্দবাজার কেবল মানে কোনও কখনও আরও বড় ছোট ভাল মত।

এসব বড়ো কথা নয়। কিন্তু বুঝতে পারি না নীরেন্দ্রনাথ উহ্য (অনুক্ত অর্থে) বানানকে কীভাবে সংগত বলেন; কীভাবেই-বা উষা/ঊষা, বউ/বৌ, মউ/মৌ কাণ্ডারি সমীচীন অঙ্ক অঙ্গ গঙ্গা গির্জার মতো শত শত প্রয়োজনীয় শব্দ তাঁর বিবেচনায় আসে না; কেনই-বা তিনি ধানুকি-র মতো একটি অতৎসম শব্দের বানানে ধানুকী লেখার নির্দেশ দেন। এই বইটির বিবৃতির ভঙ্গিটি চমৎকার, পণ্ডিতি কায়দা সম্পূর্ণ পরিহার করে বানানের নির্দেশ বা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতই কম শব্দ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে এমনকী সাধারণ পাঠকের বহু কৌতূহল ও প্রশ্নের মীমাংসাও এতে পাওযা যায় না। আরও বড়ো কথা, যে সূত্র বা নিয়ম তৈরি করা হল আনন্দবাজার পত্রিকারই জন্য, তা আনন্দবাজার পত্রিকাই অনেক সময় মানে না। সূত্রে আছে দার্জিলিং, আনন্দবাজার পত্রিকায় পাই দার্জিলিঙ (দ্রষ্টব্য আ. বা. প., সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম, ২৩ মার্চ ১৯৯৯)।

দশ

যে সমস্ত বানান অভিধান আমাদের আলোচনায় এসেছে তার মধ্যে একমাত্র অরুণ সেনের অভিধানেই কোনো বিকল্প স্বীকৃত হয়নি। কেনই-বা হবে? কেননা বিকল্প বর্জনের প্রস্তাবই তিনি করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী, সাহিত্য সংসদ এবং আনন্দবাজদার পত্রিকা বিকল্পকে উড়িয়ে দিচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, এখন পর্যন্ত যা অবস্থা, বানানের বিকল্প পুরোপুরি এড়ানো মুশকিল।

দ্বিতীয়ত, প্রায়ই দেখা যায় যে, বানানের যে সমস্ত সূত্র কোনো সংস্থা তৈরি করে তার সঙ্গে সাধারণত একমত হওয়ায় বাধা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেইসব সংস্থা যেসব বানান অভিধান রচনা করে তাতে থেকে যায় প্রচুর অসংগতি ও খামতি। তাই একথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু নিয়ম বা সূত্র তৈরি করলেই হল না, বানান অভিধান সংকলনে চাই প্রখর কাণ্ডজ্ঞান। জাহান্নম হবে না জাহান্নাম? ইস্তাহার, না ইস্তেহার? জিমনেশিয়াম, না জিমনাশিয়াম? না কি এর কোনোটাই নয়? মরসুম, না মরশুম? শেওলা না শ্যাওলা? ক্ল্যাসিকাল, না ক্লাসিকাল? কীভাবে কোন নিয়মে এর মধ্যে একটা বানান বেছে নেওয়া হবে? প্রচলনের কথা তুললে অন্য সমস্যা এসে পড়বে। দুটি রূপই যদি সমান প্রচলিত হয় তবে?

আগে এক জায়গায় বলেছি যে, পাঠক ভাবতে পারেন, বানান নিয়ে আর কোনো অসুবিধেয় পড়তে হবে না তাঁকে, যেহেতু হাতের কাছে তিন-চারটে বানান অভিধান এসে গেছে। কিন্তু বানান অভিধানগুলোর পাতা ওলটালেই দেখা যাবে যে, এমন অনেক শব্দই রয়েছে যেগুলোর বানান সম্পর্কে অভিধানগুলো একমত নয়। এক অভিধান যে বানান দিচ্ছে, অন্য অভিধান তা মানছে না, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে একই শব্দের অন্য বানান। পাঠক বা লেখক বা শিক্ষার্থী কোথায় দাঁড়াবেন তাহলে? কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে। অরুণ সেন বলেন অন্তরীক্ষ ধমনী অবনী লিখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও সাহিত্য সংসদ বলছে অন্তরিক্ষ ও অন্তরীক্ষ, ধমনি ও ধমনী, অবনি ও অবনী দুই-ই লেখা যাবে, তবে আকাদেমির মতে হ্রস্বস্বরচিহ্নযুক্ত বানানই প্রথম পছন্দ। জামিল চৌধুরীর অভিধান আবার শুধুই অন্তরিক্ষ অবনি ধমনি বানান রেখেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা অন্তরিক্ষ রেখেছে, অন্যগুলো বিবেচনায় আনেনি।

জামিল চৌধুরীর উপরের শব্দগুলোতে হ্রস্বস্বরচিহ্ন রাখলেও, রজনীতে দীর্ঘ-ঈকারযুক্ত বানান রেখেছেন।

অরুণ সেন দেশী ও বিদেশী বানানই সংগত মনে করেন, জামিল চৌধুরীও তাই। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দেশি ও দেশী, বিদেশি ও বিদেশী দুই বানানই মানে, যদিও সাহিত্য সংসদের পছন্দ হ্রস্ব-ইকারযুক্ত বানান। অরুণ সেন লেখেন মন্ত্রীসভা মন্ত্রীপরিষদ স্বামীসেবা পক্ষীতত্ত্ব; বাংলা আকাদেমি ও সাহিত্য সংসদ এর সঙ্গে একমত। কিন্তু ঢাকার বাংলা একাডেমী ও আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে মন্ত্রিসভা মন্ত্রিপরিষদ। আনন্দবাজার এই সূত্রকে আরও কিছুদূর নিয়ে লেখে আগামিকাল, পরবর্তিকাল, অন্যেরা অতটা যেতে প্রস্তুত নয়। অরুণ সেন লেখেন মফস্বল, জামিল চৌধুরীও তাই লেখেন। বাংলা আকাদেমি ও সাহিত্য সংসদের পছন্দ মফস্সল। আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাহিত্য সংসদ আটক অর্থে লেখে বন্দি, অরুণ সেন, জামিল চৌধুরী লেখেন বন্দী, বাংলা আকাদেমির অভিধানে আছে বন্দি। অরুণ সেন মউ লেখেন, কিন্তু মৌমাছি মৌচাক মৌতাত। জামিল চৌধুরী লেখেন মৌ, মৌমাছি ইত্যাদি, সাহিত্য সংসদের পছন্দ মৌ ও মৌমাছি। বাংলা আকাদেমির মতে যা মন (৪০ সের), সাহিত্য সংসদ তাকে বলেছিল মণ। পরবর্তী সংস্করণে দেখছি এই শব্দটাই উধাও। অরুণ সেন ও আনন্দবাজার পত্রিকা এ বিষয়ে নীরব। বাংলা আকাদেমির অভিধানে ছিল মউ মউচাক মউমাছি। পরে অবশ্য মউ রাখা হলেও মৌচাক ও মৌমাছি ফিরে এসেছে। আনন্দবাজার এ ব্যাপারে নীরব। আনন্দবাজার পত্রিকা, অরুণ সেন ও সাহিত্য সংসদের বানান অভিধানে পাচ্ছি খ্রিস্ট খ্রিস্টীয়। বাংলা আকাদেমি ও ঢাকার একাডেমী বলছে খ্রিষ্ট খ্রিষ্টান। বাংলা আকাদেমি বলছে লিখতে হবে অ্যাকুস্টিকস (acoustics), সাহিত্য সংসদ প্রথমে অ্যাকাউস্টিকস বলে পরে আবার অ্যাকুস্টিকস করেছে। দারিদ্র লেখে আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য সংসদ দারিদ্র ও দারিদ্র্য দুই-ই রেখেছে, বাংলা আকাদেমি বলে দারিদ্র্য, অরুণ সেনও তাই রেখেছেন।

বিস্তর উদাহরণ তুলে দেখানো যায় কতটা তফাত বিভিন্ন এই বানান অভিধানগুলোতে। কিন্তু উদাহরণ আর বাড়ানোর দরকার নেই তেমন। ব্যাপারটা কতটা সমস্যার সৃষ্টি করছে তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বানানের সমতাবিধান এখনও বহু দূরে। বানান নিয়ে যে সকলে ভাবছেন সেটা ভালো, বানানের সমস্যা বা জটিলতা দূর করার জন্য সূত্র তৈরি হচ্ছে, অভিধান সংকলিত হচ্ছে, তা আরো ভালো কথা। কিন্তু অভিধানে-অভিধানে এতই যদি পার্থক্য থেকে যায় তাহলে তো কাজের কাজটা হতে পারবে না। পথ মাত্র দুটোই এখানে। হয় সবাইকে কোনোভাবে একমত হতে হবে একটি বানান নিয়ে, নয়তো সবাইকে একমত হয়ে এক বা একাধিক বিকল্প স্বীকার করে নিতে হবে। পাঠক লেখক ও শিক্ষার্থীর প্রতি তাতেই কিছুটা সুবিচার হবে। এ ছাড়া বানানসংস্কার জনপ্রিয় হবে না। আর সবাই যদি সংস্কার মেনেই না নেন তবে কি আর সংস্কারের মানে থাকে কোনো?

বিতর্কিকা শ্রাবণ ১৪০৬

বাংলা প্রাইমারের ইতিকথা

বাঙালির বিস্মরণ ক্ষমতার তুলনা নেই, এমন একটা কথার চল আছে অনেক দিন ধরে। কথাটা যে সর্বৈব অসার তা বলা যায় না। উনিশ শতকে রচিত বাংলা প্রাইমারের প্রসঙ্গ উঠলে ওই বিস্মরণ ও উপেক্ষার কথাটাকে আর অগ্রাহ্য করা চলে না। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস খাস্তগীরের গবেষণায় জানা গেছে যে, উনিশ শতকে পাঁচশোরও বেশি বাংলা প্রাইমার রচিত হয়েছিল। কিন্তু তার অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির অতলে। তাদের সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ সংকলন তৈরি করা নিশ্চিতই অসম্ভব। তবু বাংলা প্রাইমার বিষয়ে প্রায় নেশাগ্রস্ত এক গবেষক ক্লান্তিহীন চেষ্টায়, এবং অবশ্যই অন্য অনেক সুহৃদ ও উৎসাহী ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রাইমারের সংকলন তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন এ সংবাদ রীতিমতো আশ্বাসজনক। এই গবেষক আর কেউ নন, আশিস খাস্তগীর।

বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণের মতোই প্রাইমারেরও প্রথম লেখকরা বাঙালি নন, তাঁরা ইয়োরোপীয় এবং মিশনারি। যতদূর জানা আছে, শ্রীরামপুর মিশনের 'লিপিধারা'-ই বাঙালি বালকবালিকাদের বর্ণশিক্ষার প্রথম বই, অর্থাৎ প্রাইমার। এর প্রকাশকাল ১৯১৬। প্রশ্ন করা যায়, হঠাৎ কেন বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্যোগ? আর কেনই-বা সে-উদ্যোগে শামিল মিশনারিরা? এই দুটি প্রশ্নের একটিই উত্তর। মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাইমারের অভাব। যেখানে ইতিমধ্যে শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেখানে পঠনপাঠনের উপযোগী প্রাইমার না-থাকাটা প্রকৃতই বাধাস্বরূপ। তাই প্রাইমার রচনার উদ্যোগ। আর সে-উদ্যোগের প্রথম ফসল 'লিপিধারা'। সেই শুরু, আর সেই প্রয়াস অতঃপর চলতেই থাকল। পরের প্রাইমারটির নাম 'বর্ণমালা', লেখক জেমস স্টুয়ার্ট। লক্ষ করবার বিষয় যে, তখনও কোনো বাঙালি প্রাইমার রচনায় প্রবৃত্ত হননি। ১৮৩৫ সালে পাওয়া গেল বাঙালির রচিত প্রথম বাংলা প্রাইমার, ঈশ্বরচন্দ্র বসুর 'শব্দসার'। তার পরের প্রাইমারটি শিশুসেবধি সিরিজের 'বর্ণমালা', প্রকাশকাল সম্ভবত ১৮৩৯। এর কথা জানা গেছে বটে, তবে বইটি পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে দ্বিতীয়টি, যার প্রকাশকাল ১৮৪০। সেটিই আশিস খাস্তগীরের এই সংকলনের প্রথম প্রাইমার হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এইসব প্রাইমারের উল্লেখ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখায় আর জেমস লঙের ক্যাটালগ তো ছিলই।

তবে ১৮৪৯ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রাইমারের জগতে সূচিত হল বিরাট পরিবর্তন। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস খাস্তগীর দেখিয়েছেন যে, প্রকাশের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই শিশুশিক্ষার প্রথম দ্বিতীয় ও

তৃতীয় ভাগের মোট কুড়ি বাইশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। এই বইয়ের বিক্রির পরিমাণ ও সংস্করণের পৌনঃপুনিকতা থেকেই বোঝা যায় শিশুশিক্ষা কতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল। আশিস খাস্তগীর অন্যত্র মন্তব্য করেছেন যে, শিশুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রাইমারের পালাবদল ঘটল। এই কথায় কোনো অতিরঞ্জন নেই। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে-তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, এই প্রথম বিশেষভাবে বালিকাদের কথা ভেবে তাদেরই জন্য রচিত হল একটি প্রাইমার। এর কারণও আশিসবাবু বলেছেন সবিস্তারে। বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন মদনমোহন। আবার অভিভাবকও ছিলেন। তাঁর কন্যাকে তিনি ওই স্কুলেই পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, এই স্কুলই পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়। স্কুল আছে, কিন্তু মেয়েদের জন্য প্রাইমার নেই। এই অভাব দূর করার জন্য তর্কালঙ্কার লিখলেন 'শিশুশিক্ষা'। টাইটল পেজ-এ ইংরেজিতে লেখা হল—compiled for the use of Female Schools in Bengal, আর তার বাংলা বয়ান—'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ'। এখানে একটা প্রশ্ন উঠে পড়তে পারে। মেয়েদের আর ছেলেদের জন্য আলাদা প্রাইমার রচনার প্রয়োজন হল কেন? কথা আরও বিশেষভাবে উঠছে এজন্য যে, শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে 'মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে. ই. ডি. বীটন'কে লেখা নিবেদনে, তর্কালঙ্কার যদিও 'এতদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থা'-র কথা বলেছেন, দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় দেখছি অন্য ব্যাপার। সেখানে তিনি তো কেবল বালিকাদের কথা বলেননি, বলেছেন 'সুকুমারমতি বালকবালিকার'-র কথা। সত্যি কথা বলতে কী, কেবল মেয়েদের জন্য প্রাইমার কেমন বস্তু হবে তা বুঝি না আমরা।

শিশুশিক্ষার প্রথম তিনটি ভাগ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আশিসবাবু। শিশুশিক্ষার চতুর্থ ভাগটির লোকচলতি নাম 'বোধোদয়'। রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এটি এবং পঞ্চম ভাগ, যার নাম 'নীতিবোধ' এবং যার লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই সংকলনে আসেনি। বোধোদয় ও নীতিবোধ কোনোটিই ঠিক বর্ণপরিচয়ের বই নয়। ও-দুটিকে বরং সহায়ক পাঠ বলা যায়। বোধোদয়ের বিজ্ঞাপন অংশে বিদ্যাসাগর লিখলেন—'বোধোদয় নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল, পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টা বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা'। উল্লেখ্য, আশিস খাস্তগীর শিশুশিক্ষার এই চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ তাঁর 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ'-তে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

এর পরে আসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়ে'র কথা। বাংলা প্রাইমারের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যতদিন বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়নি, ততদিন শিশুশিক্ষার জনপ্রিয়তায় কোনো ঘাটতি হয়নি। অন্য দু-একটি প্রাইমার (যেমন স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা বা শিশুবোধ) মোটামুটি চললেও শিশুশিক্ষার মতো লোকপ্রিয়তা ও গ্রাহ্যতা আর কোনো প্রাইমারই অর্জন করতে পারেনি। বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই তার বিক্রি ও জনপ্রিয়তা সব হিসেব ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অবশ্য এমন মনে করা যাবে না যে, তখন শিশুশিক্ষার দিক থেকে বাঙালি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে শিশুশিক্ষা যে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হল তাতে কোনো ভুল নেই। সংস্করণ থেকে সংস্করণে বর্ণপরিচয়ের দুটি

ভাগ যে কী বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত ও বিক্রিত হত, তার হিসেব দিয়েছেন আশিসবাবু। একথা অস্বীকার করা যায় না যে শিশুশিক্ষার চেয়ে বর্ণপরিচয় কতকগুলো বিষয়ে অনেকটাই অগ্রসর ছিল। একসময় মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে কতকগুলো অভিযোগ তুলে রীতিমতো সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যেসব অভিযোগের মোকাবিলা যেভাবে করেছিলেন তাতে বোঝা যায় যে,যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিতে পারেননি।

আশিস খাস্তগীরের নিরলস গবেষণা এবংবিধ বহু তথ্য ও তত্ত্ব সাজিয়ে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত যেমন করেছেন, তেমনি নতুন করে কৌতূহল জাগিয়েও তুলেছেন। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর সম্পাদিত 'শিশুশিক্ষা'দেখেছি। লক্ষ করেছি, প্রায় বিস্মৃত একটি বিষয়কে কীভাবে নিরন্তর অনুশীলনে সজীব করে তুলেছেন তিনি। 'শিশুশিক্ষা'-র বিষয়ে বলতে গিয়ে তার ঐতিহাসিক ও অ্যাকাডেমিক পটভূমিটিকেও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেকালে বাংলার স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের রূপরেখাটিও তাঁকে দেখাতে হয়েছে। এ-ধরনের বইয়ে ভূমিকার সবিশেষ গুরুত্ব থাকে। আশিস খাস্তগীর সে-দায় ভালোই মিটিয়েছেন। স্বভাবতই, যখন জানা গেল যে, তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছে বাংলা প্রাইমারের একটি সংকলন, তখন সে-বই সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল যে জাগবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এবং বইটি হাতে পাবার পর মনে হল, এ-বইও তাঁর আগের বইটির মতোই যোগ্যজনোচিত কাজ হয়েছে।

এই বইয়ের সূচিপত্রটি দেখে একটু দমে গিয়েছিলাম হয়তো। কয়েকশো প্রাইমারের ভিতর থেকে মাত্র পাঁচটির কয়েকটি ভাগই কেবল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এটি যে এই সিরিজের বা প্রকল্পের প্রথম খণ্ড তার কোনো উল্লেখ প্রচ্ছদপত্রে বা আখ্যাপত্রে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিবের 'নিবেদন' এবং সম্পাদক আশিস খাস্তগীরের 'সংকলন-প্রসঙ্গে' ভালো করে পড়লে এই আক্ষেপ আর থাকে না। বরং পরবর্তী সময়ে এই সংগ্রহে আরও প্রাইমার অন্তর্ভুক্ত হবে এমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে আশ্বস্ত হওয়া গেল।

'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ'-তে রাখা হয়েছে চোদ্দোটি প্রাইমার, কিংবা বলা যায়, পাঁচটি প্রাইমারের চোদ্দোটি ভাগ। এতে আছে শিশুসেবধি-র পাঁচটি বই, বর্ণমালা সিরিজের তিনটি বই, শিশুশিক্ষার তিনটি বই, বর্ণপরিচয়ের দুটি এবং একটি শিশুবোধক। সংকলনটি সাধারণভাবে সাজানো হয়েছে সময়ের ক্রম ধরে। অর্থাৎ প্রথমেই আছে ১৮৪০-এ প্রকাশিত বই, তারপর পরপর ১৮৫০, ১৮৫৪, ১৮৫৩,১৮৫৫ এইভাবে। কিন্তু এখানে ক্রমভঙ্গ হয়ে গেল যে। ১৮৫৪ এসেছে ১৮৫৩-র আগে। ১৮৫৪ আগে আসার কারণ ওটি প্রথম ভাগ, ১৮৫৩-র বইটি দ্বিতীয় ভাগ। আমাদের মনে হয়েছে, যেকোনো একটি ক্রম মানলেই ভালো হত, প্রকাশকালের অথবা পুস্তকভাগের। বিশেষত শিশুসেবধি আর বর্ণমালার বিন্যাসে এই ক্রমভঙ্গ হয়েছে। বর্ণমালা দ্বিতীয় খণ্ড রয়েছে দুটি, একটি ১৮৪৪ সালের, অন্যটি ১৮৫৪ সালের। আসল তফাত কিন্তু অন্যত্র—একটি তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তক, অন্যটি স্কুল বুক সোসাইটির।

শিশুসেবধি সিরিজের যে পাঁচটি প্রাইমার সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে দুটিতে বর্ণপরিচয়ের অর্থাৎ বর্ণশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অন্যগুলোত প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই তিন চার বা পাঁচ বর্ণের শব্দ

বিবৃত হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় দেখতে পাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিন্যাস। শিশুসেবধির বর্ণমালা প্রথম ভাগে ও বর্ণমালা দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের বিবৃতির পরে সাংকেতিক অক্ষর এসেছে অর্থাৎ যাকে আজ বলি -কার ও - ফলা যোগ। বর্ণের ব্যুৎক্রমও দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয় কতদূর হল তা যাচাই করার জন্যই ব্যুৎক্রম।

বর্ণবিন্যাসের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস লক্ষ করবার মতো। প্রথমত, শিশুসেবধির সবকটি এবং বর্ণমালার সবকটি বইয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ এসেছে স্বরবর্ণের আগে। মদনমোহন তর্কলঙ্কারই প্রথম তাঁর শিশুশিক্ষায় স্বরবর্ণকে ব্যঞ্জনের আগে এনেছেন। সেই ক্রম বজায় রেখেছেন বিদ্যাসাগরও। দ্বিতীয়ত, শিশুশিক্ষা পর্যন্ত সবকটি প্রাইমারে অনুস্বার ও বিসর্গ ছিল স্বরবর্ণের মধ্যে সবার শেষে। বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে অনুস্বার ও বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে স্থান দিয়েছেন। সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগরের অনেক সংস্কার পরবর্তী সময়ে গৃহীত হলেও এই ব্যাপারটি লোকে মেনে নেয়নি। অভিধানকারগণ আজ পর্যন্ত ও-দুটিকে স্বরবর্ণের শেষেই রেখেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও রাজশেখর বসু কেউই এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত মানেননি। অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরের সঙ্গেই যায়। অনুস্বার কথাটির অর্থও তা-ই, স্বরের পশ্চাতে স্বরের আশ্রয়েই তার থাকার কথা।

'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ'-তে কতকগুলো প্রাইমার উদ্ধার করে আশিস খাস্তগীর আমাদের অশেষ উপকার করেছেন। এই সংগ্রহে পুরোনো বানানের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বাংলা বানানের এবং তৎসহ বাংলা বর্ণরূপের বিবর্তনের একটা রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে রচিত অনেকগুলো প্রাইমার পাশাপাশি বা একসঙ্গে দেখার সুযোগ হওয়ায় আমরা সেকালের প্রাইমার-রচয়িতাদের রীতি ও নীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাই। যেমন 'শিশুশিক্ষায়' মদনমোহন প্রতিটি যুক্তবর্ণের সঙ্গে একটি করে বাক্য রেখেছেন, আর বহু ক্ষেত্রেই সমিল পদ্যের আকারে সাজিয়েছেন সেই বাক্যগুলোকে। তাঁর প্রাইমারে তিনি ঋতুর বর্ণনা আর নানা বিষয়ে ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদ দিয়ে শিশুর ভাষাবোধ তৈরিরও চেষ্টা করেছেন। তবে এও সত্যি যে, শিশুশিক্ষার জায়গায় জায়গায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। আর এও বলতে হয় যে, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আজ যে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির কথা এত বলা হয়, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর প্রাইমারে তারই প্রমাণ রেখেছেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'বর্ণপরিচয়েই' প্রথম দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯ বর্জন করে বাংলা বর্ণমালাকে অনেকটা ভারমুক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ড় ঢ় য় এই তিনটিকে ব্যাঞ্জনবর্ণে স্বীকৃতি বিদ্যাসাগরই প্রথম দিয়েছিলেন তাঁর 'বর্ণপরিচয়' প্রাইমারে। সেই প্রথম বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃতের নিগড় থেকে অনেকটা মুক্ত করে বাংলা ভাষার রীতি অনুসারে বিন্যস্ত করা হল। বস্তুতপক্ষে, ওই তিনটি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই। এদের নিছক ড ঢ় ও য -এর রূপভেদ হিসেবেই দেখা যায়। কিন্তু বহু বহু বাংলা শব্দে এই তিনটি বর্ণকে পাওয়া যায়। এদের স্বীকৃতি না দিলে আমরা কীভাবে লিখতাম গড়ন, আষাঢ়, দড়াদড়ি, কড়াকড়ি, শয়ন -এর মতো শব্দ?

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার পাঠককে লক্ষ করতে বলি। সংগৃহীত প্রাইমারগুলোর কোনো কোনোটিতে স্বচ্ছ বর্ণরূপ দেখানো হয়েছে। শিশুসেবধি-১ এ (পৃ.৮৫-৮৬) কয়েকটি

যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের স্বচ্ছ রূপ রয়েছে, রয়েছে শিশুবোধকের ২৩ থেকে ২৬ পৃষ্ঠাতেও। সেখানে কৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ বানানে ষ্+ণ এই যুক্তব্যঞ্জনের যে স্বচ্ছ রূপ দেখতে পাচ্ছি, তা পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং রাজশেখর বসু ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি তারই উন্নততর রূপ প্রস্তাব করেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও। প্রাইমারগুলিতে অবশ্য এই স্বচ্ছ বর্ণরূপকে বলা হয়েছে প্রকৃত রূপ। সেখানে প্রচলিত রূপকে সাংকেতিক রূপ বলা হয়েছে।

আশিস খাস্তগীর দু-তিনটি প্রাইমারের ফোটোকপি ছেপেছেন। প্রথম দিকের প্রাইমারগুলোর ফোটোকপি করা হয়নি। যেগুলো কপি করে ছাপতে হয়েছে সেগুলোর জায়গায় জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। 'পণ্ডিত' ও 'অপণ্ডিত' বানানে দন্ত্য-ন এসেছে (পৃ.৫৭), ব্যভিচার কোথাও ব্যাভিচার কোথায় বাভিচার হয়েছে (পৃ. ৫৮), কৌটিল্য হয়েছে কোটিল্য (পৃ.৬৮)। যেখানে মূল প্রাইমারেই ভুল ছিল সেখানে সম্পাদক অশুদ্ধ বানানের পাশে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানান বসিয়েছেন। কিন্তু এই-যে ছাপার ভুলগুলোর কথা বললাম সেখানে বন্ধনীর মধ্যে সংশোধনী নেই। কাজে কাজেই ধরে নেব যে, ওগুলো এখনকার ভুল। আর একটা কথা। শিশুশিক্ষা-১ এ (পৃ. ২০৩) তরণি বানানকে অশুদ্ধ ধরে নিয়ে আশিসবাবু বন্ধনীতে তরণী রেখেছেন। আসলে কিন্তু তরণি অশুদ্ধ নয়, রীতিমতো শুদ্ধ।

সংগৃহীত প্রাইমারগুলির সবই যে প্রাথমিক বর্ণশিক্ষার বই তা নয়। বর্ণশিক্ষা, শব্দপরিচয় ও বাক্যপরিচয় সব মিলিয়ে-মিশিয়ে পরিকল্পিত হয়েছে সেগুলো। কয়েকটি তো রীতিমতো সহায়ক পাঠের মতো বই। শিশুশিক্ষা-৩ এবং শিশুবোধকের অনেকটাই ছোটো-বড়ো-মাঝারি অনুচ্ছেদে ভরা। সেক্ষেত্রে শিশুশিক্ষা-৪ অর্থাৎ বোধোদয় অন্তর্ভুক্ত হতেই পারত। পরের খণ্ডগুলোতে বোধোদয় অন্তর্ভুক্ত হবে এমন আশা করি।

এই সংগ্রহে ত্রুটিবিচ্যুতি যে নেই এমন কথা বলব না। তবে সামগ্রিকভাবে বইটি এতই সুপরিকল্পিত এবং এতই নির্ভরযোগ্য যে ওই তুচ্ছ ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা করতেই হয়। আশিস খাস্তগীর এই বইয়ের পরিকল্পনায়, গ্রন্থনায় ও সম্পাদনকর্মে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা ভূমিকা ('উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমার') এবং বইয়ের শেষে 'সম্পাদকীয় সংযোজনে'ও তাঁর গবেষণাকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠার সুফল এই সংগ্রহ। এমন শ্রমসাধ্য ও দুরূহ কাজ করতে সকলে সাহসী হন না। তিনি সাহসী হয়েছেন। তাঁকে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে আমরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাব এই চমৎকার বইটির জন্য।

বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, সম্পাদক আশিস খাস্তগীর।

বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যা

এক ভাষার শব্দ আর এক ভাষার লিপিতে লেখার নামই প্রতিবর্ণীকরণ বা লিপ্যন্তরীকরণ। আমরা যখন একটা আরবি বা ফরাসি শব্দ বা নাম বাংলায় লিখি (অনুবাদ না করে), কিংবা যখন ইংরেজি-ফরাসি-পর্তুগিজ নাম বা শব্দ বাংলায় লিখি তখন আসলে ওই নাম বা শব্দটিকে বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত করি বা লিপ্যন্তরিত করি। এই প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপারে কতকগুলো সমস্যা আমাদের প্রায়ই বিব্রত করে। সমস্যাগুলো কী ও কেমন, কীভাবে আমরা সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি তার আলোচনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এক ভাষার শব্দ আর এক ভাষায় দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হতে হতে দাঁড়িয়ে যায়। তার একটা বিশেষ রূপ প্রচলিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রায়ই মূল ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে যে-ভাষায় শব্দটি এসেছে তার উচ্চারণের মধ্যে একটা রফা হয়। এইভাবেই টেবিল, গেলাস, সাইকেল, বোতল, সাবান, জিনিস, জাহাজ প্রভৃতি অজস্র শব্দ বাংলায় এসেছে এবং বাংলায় এদের বিশেষ একটা রূপ গৃহীত হয়ে গেছে। এই ধরনের শব্দ ঠিক যাকে প্রতিবর্ণীকৃত হওয়া বলে তা হয়নি। এই ধরনের শব্দ আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়।

যে-সমস্ত শব্দ এখনও বাংলায় গৃহীত হয়নি, যে-সমস্ত শব্দ এখনও বিদেশি শব্দ হিসেবেই গণ্য হয়, অথচ বাংলা ভাষার প্রবন্ধাদিতে এবং অন্যান্য রচনায় যে-সমস্ত শব্দ ও নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, সেইসব শব্দ ও নাম বাংলা হরফে কীভাবে লেখা হবে, কীভাবে লেখা উচিত সেই প্রশ্নই উপস্থিত আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এইসব শব্দকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—(১) বাংলা ছাড়া অন্য ভারতীয় শব্দ, (২) আরবি-ফারসি শব্দ, (৩) ইংরেজি ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ। প্রতিবেশী ভাষার শব্দ অর্থাৎ অন্য ভারতীয় ভাষার শব্দ নিয়ে সমস্যা তেমন জটিল নয়। মারাঠি ওড়িয়া গুজরাতি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দ বাংলায় লিখতে খুব অসুবিধে হয় না। এখনকার নীতিটা হল ওইসব ভাষার নাম বা শব্দ যতদূর সম্ভব সেই ভাষার উচ্চারণ রীতি মেনে বাংলায় লেখা। তিরুবনন্তপুরম, পুনে, গুয়াহাটি এখন চালু হয়ে গিয়েছে। বাংলায় এভাবে লেখার অসুবিধেও নেই। কোনো-কোনো ভাষার উচ্চারণের একটি দুটি ধ্বনি বাংলায় নেই। তাই এটা হতেই পারে যে, যেভাবে হিন্দিতে মূর্ধন্য-ণ উচ্চারিত হয় আমরা সেভাবে উচ্চারণ করি না। কিন্তু লেখায় উচ্চারণের এত খুঁটিনাটি প্রতিফলিত না হলেও ক্ষতি নেই।

আমরা যখন বিদেশি শব্দ বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত করি তখন কয়েকটা নীতি মেনে চলি। প্রথমত, কোনো বিদেশি শব্দে ণত্ব-ষত্ব ব্যবহৃত হবে না। অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস লিখব না, ষ্টোর লিখব না। দ্বিতীয়ত, ঋ-কার ব্যবহার না করে র-ফলা ইকার ব্যবহার করব। বৃটিশ নয়, ব্রিটিশ।

এক কারণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন পাঠক। ঋ ও ঋ-কার সংস্কৃতে আছে স্বরবর্ণের মধ্যে। আমাদের বর্ণমালায়ও তাই। কিন্তু ঋ সংস্কৃতে স্বরধ্বনির মতোই উচ্চারিত হয়। অথচ বাংলায় ঋ আমরা ব্যঞ্জনের মতো র্+ই = রি এইভাবে উচ্চারণ করি। অর্থাৎ ঋষিকে আমরা রিশি বলি। এই কারণে বিদেশি শব্দে ঋ-কার না লিখে র-ফলা ইকার লেখাই যুক্তিসংগত হবে। নীতি আরও একটা আছে। আমরা সেই নীতিটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেও সকলে এখনও তা মেনে নিতে পারেননি। সেটা হল সমস্ত বিদেশি শব্দে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব।

দুই

বিদেশি শব্দের মধ্যে প্রথমেই বলতে চাই আরবি-ফারসি শব্দের কথা। খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে,আমরা কোনো-কোনো শব্দকে লিখি মূল থেকে একটু সরে এসে। 'জিনিস' শব্দের মূল উচ্চারণ জিন্স্। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমরা sh বা শ উচ্চারণ করি, যদিও শ লিখি না (বুদ্ধদেব বসু জিনিশ লিখতেন, অশোক মিত্র জিনিশ লেখেন)। ফারসি পহ্লবান্ শব্দটাকে আমরা পালোয়ান বানিয়েছি। আবার অনেক শব্দকে মূলের উচ্চারণ মেনে বাংলায় লিখি। শরবত, মক্তব, মখমল, আব্রু, ফরমান, পেশকার, নাজিম এসব শব্দ বাংলায় লিখি মূলের উচ্চারণ অনেকটাই অনুসরণ করে। অল্পস্বল্প হেরফের করে লিখি তছরুপ, তাগাদা, মেয়াদ, মেজরাফ। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়ে গেছে। নতুন শব্দ কমই আসে। কাজে-কাজেই আরবি-ফারসি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে বড়ো কোনো সমস্যা নেই, একটি ছাড়া। সেটি শ-য়ের ব্যবহার নিয়ে। আমরা শরবত লিখি, শহর লিখি, আশমান, আশরফি, বেহেশ্‌ত্, মশকরা, শয়তান লিখি। এইসব শব্দে তালব্য-শ উচ্চারণ করি। আবার আমরা ইসলাম লিখি। উচ্চরণে বলি স্, তাই ইসলাম। অথচ উচ্চারণে তালব্য-শ থাকা সত্ত্বেও লিখি হিসাব, সুলতান, মুসলমান, সাদা, সাবান, সাহেব, সর্দি। অন্যত্র বহু ক্ষেত্রে বহু প্রচলিত বানান অসংগত বলে আমরা তার বানান পালটে ফেলেছি। পরী হয়েছে পরি, তীর (বাণ) হয়েছে তির, ঈদ হয়েছে ইদ, ঈগল ইগল। আরও আগে সহর হয়েছে শহর। অথচ সাদা, হিসাব, সাহেবকে পালটাতে হাত কাঁপে আমাদের। এই অসংগতি দূর করার কথা আমাদের ভাবা উচিত। যখন হিন্দির মতো সাব/sab/ বলব তখন দন্ত্য-স লিখব কিন্তু সাহেবকে শাহেব লেখা কথা আমরা ভাবছি না। শাহেব শাদা লিখলে কেন গেল গেল রব উঠবে। আজ থেকে প্রায় আশি-পঁচাশি বছর আগে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর বাঙ্গালা শব্দকোষে শাদা, শরদি, শরাব বানান লিখেছেন। অথচ আমরা আজ তা পারছি না। আমাদের সংস্কার আমাদের বাধা দিচ্ছে। হয়তো পরে কোনোদিন এসব শব্দেও তালব্য-শ এসে যাবে।

তিন

ইংরেজি শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকরণে মূর্ধন্য-ণ মূর্ধণ্য ষ ব্যবহৃত হবে না একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। এখন অ্যাশট্রে (ashtray), শুটার (shooter), শেয়ার (share), শেকসপিয়ার (Shakespeare), শেলি (Shelley), শ্যামপু (shampoo) লিখতে কোনো অসুবিধে হয় না,

বরং সেটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তাই বলে সমস্যা নেই তা নয়। মূলত দুটো জায়গায় সমস্যা (ঠিক সমস্যা নয়, বরং একে বিতর্ক বলাই ভালো) আছে। প্রথমত গ্রিক/গ্রীক, বিম/বীম (beam), ক্রিম/ক্রীম, রিডার/রীডার (reader) এসব ক্ষেত্রে হ্রস্বই/দীর্ঘ ঈ নিয়ে বিতর্ক এখনও আছে। এসব শব্দে অনেকেই দীর্ঘ ঈ লিখতে চান, মূলের উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর আছে এই যুক্তিতে। আমরা অবশ্য মনে করি, হ্রস্ব ইকারই লেখা উচিত। আমরা যখন বাংলা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করি তখন গ্রীক উচ্চরণ করি না, গ্রিক উচ্চারণ করি। যখন বলি 'প্রাচীন গ্রিসের অধিবাসী' তখন 'গ্রিস' কথাটির ইংরেজি উচ্চারণ হুবহু অনুসরণ করি না। গ্রি বলি, গ্রী বলি না। আর তাছাড়া এসব নাম ও শব্দের ইংরেজি উচ্চারণে দীর্ঘ স্বরধ্বনি আছে এই যুক্তিতে এগুলোর বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে যদি দীর্ঘ ঈকার লিখতে হয়, তবে তো একই যুক্তিতে আবার ফিরে যেতে হয় প্লীডার (pleader), প্লীজ় (please), স্ট্রীট (street), মীট (meat), ঈস্ট (east), পীস (piece, peace), প্রভৃতি বানানে। তা কি সম্ভব? তা কি উচিত?

ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে মূল উচ্চারণ ও বাংলা উচ্চারণের মধ্যে প্রায়ই একটা রফা করে নেওয়া হয় যেমন পুলিশ ও কারনিশ (cornice)। মূলে দন্ত্য-স থাকলেও যেহেতু আমরা তালব্য শ উচ্চারণ করি, তাই তালব্য শ দিয়ে লেখার রীতি চালু আছে।

দ্বিতীয় সমস্যা যুক্তাক্ষরের ব্যবহার নিয়ে। অক্টোবর/অকটোবর, নভেম্বর/নভেমবর, কম্পিউটার/কমপিউটার, কস্টিং/কসটিং, বাল্ব/বালব্— এটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে যেহেতু এটা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যা নয়, সাধারণভাবে সমস্ত বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রেই এ সমস্যা আছে, তাই বিষয়টাকে নিয়ে পরে পৃথকভাবে আলোচনা করছি।

চার

সমস্যা অনেক বেশি অনিংরেজি ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকরণ নিয়ে। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এইসব নাম ও শব্দ ইংরেজি ভাষার মারফত জেনেছি ও লিখেছি। তাদের মূল উচ্চারণের ধার ধারিনি। কেবল কিছু ফরাসি নাম ফরাসি কায়দায় উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছি, লিখেছি আঁতোয়ান (Antoine), বোদলেয়ার বা বদল্যের (Baudelaire), সার্ত্র্ (Sartre), কাম্যু (Camus), শার্ল্ (Charles), তিবো (Thibaut), আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France), মপাসাঁ (Maupassant)। আবার দেশনাম যখন তখন Franceকে ফ্রান্স লিখি, শহরকে প্যারিস (Paris) লিখি। এখনও হুগো (Hugo), দিদেরো (Diderot) লিখি। যদিও য়্যুগো এবং দিদ্‌রো লিখলেই বরং মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যায়।

অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ ও নামের যে রূপ বা উচ্চারণ ইংরেজির মাধ্যমে এসেছে সেই রূপ বা উচ্চারণ আমরা ইংরেজি রীতি অনুসারেই করি। ইতালির রাজধানী রোম-এর ইতালীয় নাম রমা (Roma)। যাকে ইংরেজরা বানিয়েছে ফ্লরেন্স (Florence) তার ইতালীয় নাম ফিরেন্ত্সে (Firenze)। যে লাতিন কবিকে ইংরেজদের মতো করে Horace নামে জেনেছি তাঁর লাতিন নাম হোরাশিয়ুস (Horatius)। কী করব তাহলে আমরা? হোরেস না হোরাশিয়ুস? রোম না রমা, ফ্রান্স না ফ্রাঁস? প্রাগ না প্রাহা?

সমস্যার এ হল একটা দিক। অন্য সমস্যাও আছে। তা হল যুক্তবর্ণের সমস্যা, হাইফেনের সমস্যা, হস্‌চিহ্নের সমস্যা। রোমান হরফের যে-সুবিধে আছে আমাদের তা নেই। আমরা বহু বিদেশি শব্দে যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত। প্রথম কথা, যুক্তবর্ণ কি ব্যবহার করবই না? দ্বিতীয় কথা, যুক্তবর্ণের ব্যবহারও তো একাধিক রকমের হতে পারে। কীভাবে লিখব astrology কথাটাকে? অ্যাসট্রোলজি? অ্যাস্ট্রোলজি?Castroকে কী লিখব? কাসত্রো? না কাস্ত্রো?

পাঁচ

বিদেশি শব্দ ও নাম বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণে যে-সমস্ত সমস্যা বা বিতর্ক আছে সেগুলোর একটা মোটামুটি ইঙ্গিত দেওয়া গেল। এবারে আমাদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। যেসব সমস্যার কথা বললাম সেগুলো নানা ধরনের। সমাধানেও একটা বিমিশ্র নীতি একরকম অপরিহার্য। প্রথমত, দীর্ঘকাল ধরে যেসব শব্দ ও নাম আমরা ইংরেজি রীতিতে নিয়েছি ও লিখেছি সেগুলোকে বর্জন করা সহজ নয়, বোধ হয় তার দরকারও নেই। আমরা যদি প্যারিস, রোম, প্রাগ, ফ্রান্স, ফ্লরেন্স কিংবা ফ্লোরেন্স লিখতে থাকি তাতে কোনো দোষ নেই। দীর্ঘপ্রচলিত এই রীতি ভাঙার দরকার আছে বলে মনে করি না।

দ্বিতীয়ত নতুন শব্দ অর্থাৎ আমরা যেসব ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ ও নাম সম্প্রতি ব্যবহার করতে শুরু করেছি সেগুলো মূল ভাষার উচ্চারণ অনুসরণ করে লেখা যেতে পারে। আঁতাঁত, আইয়াচ্চো (Ajaccio), গুলিয়েলমো (Guglielmo), জোভান্নি (Giovanni), আঁক্‌তিল (Anquetil) লেখাই উচিত। আবার পূর্বপ্রচলিত রুশো (Rousseau) একান্তই ভুল বলে ওটাকে বদলে রুসো করতে চাই।

তৃতীয়ত, আসছে যুক্তবর্ণের প্রসঙ্গ। যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখার ব্যাপারে এবং যুক্তাক্ষর ব্যবহার করার ব্যাপারে আমরা প্রায়ই আমাদের অভ্যাস ও পছন্দের উপর নির্ভর করি। কেউ যুক্তাক্ষর একটু বেশি ব্যবহারের পক্ষপাতী, কেউ-বা যুক্তাক্ষর কমই ব্যবহার করতে চান। তবে এ-বিষয়ে কয়েকটি সূত্রের কথা বলা যেতে পারে। শব্দের গোড়ায় র-ফলা ও ল-ফলা এড়ানো যায় না, স্ক, স্ট, স্ত এসব এড়ানো যায় না। আমরা লিখব স্টালিন বা স্তালিন, স্কাড, স্কাউট, ব্রাউন, ক্লিভল্যান্ড। কিন্তু শব্দের মাঝখানে স্‌ক লেখা যায়— ম্যাসকট। শব্দের বা নামের মাঝখানেও এগুলো লেখা যেতে পারে— বেয়াত্রিচে, কাসত্রো বা কাস্ত্রো, মাসত্রোইয়ানি। কিন্তু স্ব, ম্প, ল্ব প্রভৃতি যুক্তাক্ষর নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়—অ্যাবারক্রমবি/অ্যাবারক্রম্বি, বাল্‌ব্/বাল্ব, শ্যামপেন/শ্যাম্পেন, অ্যালবিনো/অ্যাল্বিনো ইত্যাদি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যত সহজে বাল্‌ব্ লিখতে পারি,কমপিউটার লিখতে পারি, শ্যামপু, ট্র্যাকটর লিখতে পারি তত সহজেই আরট্ (art) ও আরটিস্‌ট্ (artist), পোর্‌ট (port), পোস্‌ট্ (post) লিখতে পারি না। আমাদের ভাষার লিখন রীতিতে কতকগুলো ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর স্বাভাবিকভাবেই আসে, কতকগুলি ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা সম্ভব হয় না। প্রথমত, শব্দ বা নামের শেষের সিলেবলে st থাকলে তাকে ভেঙে না লিখে যুক্তাক্ষর স্ট লেখাই সংগত—আগস্ট, আউগুস্ত, ফাউস্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, শব্দের শেষে বা শেষ সিলেবলে nt,nd থাকলে তাকেও যুক্তাক্ষরে লেখা ভালো—গ্রান্ট, গ্র্যান্ড। তৃতীয়ত, শব্দের

মধ্যে লক্, ল্ব প্রভৃতি দুটি আলাদা সিলেবলের অংশ হলে ল্ক, ল্ব এভাবে না লিখে ল্‌ক, ল্‌ব লেখাই সংগত—বলকান, অ্যালকেমি, অ্যালবাম, অলব্রাইট, অ্যালবুমিন। এসব ক্ষেত্রে হস্‌চিহ্ন দেওয়াই যেতে পারে উচ্চারণের সংশয় কাটাবার জন্য। অর্থাৎ বলকান বা বল্‌কান, অ্যালবাম বা অ্যাল্‌বাম। কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য মনে হয় না অ্যালবাম-কে কেউ 'অ্যালোবাম' বলবেন। তাই হস্‌চিহ্ন এখানে বাহুল্য হবে।

ছয়

আরও দুটো ব্যাপারে কিছু সমস্যা হতে পারে—এক, বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে হস্‌চিহ্ন ও হাইফেনের ব্যবহার হবে কি না। যেখানে যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখার জন্য ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ বোঝাতে অসুবিধে হতে পারে, সেখানে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করা যেতেই পারে— বাল্‌ব্, তক্‌ভিল (Tocqueville), সার্ত্র্ (Sartre)। চীনা নামে হাইফেন দেবার দরকার হতেই পারে—মাও জে-দং, সুন ইয়াৎ-সেন। আবার কিছু হাইফেনযুক্ত ফরাসি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণেও হাইফেন দরকার হয়। এ ছাড়া হাইফেনের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

উপরের আলোচনার উপলক্ষ্য বিদেশি শব্দ ও নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ। আগেই বলেছি মূলের উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা রীতির একটা আপস করে প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। তবে মনে রাখা দরকার, আমরা কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি দেখাতে চাই, অর্থাৎ সেটাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেখানে মূলের উচ্চারণই অনুসরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আফ্রিকা নয়, অ্যাফ্রিকা, খ্রিস্টান নয় ক্রিস্টিয়ান, প্যারিস নয় পারি লেখা হবে।

শতবর্ষের প্রজ্ঞা : সুকুমার সেন

সুনীতিকুমারের পরে সুকুমার সেনই যে শ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। এখানে অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিক শব্দটা ইংরেজি ফিললজিস্ট -এর বঙ্গানুবাদ হিসেবেই ধরেছি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বা লিংগুইস্টিকসের চর্চা করেননি সুকুমার সেন। ভাষা বিষয়ে তাঁর যাবতীয় চর্চা তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের এলাকাতেই নিবদ্ধ। ভাষার আলোচনা এখন নতুন পথে হাঁটলেও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব এখনও এতটুকু কমেছে বলে মনে হয় না। বলতে বাধা নেই সেই বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সুকুমার সেন।

ভাষাতত্ত্ব যদিও তাঁর প্রধান অবলম্বন,তার উপরই নির্ভরশীল তাঁর যাবতীয় খ্যাতি, তবু মনে রাখতেই হবে তাঁর বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কথা। বাঙালি পাঠক তাঁকে চেনেন ভাষাবিদ হিসেবে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য। কিন্তু সুকুমার সেনের ভারতবিদ্যাচর্চা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়, উপেক্ষণীয় নয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর সুবিপুল রচনাসম্ভার। গোয়েন্দা গল্পের উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে তাঁর কৌতূহল ও প্রজ্ঞা কেবল একজন বিশেষজ্ঞের পক্ষেই মানানসই। ভূতকাহিনি নিয়ে কিংবা বটতলার ছবি ও ছাপা নিয়ে সুকুমার সেনের আগ্রহের অন্ত ছিল না। কি তাঁর আত্মকথায়, কি ভূতকথায়, কি গোয়েন্দাগল্পের বিচারে এবং এছাড়াও তাঁর বহু রচনাতেই দেখা যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝলক এবং প্রসন্ন রসিকতা। সব মিলিয়ে সুকুমার সেনকে বলা যায় বিলীয়মান একটি যুগের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। তাঁর চেয়েও বড়ো ভাষাতাত্ত্বিক ভবিষ্যতে কেউ হতেই পারেন। কিন্তু এমন বিভিন্নমুখী ও বিচিত্রমুখী প্রজ্ঞা আর কারও মধ্যে দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা কম।

দুই

ভাষাতত্ত্বে অনেকের কাছে পাঠ নিলেও সুকুমার সেন প্রথম দিকে নিজেকে সোরাবজি তারাপুরওয়ালার শিষ্য বলে মনে করতেন। পরে অবশ্য নানা সময়ে সুনীতিকুমার সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতা দেখে মনে হতেই পারে তিনি তাঁরও একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। এই দুই শিক্ষকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বটে, তবে সারা জীবনের ভাষাচর্চায় পথ কেটে এগিয়ে গেছেন একান্তই নিজস্ব চিন্তাভাবনা অনুযায়ী। তাঁর বিপুল গ্রন্থসম্ভার দেখলে এই প্রত্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর সেই বহুবিচিত্র গ্রন্থাদির ভিতর থেকে কেবল ভাষাতত্ত্ববিষয়ক রচনাগুলোকে আলাদা করে নিয়ে দেখতে চাই এবার। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থের নাম 'The Use of the Cases in

Vedic Prose'। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় বৈদিক গদ্যভাষায় কারকপ্রকরণের প্রকৃতি। একই বছর রচিত হয় 'Buddhist Hybrid Sanskrit'.বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে সংস্কৃত ভাষায় যে-পরিবর্তন এসেছিল তা নিয়ে এবং লৌকিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মিশ্রণের ফলে সংস্কৃতের নতুন রূপ নিয়ে গভীর আলোচনা আছে এই সন্দর্ভে। এর পরের ভারী কাজ 'A History of Brajabuli literature' (১৯৩৫)। ব্রজবুলি সাহিত্য নিয়ে, ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনিবিচার নিয়ে এবং তার রূপপ্রক্রিয়া নিয়ে এমন দিগ্‌দর্শী আলোচনা তাঁর আগেও কেউ করেননি, পরেও নয়। ১৯৪১ সালের 'Old Persian Inscriptions of the Achaemenian Eupires' নামক গবেষণায় প্রাচীন পারসিক শিলালেখ- সমূহের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ১৯৫৩ সালে লিখলেন 'An Outline Syntax of Middle Indo-Aryan',যাতে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষাগুলির বাক্যবিন্যাস ও অন্বয়ের বিশ্লেষণ পাওয়া গেল। এই ভাষার ব্যাকরণের আরও বিশদ, আরও গভীর আলোচনা পাওয়া গেল ১৯৬০ সালের 'Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan'গ্রন্থে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে বাংলা ভাষায় লিখে ফেলেছেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত'। একথা ঠিক যে, এ-বই তিনি লিখেছিলেন মূলত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। বাংলায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এটিই তাঁর প্রথম পুস্তক। বাংলায় বটে, ছাত্রছাত্রীদের জন্যও বটে, কিন্তু গভীরতায় ও বিশ্লেষণের চমৎকারিতায় এ-বই পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচ্য।

এইসব গবেষণা থেকে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সুকুমার সেনের পরিক্রমা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয় আমাদের। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কেবল এই এলাকাগুলোতেই তাঁর গবেষণা সীমিত ছিল না। তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব। এই একটা বিষয়, যাঁর চর্চায় তিনি বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছেন। তবে সন্দেহ নেই এ বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম অবদান ১৯৭১ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'An Etymological Dictionary of Bengali : c. 1000 - 1800 AD'. তাঁর নিজেরই কৈফিয়ত অনুসারে এই বইটিতে মূল পরিকল্পনা ছিল প্রাচীন ও মধ্য বাংলার যাবতীয় শব্দের ব্যুৎপত্তির অভিধান সংকলন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয় যে, মধ্য বাংলার বহু বহু শব্দ 'are still current either in the standard language (literary and/or colloqiual) or in some dialect'. তাছাড়া শব্দের দিক থেকে অনেক সময়েই মধ্য বাংলার সঙ্গে আধুনিক বাংলার মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানা যায় না। তাই পরে অভিধানখানির সময়সীমা টানা হল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বইটির পরিকল্পনা নিয়ে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার এখানে। ইংরেজিতে বইটি লিখিত হলেও বাংলা শব্দগুলো যেহেতু রোমান হরফে লেখা, তাই শব্দের বিবৃতির পরম্পরা রোমান বর্ণমালার ক্রম অনুসারে আসবে এটা প্রত্যাশিত হলেও তা হয়নি। শব্দ সাজানো হয়েছে বাংলা বর্ণমালার ক্রম হিসেবে। অর্থাৎ A-র পরেই I, কেননা A-তে অ এবং আ আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দ রয়েছে, তারপরই ই, এবং সেই কারণেই I. দ্বিতীয় কথাটা এই যে, এই অভিধানে সাধারণভাবে কোনো তৎসম শব্দ নেওয়া হয়নি। কেননা তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়। সেই সব তৎসম শব্দই এই অভিধানে এসেছে যেগুলোর অর্থ পরে বদলে গেছে, যে-বদল কোনো সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত হয়নি, হবার কথাও নয়। একথা ঠিক যে, ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অতৎসম শব্দের সংখ্যা মাত্র কুড়ি হাজার নয় (সুকুমার

সেনের এই অভিধানে কুড়ি হাজারের মতো শব্দ ধরা আছে), তবু স্বীকার করতেই হবে, অদ্যাবধি এটাই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি-অভিধান। ইংরেজি ভাষার জন্য অনিয়ন্স ও এরিক পার্টরিজ যা করেছেন, প্রায় সেই কাজই সুকুমার সেন করেছেন বাংলা ভাষার জন্য।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'বাংলা স্থাননাম' বইটিও বস্তুতপক্ষে ব্যুৎপত্তি সন্ধানেরই বই। এতে প্রায় তেরোশো স্থাননামের উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রয়াস আছে, তাঁর ভাষায় এটা এক রকমের linguistic speculation. তাঁর এই speculation কথাটি যথার্থ, কেননা অনেক ক্ষেত্রেই নামের ব্যুৎপত্তি দ্বিধাহীন নয়। তাঁর কিছু নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষত বারাসত (বারাসাত?), বাগাটি, কাটোয়া, পোলবা, বরাকর (বড়াকর) প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর অনুমান নির্ভুল না হতেও পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গবেষণার মূল্যের এতটুকু হানি হয় না। বাংলা স্থাননাম সম্পর্কে তিনি যে বিস্তৃত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো।

এ বিষয়ে সুকুমার সেনের আর একটি রচনা ১৯৮৮ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পত্রিকায় প্রকাশিত 'কিছু বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি-সন্ধান', যাতে তিনি একাত্তরটি বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে নতুন করে বিবেচনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এতাবৎ যা ভাবা হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তিনি। প্যাঁচ, পাল, ভুনি, সড়গড় প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা আমাদের নতুন করে ভাবাবে। তবে তাঁর ব্যুৎপত্তিচর্চার একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের একটু অস্বস্তিতে ফেলে। ব্যুৎপত্তির সন্ধানে তিনি বৈদিক বা সংস্কৃত উৎস নিয়ে যত ভেবেছেন, অস্ট্রিক দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতি উৎস সম্বন্ধে তত ভাবেননি। তাঁর মতো ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক। এ বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ রচনা 'বুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ'।

সুকুমার সেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা হল Women's Dialact in Indo-Aryan. এটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters এর Vol- XXVIII সংখ্যায়। কিছু পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় বেরোয় তাঁর 'বাংলায় নারীর ভাষা'। আরও পরে এই দুটি প্রবন্ধ একসঙ্গে প্রকাশিত হয় 'Women's Dialect in Bengali'. প্রসঙ্গত স্মরণ করি, বাংলায় নারীর ভাষা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন নির্মল দাশ। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় নারীর ভাষা নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন শর্মিলা বসু দত্ত। কিন্তু সুকুমার সেনই যে এ পথের প্রথম পথিক তাও মনে রাখতে হবে।

আরও একটা কথা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণে আনতে হবে। স্টাইলিসটিকস বা শৈলীবিজ্ঞানের বিকাশ খুব বেশি দিনের কথা নয়। একালে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে শৈলীবিজ্ঞান। পশ্চিমে শৈলীর আলোচনা যতদিন ধরে হচ্ছে, নিশ্চয় এ দেশে ততদিন ধরে হচ্ছে না। আমাদের দেশে সাহিত্যের শৈলীগত অনুধাবন একেবারেই নতুন। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' বইটিকে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই বইটিকে বলতে পারি বাংলা ভাষায় গদ্যশৈলীবিষয়ক প্রথম বই। একথা বলা নিশ্চয় সম্ভব নয় যে, আধুনিক শৈলীবজ্ঞানের পথ ধরেই এই বইয়ের যাবতীয় আলোচনা। কিন্তু যা পাওয়া যাচ্ছে এই বইয়ে, তার জন্য সুকুমার সেনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন বাংলা গদ্যভাষার যে-কোনো গবেষক। বস্তুতপক্ষে, বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনের শুধু-যে একটা রূপরেখাই পাওয়া গেল তা নয়, এই

বইয়ের কোনো কোনো আলোচনা একান্তই পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রসঙ্গে বাক্যগঠনরীতির বিশেষত্বটি ধরিয়ে দিয়েছেন সুকুমার সেন। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যের নিজস্ব যতিটিকে আবিষ্কার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনাগুলিতে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যশৈলীর প্রভাবের আলোচনাও সুকুমার সেনের এক বিশেষ অবদান। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গদ্যশৈলী আলোচনার প্রসঙ্গে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন যে, ওই উপন্যাসেই বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি ও 'বঙ্কিমের বিশিষ্ট রচনাশৈলীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।' এ বইয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বিশেষণ-বিপর্যাসের আলোচনায় শুধু তথ্যই নেই, আছে দীপ্তিও। 'নৌকাডুবির' গদ্যে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অনুপম ভাষা রচনা করেছেন তার বিশ্লেষণ করেছেন সুকুমার সেন। তাঁর মতে 'উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের মৌলিকতায় ও অর্থালঙ্কারের ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ সকল কবিকে হার মানাইয়াছেন, কালিদাস - বাণভট্টকেও'। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাদি থেকে বিস্তর দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাক্যগঠনের ব্যাকরণ নিয়েও সুকুমার সেন গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করতে রবীন্দ্রনাথ অনেকসময় একই কর্তৃপদযুক্ত বাক্যপরম্পরায় কর্তৃপদের অপ্রয়োগ ঘটিয়েছেন; পরম্পরিত (correlative) বাক্যের ব্যবহার, অনির্দেশক সর্বনামের (indefinite pronoun) বদলে মধ্যমপুরুষের সর্বনামের ব্যবহার, অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা স্বাধীনভাবে অতীতকালের অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার, ইংরেজি গদ্যরীতির অনুসরণ, বিশেষণ পদকে বিশেষ্যের মতো করে প্রয়োগ, সমানাধিকরণ সম্বন্ধ- পদের প্রয়োগ, সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে, বৈচিত্র্যের খাতিরে, পরপর অনেকগুলি বিশেষণ অথবা ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ (asyndeton), প্রত্যয়ের ব্যবহারে বৈচিত্র্য, বাংলা ও সংস্কৃত সমাসপদ্ধতির বিচিত্র প্রয়োগ—এসব তো আছেই। এছাড়া সমিল গদ্যের (rhymed prose) ব্যবহারে, ইডিয়মের বিচিত্র প্রয়োগে,বৈপরীত্য সাধনে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা বাংলাভাষায় কেন ও কীভাবে অনন্য তার সম্ভবত প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সুকুমার সেনই করেছেন।

ভাষাচর্চার, বিশেষত বাংলাভাষা চর্চার আর একটা ক্ষেত্র বানান। তাই সুকুমার সেন বাংলা বানান-আলোচনায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করবেন না এ হতেই পারে না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন ঠিকই। তবে এই একটি ক্ষেত্র যেখানে আমরা তাঁর দাপট সেভাবে অনুভব করি না। বাংলা বানানের যেসব আলোচনা তিনি করেছেন তা নিতান্তই আংশিক, খণ্ডিত ও পার্শ্বিক। এ বিষয়ে তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়, প্রথমটি ১৮ নভেম্বর ১৯৮১ তারিখে 'বাংলা শব্দের বানান সমস্যার জটিলতা' নামে এবং দ্বিতীয়টি, 'অবাঙালি ব্যক্তি ও স্থান নামের লিপ্যন্তর সমস্যা' ৭ ডিসেম্বর১৯৮৩ তারিখে। প্রথম রচনাটিতে বাংলা বানানের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে তৎসম ও তদ্ভব দুই রকমের শব্দের বানানের কথা বলেছেন তিনি। তিনি ঠিকই ধরেছেন যে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ শিষ্ট কথ্য বা standard colloquial চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানানে জটিলতা আসে। তৎসম শব্দের প্রসঙ্গে মূলত ইন্-ভাগান্ত শব্দের কথাই বলেন তিনি। তিনি এক্ষেত্রে গুণি, প্রতিযোগিতা, যোগি প্রভৃতি লেখার

পক্ষে তাঁর সায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলি, ঠিক এই কথাই মণীন্দ্রকুমার ঘোষও বলেছিলেন কোনো-এক প্রসঙ্গে। রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বানান-সংস্কার সমিতির কোনো-কোনো সুপারিশ সুকুমার সেনের কাছে অত্যন্ত 'অস্পষ্ট' মনে হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি অবশ্য খুব উৎকৃষ্ট কিছু নয়। বরং তুলনায় অন্য রচনাটিতে অর্থাৎ অবাঙালি ব্যক্তি ও স্থানের নামের লিপ্যন্তর সমস্যা নিয়ে তাঁর রচনায় গভীরতা কিছু বেশি। তবু বলতেই হবে বানান সমস্যা যে কারণেই হোক তাঁকে খুব বেশি আকর্ষণ করেনি। তাই বানানের নানান জটিলতা ও সমস্যা নিয়ে যখন রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রকুমার ঘোষের মতো বিশেষজ্ঞরা বারবার কলম ধরেছেন, তখন সুকুমার সেনই একমাত্র ভাষাবিদ, যিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে এই পথে ততটা চালিত করেননি।

তিন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন অনেকেই। সুকুমার সেন সেখানেও অনন্য। কি পরিকল্পনায়, কি রচনারীতিতে সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' অন্য সমস্ত অনুরূপ ইতিহাসের চাইতে আলাদা। অন্য সাহিত্যের ইতিহাসগুলোতে বাংলা সাহিত্যের ধারাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুকুমার সেনের পাঁচ খণ্ডের এই সাহিত্যের ইতিহাসে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসই মূল লক্ষ্য হলেও প্রতিটি যুগের সাহিত্যের সঙ্গে, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন সুকুমার সেন। চর্যাগীতির আলোচনায় যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্য অধিকাংশ ইতিহাসে অপ্রাপ্য। বাংলা কবিতার প্রাক্‌কালে যে অবহট্‌ঠ কবিতার বিকাশ হয়েছিল তার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এও অন্যত্র পাই না। আসলে প্রাকৃত অপভ্রংশের পরে নব্যভারতীয় ভাষার স্তরের আগে অবহট্‌ঠ ভাষার ভাবনাটা অনেকটাই সুকুমার সেনের চিন্তাপ্রসূত। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডের আর এক বৈশিষ্ট্য চৈতন্যচর্চা। এই বইয়ের প্রায় একশো পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে 'চৈতন্যাবদান' নামের একটি অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের অবদান ও প্রভাব নিয়ে অন্যত্রও আলোচনা করেছেন তিনি এবং আরও বিশদ আরও পল্লবিত সেসব আলোচনা। সাহিত্যের ইতিহাসে তার সবকিছুর দরকার করে না। সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় তার সবই আলোচিত ও বর্ণিত এই খণ্ডে এবং যথেষ্ট গভীর ও ঋদ্ধ সে-আলোচনা। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র চতুর্থ খণ্ডটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই খণ্ডের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথ এবং শুধুই রবীন্দ্রনাথ। এখানেও সুকুমার সেন তাঁর বিশিষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন। এখানে তাঁর রবীন্দ্রবীক্ষার পরিকল্পনাটি দেখা যেতে পারে। ভূমিকা বাদে প্রথম পনেরোটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার উন্মোচন ও বিকাশ পর্বে-পর্বে ভাগ করে দেখানো হয়েছে এবং তা হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে। পরের চারটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে নাটক-প্রহসন, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। শেষ পরিচ্ছেদটি (একবিংশ) ব্যয়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনায়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র পঞ্চম বা শেষ খণ্ডে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য। এই খণ্ডটিই এই ইতিহাসের একমাত্র দুর্বল অংশ। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য (১৯২৫ সময়টা রবীন্দ্রোত্তর যুগ নয় বটে, তবে

এখানে রবীন্দ্রনাথের অনুজ সাহিত্যিকরাই আলোচনার বিষয়) সম্বন্ধে সুকুমার সেন বোধহয় একটু কম মনোযোগী ছিলেন।

সাহিত্যের ইতিহাসের প্রসঙ্গ থেকে দুটি বইয়ের অনুল্লেখ খুবই অনুচিত হবে। একটি 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস', আর দ্বিতীয়টি 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। 'ভারতীয়-আর্য ভাষার 'ইতিহাসে' বৈদিক সাহিত্যের কথা তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, গীতার কথা, পুরাণের কথা, প্রাচীন প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যের কথা, সংস্কৃত সাহিত্যের কথা এবং অবহট্‌ঠ সাহিত্যের কথা। আবার বলি, অবহট্‌ঠ ভাষা ও সাহিত্য ছিল সুকুমার সেনের বিশেষ প্রিয় বিষয়। এই বইটিকে আমরা বলতে পারি বাংলায় লেখা ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের অদ্যাবধি সর্বোত্তম উপক্রমণিকা। 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' আসলে একালের কোনো বিষয় নয়। এই বইয়ে আছে মধ্যযুগে ও প্রাক্‌-আধুনিককালে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার আলোচনা এবং তৎসহ উনিশ শতকের ইসলামি বাংলা সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ। এই বইয়ের আলোচনা কিছুটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু লেখকের অন্যান্য বইয়ের গুণ এখানেও পুরোমাত্রায় রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদানের পরিচয় সম্পর্কে এই বইটি অপরিহার্য বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত বলা যাক, বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন এর নাম ছিল 'ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য', পরে নাম বদল করে দাঁড়ায় 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'।

চার

ভারতবিদ্যাচর্চা একসময় প্রাচ্যপন্থী ইয়োরোপীয়দের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় বলে গণ্য হত। তখন ভারতবিদ্যা এবং প্রাচ্যবিদ্যা বা Indologyকে অভিন্ন ভাবা হত। অনেক কাল হল আমরা প্রাচ্যবিদ্যা না বলে বিষয়টিকে ভারতবিদ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়েছি। স্থূলভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবই এর আলোচ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতগৌরব নয়, ভারত-অনুসন্ধানই এর বিষয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য সবই ভারতবিদ্যার অন্তর্ভূত। এই প্রসঙ্গেও একবার সুকুমার সেনের কথা উঠবে। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র থেকে শুরু করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হয়ে এ কালের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও সুকুমার সেনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে ভারতবিদ্যার বাঙালি সাধক হিসেবে। এবং অবশ্যই এই ধারার শেষতম প্রতিনিধি সুকুমার সেন। ভারতবিদ্যা চর্চায় সুকুমার সেন পুরোবর্তী অনেকের চাইতে অনেক এগিয়েও ছিলেন। যখন স্মরণ করি ১৯৮৩ সালে ভারতবিদ্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে সুকুমার সেনকে এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, তখন আর এ বিষয়ে কোনো সংশয়ই থাকে না যে, পাশ্চাত্যেও তাঁকে ভারতবিদ্যার অগ্রপথিক বলে স্বীকার করা হয়। এই দুর্লভ সম্মান সুনীতিকুমারেরও অনর্জিত থেকে গিয়েছিল, যদিও তাঁর যোগ্যতা নিয়ে কোনোই প্রশ্ন ওঠে না। যোগ্য ব্যক্তিরাও কখনো-কখনো স্বীকৃতি পান না। তা বলে যাঁরা পান, তাঁদের কীর্তি খাটো হয় না। এশিয়াটিক সোসাইটির এই স্বর্ণপদককে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর উচ্চতম সম্মান বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যাঁকে এভাবে সম্মানিত করা হল, দেখা দরকার কী তাঁর অবদান ওই ক্ষেত্রে। সম্মান দেবার সময় যদিও সুকুমার সেনের ইংরেজি রচনাগুলিই মূলত বিবেচিত

হয়েছে, তথাপি বাংলা ভাষায় রচিত বহু গবেষণারও উল্লেখ অনিবার্য। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে সুকুমার সেনের ব্যুৎপত্তি এবং ওই ক্ষেত্রে তাঁর রচনাদি ওই শ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য তাঁর দাবি তৈরি করেছে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে, মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণারও উল্লেখ করতে হয়। এ ছাড়া তাঁর 'Great Goddeses in Indic Tradition' (1983), 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন', 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' প্রভৃতি রচনা আকারে ছোটো বটে, কিন্তু গুরুত্বে অসাধারণ। এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক সুকুমার সেনকে দেবার ফলে সম্মানটি নতুন তাৎপর্য লাভ করল। ঘোষণার কিছুদিন পরে 'দেশ' পত্রিকায় 'ভারত-বিদ্যার জাতীয় প্রতিনিধি: সুকুমার সেন' নিবন্ধে তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'এই স্বর্ণপদকের সম্মান এমন একজনের উদ্দেশ্যে, যিনি ভারত-বিদ্যায় বর্তমান যুগের প্রতিনিধি।' তিনি আরও লিখলেন, 'এ সম্মান একের নয়, বহুর, ব্যক্তির নয় জাতির।' একে অতিশয়োক্তি বলতে পারি না। এই কথাগুলো স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় আনত হতেই হয়।

পাঁচ

যিনি আমাদের এই সময়ের এক অগ্রগণ্য ভাষাগবেষক, সুনীতিকুমারের পরে যাঁকে শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক বলা যায়, যিনি ভারতবিদ্যার এক শ্রেষ্ঠ সাধক, তিনিই আবার লেখেন 'বটতলার ছাপা ও ছবি', বনফুলকে নিয়ে লেখেন 'বনফুলের ফুলবন', লেখেন 'কলকাতার কাহিনী', সম্পাদনা করেন বাংলা কবিতার এক দীর্ঘ সংকলনের —'বাংলা কবিতা সমুচ্চয়' (প্রথম খণ্ড)। গোয়েন্দা গল্পের উৎস ও ধারা নিয়েও তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। লিখেছিলেন 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি'। ভূতের গল্প লিখেছেন, ভূতের গল্প নিয়ে আলোচনাও করেছেন। বাংলার সাহিত্য ও সমাজে চৈতন্যের আবির্ভাব তাঁর মতে অন্ত্য-মধ্যযুগের বৃহত্তম ঘটনা। লিখেছেন 'চৈতন্যাবদান'। কিন্তু তাঁর যে বই এগুলোর চাইতেও অনেক বেশি মনোহারী এবং মূল্যবান তা হল দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী—'দিনের পরে দিন যে গেল'। এই বইয়ের প্রথম পর্বে তাঁর জন্ম থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সময় ধরা হয়েছে। বইটির একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে লেখকের পড়াশোনার কথা। একেবারে প্রাথমিক শিক্ষার সময় থেকে যুবাবয়স পর্যন্ত কী কী বাংলা ও ইংরেজি বই তিনি পড়েছিলেন তার খতিয়ান এই পর্বের একটা বড়ো আকর্ষণ। কতকগুলো বইয়ের উল্লেখ আমাদের মনেও বিদ্যুতের ঝিলিক জাগিয়ে তোলে, কেননা সেগুলো আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের ছাত্র বয়সেও সমান আগ্রহ নিয়ে পড়া হত। বিশেষত পলগ্রেভের চিলড্রেন্স ট্রেজারি অব ইংলিশ ভার্স, এবং গোল্ডেন ট্রেজারি, গ্রিমের পপুলার টেলস, মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমজ়, ল্যামের টেলস ফ্রম শেকসপিয়ার ইত্যাদি। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তিনি 'জীবনস্মৃতি' পড়েন প্রথম। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত সুকুমার সেন শশীচন্দ্র দত্ত নামে এক স্বল্পজ্ঞাত লেখকের ততোধিক স্বল্পজ্ঞাত রচনা 'Reminiscences of a Kerani's life'-এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। জানা গেল এই লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের কাকা। ১৯২২ সালের প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনের আবেগঘন বর্ণনা করেছেন তিনি;যার মূল সভাপতি ছিলেন সিলভাঁ লেভি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়ে যাঁদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন সোরাবজি তারাপুরওয়ালা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্যরা।

সুনীতিকুমার কিছুকাল পরে ওই বিভাগে এসে যোগ দিয়েছিলেন। সেটা ১৯২২ সাল। এই বইয়ের নানান জায়গায় সুনীতিবাবু সম্পর্কে মুগ্ধ উল্লেখ দেখতে পাই। আমরা জানতে পারি, সুনীতিবাবুর ODBL এর index সুকুমার সেন তৈরি করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই তথ্যটি আমাদের অজানা ছিল না। কেননা, ১৯২৬ সালে যখন সুনীতিকুমারের ওই মহাগ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সুনীতিবাবু সুকুমার সেনের এই index তৈরি করে দেওয়ার উল্লেখ করেন। একথা লেখার সময় তাঁর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা যেন ঝরে পড়ছিল।

দ্বিতীয় পর্বটিতে তাঁর পরিণত বয়সের কথাই বেশি আছে। চাকরির কথা, বন্ধুদের কথা, কলকাতার বর্ণনা, বর্ধমান—এসবই আছে বইয়ের এই দ্বিতীয় পর্বে, তবু,এখানেও বই নিয়েই আছে বেশি কথা। বইয়ের প্রসঙ্গ এলেই লেখক একটু যেন আত্মহারা হয়ে যান। এই পর্বে তিনি বহু বিখ্যাত বইয়ের উল্লেখ করেছেন। তবে বিশেষভাবে মনে গেঁথে যায় স্টিভেনসনের নিউ অ্যারেবিয়ান নাইটস, ডিকেন্সের পিকউইক পেপার্স, হডার অ্যান্ড স্টাফটন প্রকাশিত ও হেনরির বই। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে বই কেনা ও বই দেখার বর্ণনা আছে। তাঁর সমকালীন অনেকের কথাই বলেছেন, যাঁদের কেউ-কেউ বয়সে প্রবীণতর। শিক্ষকদের মধ্যে ভান্ডারকর, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর কথা পড়ে সেই উজ্জ্বল সময়টাকে অনেকটাই ধরতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা নানাভাবে এসেছে। তবে দুটো জায়গায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করে দেখাবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বইয়ের অবতরণিকায় বলছেন— 'আমি রবীন্দ্রনাথের একলব্য চেলা বলে অহংকার করি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পাব কোথায়? তবে তাঁর বাণীর ভরসা রাখি'। আর একবার ১৯৩২ সালের কথা বলেছিলেন। ওই বছর জুলাই মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীনেশচন্দ্র সেনের পরে দুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। প্রথম অধ্যাপক হলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই উপলক্ষ্যে ফ্যাকালটি ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলের যে শোভা হয়েছিল "তা স্মরণ করলে আজও মন খুশিতে ভরে ওঠে। তেমনটি আর কখনো হয়নি, হবেও না।"

একথা ঠিক যে, সুকুমার সেন প্রধানত এক প্রাজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ওই পরিচয় ছাড়িয়ে কখনো-কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকার হিসেবে তাঁর পরিচয়। আবার সেই একই ব্যক্তিকে জানি ভারতবিদ্যার সাধক হিসেবে। তাঁর বহুমুখী ও বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও চর্চা প্রায়ই এসবও ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছে। তাঁর বিষয়ে লিখতে বসলে তাঁর এই বিরাট ও বহুব্যাপ্ত বিদ্যাচর্চার কথা বিশেষভাবে আমাদের অধিকার করে।

সকৌতুক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য

জ্যোতিভূষণ চাকীর বিদ্যাবত্তার তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন বহুভাষী পণ্ডিত, শ্রুতকীর্তি বৈয়াকরণ, অদ্বিতীয় অনুবাদক, পুস্তকাদির সম্পাদনায় বিশিষ্ট। কিন্তু এই সবের মধ্যেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় ফোটে না। তিনি যে অসামান্য রসবোধসম্পন্ন লেখক ছিলেন এই কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে তাঁর লেখা যেসব নিবন্ধ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত তাতে তাঁর রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পেয়েছি। এমনকী, দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতাতেও জ্যোতিভূষণকে দেখা গেছে হাস্যপরিহাসে শ্রোতাদের হর্ষোৎফুল্ল করে তুলতে। এই অনুচ্ছেদে জ্যোতিভূষণ চাকীর কথা বলতে গিয়ে অতীতকালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার আমাদের পক্ষে নিতান্তই বেদনাজনক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, জ্যোতিভূষণ চাকী আর নেই। তাঁর মৃত্যু বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি।

দেশ পত্রিকায় যখন কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হচ্ছিল 'বাগর্থকৌতুকী', তখন আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। 'ভট্টোজি' নামের আড়ালে কে রয়েছেন তা নিয়ে অনুমান-আন্দাজ চলতই। তবে জ্যোতিভূষণ চাকীই যে লেখক একথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলেও অনুমান ছিলই। কিন্তু রচনাটির পুস্তকের প্রকাশ তাতে অবশ্যই নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কেননা তাঁর নাতিবৃহৎ ভূমিকাটি তখন ছিল না। আর এই ভূমিকা থেকেই আমরা জেনেছি তাঁর 'ভট্টোজি' ছদ্মনাম নেবার কারণ। ভট্টোজি প্রাচীন ভারতের এক বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও টীকাকার। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ব্যাখ্যাতা, তাঁকে জনপ্রিয় করতেও ভট্টোজির ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কিন্তু আমরা মনে করি এতে জ্যোতিভূষণের রচনাগুলির একটি দিক ধরা পড়লেও অন্য দিকটি ধরা পড়ে না। জ্যোতিভূষণ বিশিষ্ট বৈয়াকরণ এবং শব্দবিদ, কাজেই 'ভট্টোজি' নাম তিনি নিতেই পারেন। কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থে তাঁর রসজ্ঞতার যে পরিচয় বিধৃত আছে তা কিন্তু ভট্টোজি নামে ধরা দেয় না। প্রাচীন ভারতের ভট্টোজি কি এতটাই রসস্নিগ্ধ রচনা উপহার দিয়েছেন?

দুই

'বাগর্থকৌতুকী' শব্দবিদ্যার বই নয়। শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ সংক্রান্ত বহু বিচিত্র তথ্যে যেমন ঠাসা এই বই, তেমনি কোন শব্দ কলকে পেল, কোন শব্দ পেল না, কোন শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে গেল, কোন শব্দ উৎস থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে গিয়ে অন্য রূপ ধারণ করল — এসব গল্পে এ-বই ঠাসা। 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখক আরও কয়েকটা 'ইন্ডিয়ান ইংলিশ' - চিহ্নিত শব্দের কথা বললেন। তাঁর আক্ষেপ —bazar বা

coolie-র মতো শব্দ সাহেবরা হজম করলেও Himalayan blunder-কে বিনা মন্তব্যে মেনে নেয়নি। শুধু তা-ও নয়। Black money কথাটাও 'ওঁদের অভিধানে অস্পৃশ্য' জ্যোতিভুষণের এই আক্ষেপ অনর্থক নয়। তবে তাঁকে জানানো গেল না যে Oxford Concise English Dictionary-র দশম সংস্করণে কোনো বিরূপ মন্তব্য বা কটাক্ষ ছাড়াই black moneyকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্র যে কত রকমে শব্দ বানায় তার হিসেব রাখাই দায়। একসময় সংবাদপত্রের 'বিশেষ' ভাষাকে নিয়ে স্টাইল বা প্রয়োগরীতির পণ্ডিতরা ব্যঙ্গবিদ্রুপ কম করেননি। সংবাদপত্রের ভাষাকে journalese নাম দিয়ে সকলকে তাঁরা সাবধান করে দিয়েছেন। ফাউলার, পার্ট্রিজ, গাওয়ার্স কেউই কম যান না। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, এই সংবাদপত্রের দৌলতেই আমরা পেয়েছি যানজট, উড়ালপুল, উড়ান (flight) চিরুনি তল্লাশির মতো চমকপ্রদ অনুবাদ শব্দ। জ্যোতিভূষণ চাকী একটি পরিচ্ছেদে ('চিরুনি তল্লাশি থেকে ইঁদুর দৌড়') চমৎকার দেখিয়েছেন কতভাবে সংবাদপত্র আমাদের ভাষাকে ঋদ্ধ করেছে।

পুরুষপ্রধান সমাজে ভাষাতেও পুরুষতন্ত্রের অভ্রান্ত প্রকাশ। সাধে কি নারীবাদীরা এ নিয়ে সোরগোল তুলেছেন? Man is mortal বলে তাবৎ স্ত্রীপুরুষ সবাইকে তার মধ্যে পুরে দেওয়া হল। Man এর মধ্যে Woman ধরা আছে একথা যদি বলি, তবে প্রশ্ন উঠবে, Woman-এর মধ্যেও কি Man আছে? জ্যোতিভুষণ চাকী এ বিষয়ে একটি ছোটো রচনা লিখেছেন। ছোটো দৈর্ঘ্যে, গুরুত্বে নয়। 'শব্দে পুরুষপ্রাধান্য ও যৌনতা' নিবন্ধটি একটা eye -opener এর মতো কাজ করে, নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই। পুরুষপ্রধান শব্দই বলি আর নারীগন্ধী শব্দই বলি, এই সবের মধ্যে সামাজিক মনোভাবটি আশ্চর্যরকম ভাবে ফুটে ওঠে। চেয়ারম্যান-এর ঔদ্ধত্য না হয় 'চেয়ারপার্সন' দিয়ে কিছুটা ঢাকা গেল, কিন্তু 'স্ত্রী', 'ভার্যা' বা 'রমণী'-র মতো যৌনতাগন্ধী শব্দের লজ্জা ডাকব কী দিয়ে?

হব্‌সন-জব্‌সন প্রকাশিত হবার পর থেকেই ও-বই ভাষা-উৎসাহী পাঠকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। শত শত ভারতীয় শব্দ সাগরপারে গিয়ে কী রূপ ধারণ করেছে, যাত্রার পথে তাদের কী রূপান্তর হয়েছে তার বিচিত্র কাহিনিতে ঠাসা হব্‌সন-জব্‌সন। সেই হব্‌সন-জব্‌সনকে নিয়ে কী অপূর্ব রচনাই না পেশ করলেন চাকী মশাই। 'ইয়া হাসান ইয়া হোসেন' মহরমের এই ধ্বনিটিকে ইংরেজ সৈনিকরা করে নিলেন Houseen-Goseen, Hossy-Gossy, Sausem-Sawsen ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ওই ধ্বনিরই রূপান্তর হল— Hobson-Jobson. ভাবা যায়? ১৮৮৬ সালে Yule ও Burnell -এর Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases নামক বইটিরই বিকল্প নাম হল Hobson-Jobson. শুধু কি তাই, এভাবেই এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার ধ্বনিরঙ্গের নাম বা প্রক্রিয়াটির নামও দাঁড়িয়ে গেল Hobson-Jobsonism. 'হব্‌সন-জব্‌সন' নামের এই চমকপ্রদ আর চিত্তকর্ষক কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন জ্যোতিভূষণ চাকী।

চাকী মশাই এই বইয়ে একটি বহু পুরোনো চমকপ্রদ বইয়ের কথা বলেছেন। বইটি একটি অভিধান—The Devil's Dictionary অর্থাৎ শয়তানের অভিধান। ১৮৮১ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল অ্যামব্রোজ বিয়ার্স-এর লেখা

এই অভিধান। তখন অবশ্য এর নাম ছিল The Cynic's Word Book. বোঝাই যাচ্ছে, পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে লেখক বইটির নাম পালটে দেন। এই শয়তানের অভিধান থেকে যে দৃষ্টান্তগুলো জ্যোতিভূষণ চাকী তুলে এনেছেন সেগুলো দেখলে এই প্রত্যয় হয় যে, Devil's Dictionary-র চেয়ে Cynic's Word Book নাম অধিকতর সংগত। ওই বইয়ের দু-একটি রসকণিকা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

Accuse vt. to affirm another's guilt or unworth, most commonly as a justification for having wronged him.

Aprilfool n. the Marchfool with another month added to his folly.

কয়েকটি মুখশব্দের বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন চাকী মশাই। ভারী চমকপ্রদ সেগুলো—

রূপ— স্ত্রীলোকের সেই গুণ যা প্রেমিকদের সম্মোহিত করে রাখে এবং স্বামীদের আতঙ্কিত করে তোলে।

রুমাল— চৌকো এক টুকরো লিনেন বা সিল্ক যা কারও শেষকৃত্যের সময় চোখের জলের অভাব ঢাকবার কাজে লাগে।

এগুলো পড়তে পড়তেই মনে পড়ে গেল আর এক অভিনব এবং বিচিত্র অভিধানের কথা, গুস্তাভ ফ্লবের- রচিত অভিধান, চিন্ময় গুহর অনুবাদে যা 'আহাম্মকের অভিধান'। ওতেও রয়েছে অমনিই সব তির্যক্-রসালো বয়ান। একটি-দুটি পরিবেশন করা যাক—

পুরস্কার—বাইরে নিন্দে করবে ও মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করবে।

তুলো—কানে দেবার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

নির্বোধ—যার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।

নারীর প্রসাধন— কল্পনাকে বিচলিত করে।

তিন

জ্যোতিভূষণ চাকীর চোখ যেন ঠিক জহুরির। নানা জায়গায় নানা ক্ষেত্রে যে হাজার হাজার শব্দ আর শব্দবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে তার ভিতর থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে শনাক্ত করে তুলে এনেছেন। অমোঘ তাঁর শব্দনির্বাচন। বর্বর, ক্লিশে, ক্যারিশমা, লাগাতার, দেখভাল, হেলদোল, স্বাধিকারপ্রমত্ত, উদ্‌গমন, প্রেসটিজ গ্যামাকসিন — এমনসব শব্দ নিয়ে বিস্তর খেলা খেলেছেন তিনি। খেলতে খেলতে বহু ভাষানদী পার হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন নদ্যন্তরে দেশান্তরে। ভাষার বহুতর অপার রহস্যের ইঙ্গিতও দিয়েছেন খেলাচ্ছলে। এই বইয়ের নাম 'বাগর্থকৌতুকী'। বাক্ অর্থ আর কৌতুক এই তিনের সমাহারে মণ্ডিত তাঁর এই মজাদার নাতিবৃহৎ গ্রন্থ। তাই বলব 'বাগর্থকৌতুকী' নাম সর্বাংশে সার্থক। চাকী মহাশয়ের এই অন্তিম গ্রন্থখানি পড়ে তাঁর কাছ থেকে আরও পাবার লোভ সংবরণ করা যায় না। কিন্তু তা তো হবার নয়। তিনি গত হয়েছেন, এই আক্ষেপ অনপনেয়। পাণ্ডিত্য রসবোধ আর তিক্ততাহীন তির্যগ্‌ভাষণের এমন সমাহার আর কি পাওয়া যাবে?

মণীন্দ্রকুমার ঘোষের বানান ভাবনা

তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন বাংলা বানানের বলতে গেলে শেষ বিচারক। এমন-কোনো আলোচককে জানি না যিনি কোনো-না-কোনো সময়ে বানান সম্বন্ধে সংশয় নিরসনের জন্য কিংবা কোনো বিশেষ বানান সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান জানবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হননি। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকেই মনে হয়েছে বাংলা বানান বিষয়ে এক পরম নির্ভরযোগ্য অধিকর্তা, যিনি স্বভাবত নির্লিপ্ত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী, বানান নৈরাজ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন এবং উপদেশ ও পরামর্শদানে অকৃপণ, বানান বিষয়ে বহুদর্শী হয়েও যিনি কর্তৃত্বপরায়ণ নন আদৌ। কীভাবে বানানরাজ্যে তাঁর নিশ্চিত অভিভাবকতা প্রতিষ্ঠিত হল তবে?

বাংলা বানান বিতর্ক নতুন ব্যাপার নয়, তার পিছনে রয়েছে প্রায় একশো বছরের ইতিহাস। সেই বিতর্ক নিরসনের জন্য এবং যেসব সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলির নিরাকরণের জন্য গঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি। সেই সমিতির সুপারিশ মুহূর্তে গৃহীত হয়ে যায়নি। তা নিয়ে কয়েকবছর চলেছিল তুমুল বিতণ্ডা। সেই বিতণ্ডায় দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন সরবতম আলোচক। তিনি বানান সমিতির অধিকাংশ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য মনে করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু সেই বিংশ শতকের চতুর্থ দশকেও, রবীন্দ্রনাথের বিপুল উপস্থিতি সত্ত্বেও, তিনি কাণ,বাণান, সোণা প্রভৃতি বানানের সপক্ষতা করেছিলেন তাঁর মতামত তাই গৃহীত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সেই সময় থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত (রাজশেখর বসুর মৃত্যুর বছর) কিংবা আরও পরে ১৯৭৭ পর্যন্ত (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বছর) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ১৯৩৬ সালের সুপারিশ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সেসব সুপারিশ অনেকটা গৃহীত হয়েছে, কিছুটা অগ্রাহ্যও হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যার সৃষ্টিও হয়েছে। তা নিয়েও হয়েছে প্রচুর বিতর্ক। সে বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি।

১৯৩৬ সালের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পরে সেসব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (দেবপ্রসাদ ঘোষের কথা আগেই বলেছি)। বাংলা বানান নিয়ে কিছু আলোচনা পাই রবীন্দ্রনাথেও। বাংলা বানান নিয়ে এবং সমিতির সুপারিশ নিয়ে অলোচনা করেছেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র সেন, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। কিন্তু কেউই বাংলা বানান নিয়ে এত পূর্ণাঙ্গ ও এত পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক আলোচনা করেননি, যা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ করেছেন। মণীন্দ্রকুমারই আমাদের সময়ের একমাত্র আলোচক যিনি বাংলা বানানের সমস্যাকে খণ্ডিতভাবে না দেখে সমগ্রভাবে দেখেছেন।

দুই

বাংলা বানানে সংস্কৃতের প্রভাব কতটা থাকবে বা থাকবে না, তা যেহেতু সমস্যার একটা প্রধান দিক,এবং বাংলা শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ, বিভক্তিযুক্ত রূপ যেহেতু প্রায়ই বানানসমস্যার সৃষ্টি করে, তাই বাংলা বানান নিয়ে আলোচনায় সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণে নিশ্চিত অধিকার আবশ্যিক কোনো শর্ত না হলেও তা যে সুবিধাজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো মণীন্দ্রকুমোরেরও সেই সুবিধা ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। এতদূর যে, অনেক সময়ই সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে এমন এক-একটি তথ্য পাওয়া গেছে যা বানান সমস্যার এক-একটি কোণকে মুহূর্তে আলোকিত করেছে। এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সমস্ত প্রস্তাবই অবশ্যমান্য। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে কলহ করা সম্ভব। তবু, বাংলা ভাষার বানান সমস্যাটিকে আদ্যোপান্ত জরিপ করে নিয়ে, প্রতিটি ডিটেলকে তাঁর আলোচনার বৃত্তে নিয়ে এসে সামগ্রিক যে-বিবেচনাকে তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন, তার তুল্য কিছু ইদানীং আমরা পাইনি একথা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। সেই কারণেই তিনি হয়ে গেছেন রাজশেখর-সুনীতিকুমারের পরবর্তী সময়ের বাংলা বানানরাজ্যের অভিভাবক। তাঁর পরে এ বিষয়ে যাঁদের আলোচনা ও বিবেচনা কিছুমাত্র ব্যাপকতা দাবি করতে পারে, তাঁরা সকলেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন হয়তো মতামতে নয়, কিন্তু উদ্যোগে ও ভাবনাচিন্তায় অবশ্যই। অর্থাৎ এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বানান নিয়ে কোনো আলোচনাতেই মণীন্দ্রকুমারকে এড়িয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব আর সেই কারণে অনুচিত। এতেই অনুমান করা যায় কত গভীর ও কতদূর ব্যাপ্ত তাঁর প্রভাব।

বাংলা বানান সংস্কারের আলোচনায় কিংবা বাংলা বানানের সমস্যার বিবেচনায় মণীন্দ্রকুমারের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব এতই অসংশয়িত ছিল যে 'বানানযুদ্ধের' সমস্ত সৈনিকই তাঁর শরণাপন্ন হতেন, তাঁর মন্তব্য ও বক্তব্যের সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও নিজ নিজ বক্তব্যকে শক্তিশালী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। মণীন্দ্রকুমারের এই অবস্থানের আরও একটা কারণের কথা বলা যেতে পারে। রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার বাংলা বানান সংস্কারের দুই প্রধান রূপকার ছিলেন বটে, তবে তাঁদের কেউই বানানসংস্কারকে তাঁদের প্রধান আলোচ্য করে তোলেননি। তাঁদের মনোযোগ ও চর্চা যুগপৎ অন্য বহু দিকে চালিত হয়েছিল। বানান আলোচনা বা বানান সংস্কার তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পার্শ্বিক অনুধ্যান। অন্য দিকে বানানই মণীন্দ্রকুমারের সারা জীবনের সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রগত বিষয়, তাঁর কৌতূহল ভালোবাসা ও সময়ের অনেকটাই শুষে নিয়েছিল। তাঁর মতো এমন করে বানানকে বা বানান সমস্যাকে অন্য প্রায় সবকিছুর চাইতে বড়ো করে দেখেননি আর কেউ। তাই শুধু বানানপ্রজ্ঞা বা প্রখর যুক্তিনিষ্ঠা নয়, কিংবা শুধু বানানকে সমগ্রভাবে দেখার দৃষ্টিও নয়, বানানরাজ্যে মণীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বের আরও একটা বড়ো কারণ তাঁর এই সার্বিক বানানমনস্কতা।

তিন

মণীন্দ্রকুমারের বানান ভাবনার অনেকটাই যদিও ধরা আছে তাঁর 'বাংলা বানান' বইয়ের নামপ্রবন্ধটিতে, তবে তাঁর বাইরেও রয়েছে কিছু ছোটো-বড়ো নিবন্ধ যেগুলি প্রকাশিত

হয়েছিল বিভাব, আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়। আছে তাঁর চিঠিপত্রে এবং আলাপচারিতায়। এইসব উৎস থেকে সহজেই মণীন্দ্রকুমারের বানানভাবনার একটা রূপরেখা তৈরি করে নেওয়া যায়। আগেই বলেছি মণীন্দ্রকুমার বাংলা বানানের প্রত্যেকটি সমস্যাসংকুল এলাকা পরিক্রম করেছেন, প্রত্যেকটি বিতর্কিত বিষয় বিবেচনা করে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিবেচনা ও বিশ্লেষণ কেমন সে-সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারি আমরা।

মণীন্দ্রকুমার তাঁর বইয়ের গোড়াতেই বলেছেন যে, রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব নিয়ে তেমন আলোচনার সুযোগ নেই, কেননা তা একরকম বর্জিত হয়েই গেছে। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব তাঁর কাছে এতই বেশি যে তিনি এই আপাত-বর্জিত প্রশ্নটি নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন। বানানসমিতির 'সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সদস্য' সুনীতিকুমারের মতে কতকগুলি শব্দে রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না। এগুলি হল কার্য্য, আচার্য্য। এবং একই যুক্তিতে ভট্টাচার্য্য, আর্য্য ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের যুক্তি ছিল উচ্চারণ। আমরা যেহেতু আচার্য্য উচ্চারণ করি, তাই ওই অতিরিক্ত য-ফলাটি তাঁর মতে আবশ্যিক। কিন্তু বানানসমিতি শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জনের বিধান দিয়েছিলেন। মণীন্দ্রকুমার সুনীতিকুমারকেই সমর্থন করেন। এবং ক্ষুব্ধভাবে বলেন, 'পুনরায় বানান-সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত এই ভুল বানান চলতেই থাকবে।' শুধু তাই নয়, তিনি কার্ত্তিক, বার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য এসব শব্দেও ব্যঞ্জনদ্বিত্বের সপক্ষতা করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে যুক্তি ব্যুৎপত্তি। অর্থাৎ মূলে শব্দগুলি যেহেতু যথাক্রমে কৃত্তিকা, বৃত্তি, বৃদ্ধ তাই এসব শব্দের ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জনীয় নয়। রাজশেখর বসুও দ্বিত্বহীন কার্তিক বানানের পক্ষে তেমন জোরালো যুক্তি দিতে পারেননি। বরং তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত ও অসহিষ্ণুই মনে হয় মণীন্দ্রকুমারের প্রশ্নের জবাব দেবার সময়। তবু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এবং বানানসমিতির অধিকাংশ সদস্য কার্তিক, ভট্টাচার্য, আচার্য লেখেন তখন 'আমাদের মতো সাধারণ লোকের "আচার্য" বানান মেনে নিতে হয়'। যখন প্রশ্নটা ভাষাগত, তখন মণীন্দ্রকুমার এসব ক্ষেত্রে দ্বিত্বেরই পক্ষে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখলেন 'এই পদ্ধতি মুদ্রণ-কার্যে খুবই সহায়তা করেছে, ফলে প্রবল প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব প্রায় নির্মূল' তখন তিনিও স্বীকার করে নেন যে আজ যেহেতু ওই 'ভুল' বানান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই তা নিয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে ং অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়। এই নিয়মে অহংকার বা অহঙ্কার, অলংকার বা অলঙ্কার, সংগীত বা সঙ্গীত, সংগম বা সঙ্গম, ভয়ংকর বা ভয়ঙ্কর হবে। এই নিয়মে বলে দিচ্ছে যে গংগা, অংক, সংগ, ভংগ এসব বানান হবে না, যেহেতু 'শব্দের পূর্বে ম্ -কারান্ত পদ নাই'। এক্ষেত্রে মণীন্দ্রকুমারের আপত্তি দ্বিবিধ। প্রথমত, বানানসংস্কারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই যখন সংশয় বা গোলযোগ দূর করা, তখন বিকল্প বিধান শুধু অহেতুক নয়, তা বিপজ্জনক ও সেই কারণে অযৌক্তিক। বিকল্প বিধানের জন্যেই যেসমস্ত বানান নিয়ে কখনো কোনো গোলমাল ছিল না, সেইসব বানানেও এবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাঁর আপত্তির দ্বিতীয় কারণ, বানানসমিতি সংস্কৃত নিয়মের কথা বলেছেন কিংবা সংস্কৃত নিয়মের

কথা মাথায় রেখেই বিধান দিয়েছেন, কিন্তু সংস্কৃত নিয়মকে খণ্ডিতভাবে দেখেছেন। যেমন, মণীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন যে নিপাতনে সিদ্ধ হলেও 'গঙ্গা' - র 'ঙ্' ম্ - স্থানেই জাত। তাহলে তো গংগা বানানও বিকল্পে সিদ্ধ হওয়ার কথা। তাহলে এই ব্যাপারটা বানানসমিতির নজরে এল না কেন? মণীন্দ্রকুমারের মতে অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গম প্রভৃতি শব্দ সেই সময় লোকের প্রয়োগে প্রায় বিকল্পহীনই ছিল। তবে কেন এগুলোর সঙ্গে অহেতুক অনুস্বারযুক্ত বানানকেও নিয়ে এসে জুড়ে দেওয়া হল? হস্‌চিহ্ন সম্বন্ধে, আরও নির্দিষ্ট করে বলি, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ ও বর্জন সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বানান-সংস্কার সমিতি হস্‌চিহ্নের ব্যাপারে বিদেশি শব্দ তদ্ভব শব্দ ও তৎসম শব্দকে একই সঙ্গে আলোচনা করে ফেলার ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে গেছে। বানানসমিতি বলছেন—'শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না।' এ ক্ষেত্রে এই 'সাধারণতঃ' কথাটির মানে কী? তার পরে অবশ্য সমিতি বলেছেন, 'কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—শাহ্, তখ্ত্, বশ্। সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে।' কোনগুলো সুপ্রচলিত শব্দ? এসব বিধান অযথা গোলমাল বাড়ায়। মণীন্দ্রকুমার এ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। বানানসমিতি বিদেশি ও তদ্ভব শব্দের অন্ত্য হস্‌চিহ্ন সম্বন্ধে যত কথা বলেছেন, তৎসম শব্দের হস্‌চিহ্ন সম্বন্ধে তত যেন ভাবিত নন। অথচ মণীন্দ্রকুমারের মতে তৎসম শব্দে হস্-চিহ্ন নিয়েই সংশয় বেশি।

একালের লেখকরা অন্তত শব্দান্তে হস্-চিহ্ন দেওয়ার ততটা পক্ষপাতী নন। মণীন্দ্রকুমার মনে করেন যে, শব্দান্তে হস্-চিহ্ন আবশ্যিক হওয়া উচিত। বাক্, ত্বক্, সম্রাট্, বিরাট্, হনুমান্, আপদ্, বিপদ্, ভগবান্, গুণবান্, বুদ্ধিমান্, মহান্, শক্তিমান্, শ্রীমান্, পৃথক্, ধিক্ প্রভৃতি শব্দে হস্-চিহ্ন না দিলে তাঁর মতে সন্ধি-সমাসে ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য। তিনি মনে করেন যে, পৃথকান্ন, বাগেশ্বরী, পৃথকীকৃত প্রভৃতি ভুল শব্দের উদ্ভব হয়েছে হস্-চিহ্নের প্রতি অমনোযোগেরই জন্য। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, শব্দের মধ্যে হস্-চিহ্ন বর্জনের কথা এখনও পর্যন্ত কেউই তেমন বলেননি। সেই কারণে বাগ্‌ধারা, ষড়্‌রিপু, দিগ্‌গজ, দিক্‌চক্রবাল, দিগ্‌দর্শন, দিগ্‌ভ্রান্ত, বাক্‌চাতুর্য,বাক্‌সিদ্ধ, বাগ্‌জাল প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী এই হস্-চিহ্ন বর্জন করা হচ্ছে না। কিন্তু শব্দান্তের হস্-চিহ্ন একরকম বর্জিত হয়েই গেছে। মণীন্দ্রকুমারের ক্ষোভ ও বিরক্তির কারণ বুঝতে পারি আমরা, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, শব্দান্তের হস্-চিহ্ন বর্জনের একটা প্রবণতা আগেই লক্ষ করা যাচ্ছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ সালে অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কারের নিয়ম প্রকাশিত হওয়ার অন্তত বাইশ বছর আগে। সেই তিনিও তাঁর অভিধানে 'দিক' মুখশব্দ রেখেছেন এবং বলেছেন এটি এসেছে সংস্কৃত দিক্ বা দিশ্ থেকে। যেসব শব্দের ভিতরে হস্-চিহ্ন আছে সেগুলো সাধারণত এখনও হস্-যুক্ত বানানেই প্রচলিত। ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রমের মধ্যে আছে ষড়যন্ত্র। তবে এক্ষেত্রে একথাও স্মরণীয় যে, এই শব্দটির উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে শড়োজন্‌ত্রো আর সেই কারণেই এর মধ্যবর্তী হস্-চিহ্নও মুছে গেছে। এই শব্দের হস্‌যুক্ত উচ্চারণ শতকরা একজন বাঙালিও করেন না। কিন্তু শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন এখন এতই বিরল যে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই

মণীন্দ্রকুমার এমনকী শব্দান্তে হস্‌বর্জনও 'গুরুতর অপরাধ' বলে মনে করলেও শব্দান্তে হস্‌বর্জন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সন্ধি-সমাসের কথাই যদি বলি, তাহলে তো চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ, মনঃ প্রভৃতি শব্দের শব্দান্তিক বিসর্গও বর্জন করা যায় না। অথচ স্বয়ং মণীন্দ্রকুমারই তো এসব শব্দ বিসর্গহীন লেখেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মতো করেই বলতে হয়, কখনো-কখনো অভ্যাসকেও মান্য করতে হয়, কোনো একজনের অভ্যাস নয়, অধিকাংশ লেখকের অভ্যাস।

হ্রস্ব-ই/দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ/দীর্ঘ-ঊ সম্বন্ধেও মণীন্দ্রকুমার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, সংস্কৃত ঘটীকে ঘটি এবং নীচকে নিচ করবার জন্য। ঘটী বানানকে ঘটি রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেননি। মধ্যযুগের কাব্যেও ঘটি বানান পাওয়া যায়। অবশ্য তাতে লিপিকরদের হাত থাকাই সম্ভব। নিম্নস্থান অর্থে নীচ বানান সংস্কৃতেই আছে। মণীন্দ্রকুমারের দেওয়া উদাহরণ 'নীচৈঃ' আহৃত হয়েছে মেঘদূতম্ থেকে, 'নাতিনীচৈঃ' শ্রীমদ্ভগদগীতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছিলেন, অনুদার বা সংকীর্ণমনা অর্থে নীচ বানান সংস্কৃতে প্রাপ্তব্য, কিন্তু নিম্নস্থান অর্থে নয়। তাই নিম্নস্থান অর্থে তিনি নিচ, নিচু এই বানান সাব্যস্ত করেন। মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্যই এক্ষেত্রে সংগত। কিন্তু যেহেতু নিচ বানানের সপক্ষতা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং যেহেতু তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী বহু সাহিত্যিক তাঁকেই অনুসরণ করেছেন, তাই নিম্নস্থান অর্থে নিচ বানানই চালু হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তৎসম 'দায়ী'কে দায়ি লিখেছেন বলে একসময় দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু মণীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন যে দায়ক অর্থে দায়ী (জীবনদায়ী, প্রাণদায়ী) তৎসম হলেও responsible অর্থে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ দায়ি লিখে ভুল করেননি।

বানান সমিতি হ্রস্ব স্বরচিহ্নের বেলায় বিধান দিতে গিয়ে নিশ্চয় খুবই দ্বিধান্বিত ছিলেন। নইলে কুমির/কুমীর, পাখি/পাখী, বাড়ি/বাড়ী, উনিশ/ঊনিশ, চুন/চূন এসব শব্দে বিকল্পের বন্দোবস্ত করতেন না। অথচ নীলা, হীরা প্রভৃতি শব্দে সমিতি দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘ-ঈকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। মণীন্দ্রকুমার এই দ্বিধাকে অর্থহীন দুর্বলতা বলেছেন। উনিশ যদি হতে পারে, পুব যদি স্বীকৃত হয়, তবে হিরা ও নিলা কেন নয়? বানানসমিতি এর পরেই একটি উপনিয়মের কথা বলেছেন, 'স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে'। সমিতির দেওয়া উদাহরণ—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। এসব শব্দে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট হ্রস্ব-ইকারের পক্ষে। তিনি বাঘিনি, তাঁতিনি, সাপিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও যে সর্বত্র এই নীতি মেনে চলতে পেরেছেন তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তি আর অভ্যাসের কলহ লক্ষ করি। তবু তাঁর পক্ষপাত কোনদিকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এবং এও সত্যি যে, এখনকার ঝোঁকও রবীন্দ্রনাথের বানানের দিকেই। এর প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানের নিয়মেও আছে। তবে একটা ব্যাপারে মণীন্দ্রকুমারেরই জিত হয়েছে। পূজারিনী, পূজারিনি প্রভৃতি নানা রকমের বানান রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুদ্রিত রূপে পাওয়া যায়। শব্দটা যেহেতু তৎসম নয়, মণীন্দ্রকুমার সাধারণভাবে ইংরেজি, রেশমি, বাঘিনি প্রভৃতি বানানের পক্ষে হলেও, তাঁর বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। যদি অতৎসম শব্দ বলে হ্রস্বস্বরচিহ্নই দিতে হয়, তাহলে পুজারিনি-ই লিখতে হবে। দীর্ঘ-ঈ, দীর্ঘ-ঊ কোনোটিই লেখা চলবে না।

বাংলা বানানসমস্যার আর একটা সমস্যা হল ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ এবং তার সঙ্গে সমাস-প্রত্যয়-বিভক্তির প্রশ্নটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতি সাধারণভাবে হ্রস্বই-হ্রস্বউ নিয়ে বিধান দিলেও ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেননি। অথচ এখানে সমস্যা বেশ গভীর। বাংলায় পৃথক শব্দ হিসাবে মন্ত্রী, রথী, পক্ষী, স্বামী, আততায়ী, প্রাণী, একাকী, ধনী, কৃতী, শশী, জ্ঞানী, মেধাবী প্রভৃতি যাবতীয় ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ এই দীর্ঘ-ঈকারান্ত বানানেই প্রচলিত। এর কারণ কী? ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপটিই বাংলায় চলে এবং সেটি দীর্ঘ-ঈকারান্ত। তবে সমাসে ও প্রত্যয়ে প্রথমার একবচন নয় ধরা হয় শব্দের প্রাতিপদিক রূপ। মন্ত্রিন্‌, গুণিন্‌, ধনিন্‌ এই শব্দগুলির প্রাতিপদিক রূপ যথাক্রমে মন্ত্রি, গুণি, ধনি। তারই সঙ্গে প্রত্যয় ও সমাস করা বাংলায় অনেকদিন যাবৎ প্রচলিত। মন্ত্রি+পুত্র, শশি+ভূষণ, প্রাণি+জগৎ এইভাবে পাচ্ছি মন্ত্রিপুত্র, শশিভূষণ, প্রাণিজগৎ। এইভাবে কৃতী কিন্তু কৃতিত্ব, প্রতিযোগী কিন্তু প্রতিযোগিতা। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই প্রশ্ন উঠেছে যে, প্রাণীজগৎ, প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রীপুত্র, মন্ত্রীসভা, স্বামীসেবা এসব বানানকে ভুল বলা সংগত হবে কি? কৃতিত্ব, প্রতেযোগিতা, একাকিতা, এসব ক্ষেত্রে আপত্তি তেমন ওঠে না। অর্থাৎ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে হ্রস্ব-ই প্রায় সকলেই মেনে নিলেও সমাসে এবং বিভক্তিতে দীর্ঘ-ঈ ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে বলেই এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

মণীন্দ্রকুমার তাঁর 'বাংলা বানান' নিবন্ধে এই নিয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত করেননি, স্পষ্ট করে তাঁর মতও বলেননি। তিনি কেবল এটুকুই বলেছেন যে, 'ভারতকোষ' গ্রন্থে ইন্‌-ভাগান্ত শব্দে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈর গ্রন্থিমোচন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু তা হয়নি। সেখানে কেবল এই কথা বলা হয়েছে যে, "সমাসের পূর্বপদস্থিত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ পরিচিত ক্ষেত্রে ই-কারান্ত না হইয়া ঈ-কারান্ত হইয়াছে, যথা— 'যোগীগণ', 'মন্ত্রীসভা', 'অনুগামীগণ', ইত্যাদি।" মণীন্দ্রকুমার যথার্থই এখানে প্রশ্ন তুলেছেন ওই 'পরিচিত ক্ষেত্রে' সম্বন্ধে। কথাটি অর্থহীন। যোগীগণ যদি চলে, তবে যোগীশ্রেষ্ঠ চলবে কি? যোগীরাজ যোগীবর চলবে? শশীপদ, শশীমুখী, শশীকলা, শশীতারকা এই শব্দগুলির মধ্যে কোনটি চলবে, কোনটি চলবে না? কোনটি পরিচিত, কোনটি পরিচিত নয়? তাঁর 'বাংলা বানান' নিবন্ধে এ বিষয়ে এর বেশি কিছু পাই না আমরা। কিন্তু ১৯৮১ সালের উনিশে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বানান সংস্কারের চিন্তা অবান্তর নয়' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে তিনি ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের বানান নিয়ে কিছু স্পষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে তাঁদের কাছেও শিক্ষণীয় যাঁরা প্রতিটি ব্যাপারে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণের কথা ভাবেন বলেন ও তার জন্য গর্বিত বোধ করেন।

এখানে মণীন্দ্রকুমার বলেছেন যে বহু ক্ষেত্রেই বাংলায় যখন তৎসম শব্দ গৃহীত হয়েছে তখন শব্দরূপের প্রথমার একবচন গৃহীত হয়নি। মুনিঃ, পতিঃ শ্রীঃ, আপৎ, বিপৎ, নিরাপৎ প্রভৃতি বানান বাংলায় গৃহীত হয়নি। অথচ এগুলো প্রথমার একবচনেরই রূপ। ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের বেলায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথমার একবচনের রূপই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। মণীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের কেবল পুংলিঙ্গে প্রথমবার একবচন দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত। সমগ্র সুপ্‌ (২১টি) বিভক্তির একটি শব্দেই দীর্ঘ ঈ-কার আছে, আর সব শব্দে হ্রস্ব-ইকার। ক্লীবলিঙ্গ ইন্‌-ভাগান্ত শব্দে একটাও দীর্ঘ ঈ-কার নেই। স্ত্রীলিঙ্গে ইন্‌ স্থলে ইনী,

অর্থাৎ এখানেও মূল শব্দের হ্রস্ব-ই রক্ষিত। আসলে দীর্ঘকাল ধরে ইন্-ভাগান্ত শব্দের অন্তে দীর্ঘ ঈ-কার চলছে, 'এ ছাড়া দীর্ঘ ঈ-র সমর্থনে আর কিছু বলার আছে বলে মনে করি না'।

তিনি আরও বলেছেন যে আমরা যদি 'স্থায়ী কীর্তি', 'স্থায়ী আসন' বলি তাহলে সংস্কৃত মতে ভুলই হবে। কেননা স্থায়ী পুংলিঙ্গ, কীর্তি স্ত্রীলিঙ্গ, আসন ক্লীবলিঙ্গ। গুণী ব্যক্তি বলাও সংস্কৃত ব্যাকরণে শুদ্ধ নয়। কেননা গুণী পুংলিঙ্গ, ব্যক্তি স্ত্রীলিঙ্গ। গুণী ব্যক্তিগণ সংস্কৃত মতে হয় না, কেননা গুণী একবচন, ব্যক্তিগণ বহুবচন। তাঁর মতে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করছি মনে করলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভুল করে বসি। বরং সমস্ত ইন্-ভাগান্ত শব্দকেই হ্রস্ব ই-কারান্ত করে নিলে সমাস-প্রত্যয় প্রভৃতিতে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা থাকবে না, সংস্কৃত ব্যাকরণ তাতে লঙ্ঘিত হবে না।

জ/য এবং ণ/ন নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেননি বটে, তবে এসব ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতি তাঁদের যষ্ঠ নিয়মে বলছেন যে, কাজ, জাউ,জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল এই শব্দগুলিতে য না লিখে জ লেখাই বিধেয়। এই শব্দগুলোর জ-যুক্ত বানান তখনই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সমস্যা এগুলোকে নিয়ে নয়। যাওয়া না জাওয়া? (পাঠক অবাক হবেন না। মনে রাখতে হবে সুনীতিকুমার জাওয়া বানানই চেয়েছিলেন) সুজ্জি না সুয্যি? ভট্চাজ না ভটচায? অর্থাৎ প্রাকৃতজ বা তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দেও কি য থাকবে, যদি মূলে য থেকে থাকে? না কি উচ্চারণকে মান্য করে অর্থাৎ বাংলায় সমস্ত 'য' জ উচ্চারিত হয় বলে জ রাখা হবে? মণীন্দ্রকুমার মনে করতেন যে, যে-সমস্ত তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দের সংস্কৃত মূলে 'য' আছে এবং যদি যেসব ক্ষেত্রে 'জ' এখনও দৃঢ়ীভূত না হয়ে থাকে তবে 'য'-ই চলা উচিত। কাজ বাংলায় চলে গেছে, তাই একে তিনি আর ঘাঁটাতে চান না। তবে তাঁর মতে যাঁতা, যো, যোড়া যদি অস্পৃশ্য হয় তবে যতন, যাতনা, যাচাই, যাচানো চলছে কী করে? এখানে বলবার কথা একটা আছে। মণীন্দ্রকুমার নিজেই বলেছেন যেসব সংস্কৃতমূল শব্দে য আছে এবং যেসব ক্ষেত্রে জ এখনও দৃঢ়ীভূত হয়নি সেসব ক্ষেত্রে য রাখাই ভালো। তাহলে প্রশ্নটা ওই দৃঢ়ীভূত হওয়া বা না-হওয়া নিয়ে। সেই কারণেই সুনীতিকুমার যাওয়া-কে বদলে জাওয়া লিখতে পারেননি। জাওয়া দৃঢ়ীভূত হয়নি। আবার সেই কারণেই জো, জোড়া, জুঁই, জাঁতা-তে জ এসে গেছে। এসব ক্ষেত্রে জ দৃঢ়ীভূত হয়ে গেছে। মণীন্দ্রকুমারের নিবন্ধটি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। ততদিনে এসব শব্দে জ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু কি তাই? জোগাড়, জোগান এই দুটো শব্দের বানানও বদলে গেছে ততদিনে।

বিদেশি ও তদ্ভব শব্দে মূর্ধন্য-ণ থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে তিনি সরাসরি আধুনিকদের পক্ষে নন। লণ্ঠন, ডাণ্ডা প্রভৃতি শব্দে দন্ত্য-ন তিনি খুব-একটা পছন্দ করেননি। কেননা তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—'ণ্ঠ' এবং 'ন্ঠ' -তে উচ্চারণের পার্থক্য আছে কি? বিদেশি শব্দের বেলায় দন্ত্য-ন যদি-বা মেনে নিতে পারেন, তাঁর কিন্তু আসল আপত্তি ছিল বরন, বরিষন, মানিক, পুন্যি, দক্ষিনা এইসব বানানে। 'আমরা মনে করি অন্ততঃ এই শ্রেণির শব্দগুলিতে মূর্ধন্য-ণ থাকলে শব্দের পরিচয় বিঘ্নিত হত না।' অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো কাণ, সোণা, বাণান লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। 'ঋ র ষ' -এর

প্রভাব না থাকলে সংস্কৃত ভাষাতেও কোনো শব্দে মূর্ধন্য -ণ এর স্থান হয় না বলে জানিয়েছেন তিনি।

বানানসংস্কার সমিতি ও-কার এবং ঊর্ধ্বকমাকে একই সূত্রে বেঁধেছেন এবং এই দুইয়ের ক্ষেত্রকে সীমিত করেছেন। সমিতি বলেছেন যে, সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য 'অতিরিক্ত ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জনীয়'। তারপরই বলা হয়েছে যে, কয়েকটি শব্দে বিকল্পে ও-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন কাল কিংবা কালো, ভাল কিংবা ভালো, মত কিংবা মতো। মণীন্দ্রকুমার নিয়মটি সমর্থন করেছেন, কিন্তু উদাহরণগুলি করেননি। অর্থাৎ বিকল্পবিধান গ্রহণীয় মনে করেননি। সত্যিই তো , ভাল/ভালো, মত/মতো, কাল/কালো কি যথেষ্ট সুপ্রচলিত শব্দ নয়? তাহলে এসব ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হল কেন? মণীন্দ্রকুমার 'ভাল' ও 'কাল' বানানের পক্ষে, যদিও সদৃশ অর্থে তিনি 'মতো' বানানকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, কারণ ওই শব্দে ও-কার না থাকলে কখনো-কখনো 'অভিমত' অর্থের সঙ্গে বিভ্রান্তি ঘটে।

ও-কার প্রসঙ্গে মণীন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথের মত ও প্রবণতা বিবেচনা করেছেন, আজি, আজো, তখনো, তোমারি প্রভৃতি ও-কারান্ত বানান কেন অযৌক্তিক তাও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এইসব বানানের কোনো-কোনোটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় পাওয়া যায় বটে, তবে রবীন্দ্রনাথ এসব বানান গদ্যেও ব্যবহার করেছেন। দেবপ্রসাদ ঘোষের চিঠির জবাবে এবং প্রবাসী পত্রিকায় নিবন্ধে এর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দেখিয়েছেন মণীন্দ্রকুমারের তা ঘাতসহ মনে হয়নি। কারণ যুক্তি যাই থাক, লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কোনও/কোনো, কখনও/কখনো এই দুই শব্দের দুটি বানান সমান প্রচলিত। কারো, এখনো, তখনো এই বানানগুলো কবিদেরই বেশি পছন্দ। মত/ মতো, ভাল/ভালো এই দুই শব্দেও দুটি বানানই সমান জনপ্রিয়, যদিও কালো যত চলে কাল তত নয়। তো এবং হয়তো বানান সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমারের আপত্তি নেই। যে-কথাটা বানানসমিতি স্পষ্ট করে বলেননি তা হল অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদে ও-কার এবং ক্রিয়াবিশেষ্যে ও-কারের কথা। ভাবানো, করানো, এগনো, দেখানো, পরানো, হাসানো, পৌঁছানো—এসব শব্দে ও-কারই সংগত এবং এখন প্রচলিত হয়ে গেছে। মণীন্দ্রকুমার, বোঝাই যায়, এই বানান সমর্থন করতেন না। তাঁর স্পষ্ট মত—'অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ ছাড়া আর কোথাও ও-কার অত্যাবশ্যক নয়'।

এর পরে বিসর্গের প্রসঙ্গ। বানানসংস্কার সমিতির সুপারিশের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে শব্দান্তে বিসর্গ বর্জনের কথা। এও বলা হয়েছে যে, শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হবে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে এই নিয়মটির কোনো উল্লেখ নেই। তা নিয়ে মণীন্দ্রকুমার পরিহাস করেছেন, কঠোর সমালোচনাও করেছেন। অর্থাৎ পরে সমিতি সম্ভবত পণ্ডিতদের চাপে অন্ত্যবিসর্গের বজায় রাখার ব্যাপারটাকেই মেনে নিযেছেন। কিন্তু তা আর হবার নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ অন্ত্যবিসর্গের বিরোধী ছিলেন, সম্ভবত সেই কারণেই আধুনিক লেখকরাও অন্ত্যবিসর্গ একরকম বর্জনই করেছেন। চক্ষু, মন, আয়ু, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, যশ, তেজ প্রভৃতি শব্দ বিসর্গবর্জিত হয়েই প্রচলিত হল। ব্যাপারটা মণীন্দ্রকুমারের মনঃপূত নয়। তাঁর মতে (১) এর ফলে সন্ধিতে গোলযোগ দেখা দিয়েছে এবং ভুল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর

মনে হয়েছে যে নভোচর, যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে একথা ভুলে যাবার জন্য যে, শব্দগুলির প্রথম অংশের শেষে একটা করে বিসর্গ ছিল। (২) তাঁর এও মনে হয়েছে যে, অন্ত্যবিসর্গকে 'বিসর্জন করলে অন্তের অ-ধ্বনিও উবে যাবে'। প্রথম কথা, যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র না হয় বিসর্গলোপের ফলে তৈরি হয়েছে বলে মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু জনেক, ভোগেচ্ছা, বারেক, তিলেক প্রভৃতি শব্দ কীভাবে তৈরি হল? এই-যে বাংলামতে শব্দ তৈরি হওয়া ,একে আমরা ব্যাকরণসম্মত না বলতেই পারি, কিন্তু অস্বীকার তো করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, অন্ত্য অ-ধ্বনি উবে যাবে বলে মণীন্দ্রকুমারের আক্ষেপেরও প্রকৃতপক্ষে তেমন কারণ ছিল না। বহু অ-কারান্ত তৎসম শব্দই তো বাংলায় শত শত বছর ধরে ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরেই যে এটা হচ্ছে তার প্রমাণ পাব পুরোনো কালের কবিতায় অন্ত্যমিল দেখলেই। ফল, জীবন, ধন, মান, পবন, জ্ঞান শরীর, প্রাণ, অতীত,মদন, চন্দন, সরব,সময়, পঠন, কথন, মরণ, চরণ, ধরন ,স্মরণ, শরণ, নিয়ম, গরল, ত্বরণ, শর, কাল, দল—এইরকম কত যে শব্দ বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয় তার হিসাব রাখাই কঠিন। এসবের বেলায় তো অন্তে বিসর্গ ছিল না। আসলে বাংলায় এটাই সাধারণ রীতি। ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়, আছেই তেমন অনেক ব্যতিক্রম। তবে নভোচর, যশেচ্ছা প্রভৃতি শব্দের ভুল এড়াতে যশঃ, নভঃ, মনঃ, লিখতে হবে এই বক্তব্য আর প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না নিশ্চয়।

অ্যা ধ্বনি ও তার জন্য নতুন একটি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মণীন্দ্রকুমার বারবার লিখেছেন। বিকৃত এই ধ্বনি বা অন্য ধ্বনি সংস্কৃতে নেই বলেই ওই ধ্বনির প্রকাশক কোনো বর্ণও নেই। বাংলায় অ্যা ধ্বনি আছে। তবু বাংলায় ওই ধ্বনির প্রকাশক কোনো বর্ণ নেই তার কারণ এই যে, বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে। আজ পর্যন্ত অ্যা ধ্বনি প্রকাশ করতে বাংলায় এ বা এ-কার, অ্যা বা অ্যা-কার, এ্যা-কার বা এ্যা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মণীন্দ্রকুমার অ্যা এবং এ্যা দুটিকেই বিদঘুটে অক্ষর বলেছেন। যাঁরা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন-ফলা যোগকে স্বীকার করতে পারেননি, তাঁরা এ এবং এ-কারই লিখে চলেছেন। ফলে acid কে কেউ লেখেন এসিড, কেউ অ্যাসিড, কেউ-বা এ্যাসিড। রাজশেখর বসু এই ধ্বনিটির জন্য একটি নতুন স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তার যোজ্য চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিলেন, যদিও তা চলেনি। মণীন্দ্রকুমার বিষয়টিকে আদ্যোপান্ত বিচার করেছেন। বাংলা স্বরবর্ণমালায় তার স্থান কোথায় হবে, বাংলা অভিধানেই বা তার ক্রমটি কী তাও ভেবে দেখতে হবে। এই নতুন স্বরবর্ণের স্থান সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যায়। চলন্তিকায় ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধানে অ্যা আছে অ-এর পরে। দ্বিতীয় মত হল তাকে ঐ-এর পরে স্থাপন করা। একথা অন্যত্র রাজশেখর বসুই বলেছেন। তৃতীয় মতটি হল সমস্ত স্বরবর্ণের শেষে তাকে চালান করে দেওয়া। মণীন্দ্রকুমার বলেছেন যে অ্যা-এর যোজ্য যে রূপ যে য-ফলা আ-কার নয় তা বহু শিক্ষিত বাঙালিই জানেন না। তাঁর 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে এই পর্যন্ত বিবেচনা পাই আমরা। তবে 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় তিনিও একটি নতুন বর্ণ এবং তার যোজ্য রূপ প্রস্তাব করেছেন। বর্ণটি অনেকটা পেটকাটা এ-র মতো। এসব প্রস্তাবের কোনটি গৃহীত হবে বা হবে না, তা বলা যায় না, তবে এসব প্রস্তাবের মধ্যে যেমন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বা রাজশখর বসুর উদ্বেগ দেখা গেছে, তেমনি এ-বিষয়ে মণীন্দ্রকুমারেরও চিন্তার প্রমাণ পাই

আমরা। তবে অনেক সময় অযৌক্তিক ব্যাপারও ব্যাপক প্রচলনের সুবাদে দাঁড়িয়ে গেলে তাকে আর বিদায় দেওয়া সহজ হয় না। তেমনি অ্যা ধ্বনির প্রকাশক বর্ণ হিসাবে অ্যা এবং তার যোজ্যরূপ-্যা এখন একরকম দাঁড়িয়ে গেছে। এবং যেহেতু ধ্বনিটিকে বিকৃত অ ধ্বনি বলা হচ্ছে কাজে কাজেই বর্ণমালায় অ-র পরেই তার স্থান একরকম প্রচলিত হয়ে গেছে। সর্বজনস্বীকৃত কোনো নতুন বর্ণ যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এটাই চলবে মনে হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির সুপারিশে আরও কিছু ছোটোখাটো ব্যাপার ছিল, যেমন ঞ-র কথা, বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-য়ের কথা, ঙ্গ-ং-ঙ-র কথা। সেগুলো সম্পর্কেও মণীন্দ্রকুমার তাঁর বিবেচনা আমাদের জানিয়েছেন। এদের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে আপাতত আমরা সেগুলোর বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না।

চার

মণীন্দ্রকুমার কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির প্রস্তাব নিয়েই আলোচনা করেছেন এইরকম অসম্ভব সিদ্ধান্ত করা যাবে না। বাংলা বানান নিয়ে, বাংলা বানানের সাধারণ সমস্যা নিয়েও নানা প্রসঙ্গে নানা জায়গায় তাঁর গভীর বিশ্লেষণ পাই। কখনো-কখনো বানান সমিতির কোনো সূত্র নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি তত্ত্বগত আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। তৎসম শব্দ সম্বন্ধে, প্রাকৃত শব্দ সম্বন্ধে, চলিত ও কথ্য শব্দ সম্বন্ধে তিনি এমনকী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আলোচনায় বসেছেন। প্রাকৃত শব্দ বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝেছেন তার বিচার করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও যে সর্বত্র নিশ্ছিদ্র নয় তাও দেখিয়েছেন। উচ্চারণানুগ বানান নিয়ে তাঁকে দেখি তত্ত্বগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে। তাঁর অভিমত, বাংলায় উচ্চারণানুগ বানান বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না; এমনকী সংস্কৃত শব্দেও নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতের প্রবল বিরোধিতা করতে দেখি তাঁকে। অন্য দিকে , কি ও কী অর্থভেদে এই দুই বানানকে পৃথক রাখার ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই সমর্থন করেন।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষের বানান ভাবনার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনার কথাও বলতে হবে। তাঁর 'বাংলা বানান' গ্রন্থের শেষ নিবন্ধ 'প্রতিবর্ণীকরণ'। এই দীর্ঘ রচনায় বাঙালি হিন্দু নামের ইংরেজি বা রোমান প্রতিবর্ণীকরণের যে-নিয়ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করে দিয়েছিল তার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে আর কারও কাছে পাইনি। তবু বলব এই আলোচনাটি কিছুটা খণ্ডিত। কেননা, এখানে আমরা পাই না বিদেশি নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের কোনো আলোচনা।

মণীন্দ্রকুমার বাংলা বানানের আলোচনায় সর্বদাই যুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত। তবে সে-যুক্তি কখনো-কখনো প্রাচীনতাকে আশ্রয় করেছে। তিনি 'বেশি', 'ইংরেজি', 'হিন্দী' এইসব বানানের পক্ষপাতী। এমনকী 'কোনো' অর্থেও লেখেন 'কোন'। অথচ 'একটি-দুটি' লেখেন এবং সুনীতিকুমারের 'একটী-দুটী' বানান নিয়ে রসিকতা করেন। ও-কারের বাহুল্য নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করতে দেখি, অথচ 'তো' এবং 'হয়তো' বানানকে সংগত মনে করেন। তৎসম শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জন করা অনুচিত বলে গণ্য করেন। অথচ নিজেই কি লিখতে পেরেছেন 'মনঃ' কিংবা 'চক্ষুঃ'? অবশ্য 'ক্রমশঃ', 'বিশেষতঃ' তিনি লিখেছেন।

মণীন্দ্রকুমারের বিবেচনার মধ্যে যেমন প্রজ্ঞা আছে, কঠোর যুক্তিনিষ্ঠা আছে তেমনি আছে স্ববিরোধ এবং কখনো-কখনো ব্যক্তিগত রুচির প্রতি আনুগত্য। তাঁর অনেক বিবেচনাই, আগেই বলেছি, গৃহীত হয়নি এখনও পর্যন্ত। তবু, এসব সত্ত্বেও বাংলা বানানের একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা যেহেতু তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়, তাই এই বিষয়ে তাঁর মতামত পুরোপুরি গ্রহণীয় কি না সেটাই একমাত্র বিচার্য নয়। তাঁর মতামত উপেক্ষণীয় নয় এটাও উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং উল্লেখমাত্রে পর্যবসিত। তবু তাঁর কাছে বানান-আলোচক মাত্রেই কৃতজ্ঞ থাকবেন, যেহেতু অনেক প্রশ্নে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টি বা বোধ যা আমাদের বৃহত্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে সাহায্য করে, তাঁর আলোচনা কেন আরও বিশদ নয় এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে যায় তখন।

বৈয়াকরণ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে মণীন্দ্রকুমার ঘোষের মৃত্যুতে এক স্থিতপ্রজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান বাঙালির জীবনাবসান হয়েছে। যাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেন তাঁদের বিবেচনায় এ এক ইন্দ্রপতন। বহু জ্ঞানপিপাসু মানুষ অতঃপর তাঁর প্রদীপ্ত মনীষার উষ্ণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবেন। তবু এই অভাববোধ আংশিকভাবে সহনীয় মনে হয় এই কথা ভেবে যে, তাঁর অবহুল রচনাবলিতে রয়েছে ভাষামনস্ক বাঙালির নানা প্রশ্নের উত্তরসন্ধান। উপরন্তু বাংলা ব্যাকরণ যেসব উৎসাহী বাঙালির চর্চার বিষয় তাঁদের পক্ষে তাঁর রচনাবলি অতীব চিন্তাসহায়ক। সন্দেহ নেই, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পর মণীন্দ্রকুমারই শ্রেষ্ঠ বাঙালি বৈয়াকরণ।

বৈয়াকরণ হিসাবে মণীন্দ্রকুমারের সম্পূর্ণ পরিচয় কেবল 'বাংলা বানান' নামের বইটির মধ্যেই পাওয়া যাবে এমন ভাবা চলে না। তাঁর রচিত 'সাময়িকী' (প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪) বইটির শেষ চারটি নিবন্ধ এবং সরল বাংলা ব্যাকরণ, মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, ব্যাকরণকলি, রচনাকাকলি, ব্যাকরণের অ আ ক খ প্রভৃতি পাঠ্যগ্রন্থের কথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না। যে-দেশে ছাত্রপাঠ্য বইয়ের গ্রন্থনা সচরাচর অযোগ্য এবং ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন লেখকদেরই একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, সে-দেশে সুনীতিকুমার ও মণীন্দ্রকুমারের মতো প্রাজ্ঞ বৈয়াকরণগণের পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশ্বাসজনক এবং দূষণমুক্তির জন্যে অতীব প্রয়োজনীয়। তবু একথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মণীন্দ্রকুমারের ওই গুটিকতক নাতিস্ফীত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সমগ্র ব্যাকরণ প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে, তিনি লিখেছেন যত, কথা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। বৈয়াকরণ মণীন্দ্রকুমারের পূর্ণ পরিচয় বিধৃত থাকা সম্ভব তাঁর লিখিত গ্রন্থ, নিবন্ধাবলি, মৌখিক কথোপকথন এবং বহুজনকে লিখিত পত্রাবলির মধ্যে।

ক. প্রথাগত ব্যাকরণ ও মণীন্দ্রকুমারের ব্যাকরণচিন্তা

১. প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণকে হুমায়ুন আজাদ যথার্থই বলেছেন প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণ অর্থাৎ traditional prescriptive grammar. প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ মূলত আনুশাসনিক। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল এই ব্যাকরণের অবয়ব ও রীতিনীতি। প্রথাগত ব্যাকরণ যে যথার্থ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নয় একথা রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই শতকের সূচনাতেই বুঝেছিলেন এবং তার ত্রুটি-নির্দেশও করেছিলেন। শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থদুটিতে যথার্থ বাংলা ব্যাকরণের একটি রূপরেখাও উপস্থিত করেছিলেন। তবু একথা খেদজনক হলেও

সত্য যে, আজ পর্যন্ত যথার্থ বাংলা ভাষার কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়নি। সুনীতিকুমার তাঁর ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাতত্ত্বসংগত নানান প্রকরণ ব্যবহার করলেও তাঁর রচিত ওই ব্যাকরণও সেই অর্থে প্রথাগত ব্যাকরণের বাইরে বেরিয়ে আসেনি। মণীন্দ্রকুমারও, সুনীতিকুমার ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো, প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিমান ও নীতিকে আশ্রয় করে তারই গণ্ডির মধ্যে তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তাই মণীন্দ্রকুমারের ব্যাকরণচিন্তায় প্রথাগত ব্যাকরণের ত্রুটি বা ব্যর্থতার সন্ধান নিরর্থক। বরং আমরা দেখব প্রথাগত ব্যাকরণের কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁর প্রয়োগে তিনি কোনো মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন কি না।

এখানে প্রথমেই আমরা সন্ধির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাই। সকলেই জানেন প্রথাগত ব্যাকরণে সন্ধি ব্যাকরণগ্রন্থের গোড়ার দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। সন্ধি প্রকরণের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে অবশ্য কারও কারও গভীর সন্দেহের কথা আমরা জানি। কিন্তু সে অন্য কথা। সন্ধির সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে একালের অধিকাংশ ব্যাকরণ-প্রণেতাই যে অবগত নন তা বোঝা যায় ছাত্রপাঠ্য এবং অনুমোদিত প্রায় যে-কোনো ব্যাকরণগ্রন্থের সন্ধিবিষয়ক অধ্যায়ে দৃষ্টিক্ষেপ করলে। সন্ধির সংজ্ঞার্থ হিসাবে সেখানে আমরা দেখতে পাই, 'বর্ণে বর্ণে মিলনের নাম সন্ধি' এই জাতীয় ভ্রান্ত বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে সন্ধি ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের অঙ্গ এবং ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনকেই সন্ধি বলা উচিত। এই ভুল সুনীতিকুমারের ব্যাকরণে নেই। নেই আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত মণীন্দ্রকুমারের সরল বাংলা ব্যাকরণ বইটিতে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সাম্প্রতিককালে রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে পবিত্র সরকারের ব্যাকরণগ্রন্থে লক্ষণীয়ভাবে এই ত্রুটি অনুপস্থিত। সন্ধি মূলত ধ্বনির মিলন হলেও তা প্রকাশিত হয় বর্ণের মাধ্যমে। এবং প্রক্রিয়াটিকে সেইজন্য রূপধ্বনিগত বলা যায় অর্থাৎ morphophonological. বর্ণের মিলনগত পরিবর্তনের মূলে যে ধ্বনির মিলন, সেকথা মণীন্দ্রকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি।

২. সাধারণ ব্যাকরণ গ্রন্থের সূচনা হয় বর্ণ ও ধ্বনির আলোচনা দিয়ে। অন্তত তাই হওয়া উচিত। এবং আজও ভাষাতাত্ত্বিকদের ক্রমাগত আলোচনার পরেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে দেখতে পাওয়া যাবে 'যে-বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীতই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় এবং অন্য বর্ণের উচ্চারণে সাহায্যও করে, সেই বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।' এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞার্থ পাওয়া বহু ব্যাকরণ গ্রন্থে। স্বরধ্বনির লিখিত রূপই যে স্বরবর্ণ এই প্রাথমিক এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বহু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগ্রন্থে অনুপস্থিত। অথচ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত মণীন্দ্রকুমারের সরল বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি যে-কোনো ব্যাকরণ-রচয়িতার মডেল হতে পারত। কিংবা আরও বহুবছর পরে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ব্যাকরণের অ আ ক খ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ দেখলেও প্রচলিত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগ্রন্থের সঙ্গে মণীন্দ্রকুমারের বইয়ের পার্থক্য ধরা পড়বে। 'যে-ধ্বনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে অন্য ধ্বনির সাহায্য লাগে না, তাহাকে স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনি প্রকাশক বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।'

৩. বাংলা নির্দেশক সম্বন্ধে প্রথম বিশদ আলোচনা পাওয়া গিয়েছিল প্রত্যাশিতভাবেই, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। 'প্রবাসী'তে ১৩১৮ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'বাংলা নির্দেশক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। পরে 'বাংলা নির্দেশক' নামে প্রবন্ধটি তাঁর 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়। ইতিমধ্যে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ওই নিবন্ধের উপর একটি আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল, যেটির লেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মূলত আলোচনা করেছেন খানি, খানা, গাছা, গাছি ও টুকু নিয়ে। তার এক মাস আগে 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায় 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' নামের একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ টি ও টা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁকে অনুসরণ করে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্দেশক হিসাবে টি টা খানা খানি প্রভৃতির প্রয়োগের ক্ষেত্র দেখিয়েছেন, ইংরেজি the-র সঙ্গে বাংলা টি ও টা-র প্রয়োগগত তফাত দেখিয়েছেন। এমনকী, টি ও টা যে 'গোটা' শব্দেরই অপভ্রংশ সেকথাও জানিয়েছেন।

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯৬৫ সালে 'নির্দেশক সঙ্কেত" নামে মণীন্দ্রকুমারের একটি নিবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষকসমিতির বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৮৫ সালে নিবন্ধটি মণীন্দ্রকুমারের 'বাংলা বানান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলতে বাধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও মণীন্দ্রকুমারের এই নিবন্ধটি গভীরতায় ও মনীষায় উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। এ নিবন্ধে তিনি এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এবং এমন কিছু যুক্তি উপস্থিত করেছেন যা শুধু তাঁকে একালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করেনি, উপরন্তু সুনীতিকুমারের মতো ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণও এইসব যুক্তিকে সর্বৈব গ্রহণীয় মনে করেছেন।

এই নিবন্ধটিতে মণীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন কেন এগুলিকে নির্দেশক সঙ্কেত বলাই সংগত, কেন এগুলিকে প্রত্যয় বলা যাবে না। যুক্তিবাদী বৈয়াকরণের গভীর বিশ্লেষণক্ষমতার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গেল যখন তিনি বললেন যে, 'প্রত্যয় যেরূপ এক-একটা ভিন্ন গোষ্ঠীর শব্দ সৃষ্টি করে, এই চিহ্নটা তাহা করে না। টি, টা'কে প্রত্যয় বলিতে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি।'

এইসব নির্দেশক সঙ্কেতকে প্রত্যয় বলা কেন সংগত নয় সেটা যদিও ওই নিবন্ধে মণীন্দ্রকুমারের মূল প্রতিপাদ্য, তবু টা, টি সম্বন্ধে কিছু অন্যতর মন্তব্যও তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন যে, টা এবং টি-র মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অর্থের তেমন গুরুতর কোনো পার্থক্য নেই। এখানে ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার মৃদু আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেন যে, প্রয়োগে কোথাও কোথাও পার্থক্য হয়। সে-পার্থক্যকে ব্যাকরণগত পার্থক্য বলা যাবে কি না সে অন্য প্রশ্ন। আবার আর এক ভাষাবিজ্ঞানী প্রবাল দাশগুপ্ত টা-কে নির্দেশকও বলতে অনিচ্ছুক। শুধু তাই নয়, তিনি টা আর খানার ব্যাকরণগত ও প্রয়োগগত মিলও দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমরা 'আটখানা চিঠি' বলতে পারি, কিন্তু 'চিঠি আটখানা' বলাটা স্বাভাবিক নয়। টা-সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচনার সূত্রে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মণীন্দ্রকুমারের ওই আলোচনার পরেও এই বিষয়ে আরও আলোচনার সুযোগ আছে। কিন্তু পবিত্র সরকার যথার্থই বলেছেন যে, যে-বক্তব্য মণীন্দ্রকুমারের মূল প্রতিপাদ্য তা কিন্তু অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ এগুলিকে প্রত্যয় বলা সংগত নয়।

৪. বাংলা ভাষার বাচ্য সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার যে-মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, কেবল তারই জন্য তিনি একালের অন্যতম প্রধান বৈয়াকরণরূপে পরিচিত হবার যোগ্য। বাংলা ব্যাকরণে দীর্ঘকাল যাবৎ বাচ্যের প্রসঙ্গটির আলোচনা ভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত। অথচ মণীন্দ্রকুমারের আগে সেই ভ্রান্তির নিরসন করতে কদাচিৎ কোনো বৈয়াকরণকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। এমনকী সুনীতিকুমারও বাচ্য-আলোচনায় গতানুগতিক পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। মণীন্দ্রকুমার বাংলা বাচ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাকে মৌলিক বলছি কেন? বলছি, কারণ তিনি আমাদের দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে অস্বীকার করে বলেছেন যে, বাংলাভাষার বাক্য বিশ্লেষণ করলে কেবল দুটি বাচ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেই দুটির একটি কর্তৃবাচ্য এবং অন্যটি ভাববাচ্য। যাকে আমরা এতদিন কর্মবাচ্য বা passive voice বলে এসেছি বাংলায় তার কোনো অস্তিত্বই নেই। অন্যভাবে বলা যায়, যে-বাক্যকে এতদিন কর্মবাচ্য বলা হয়েছে আসলে সেই বাক্য আদৌ কর্মবাচ্য নয়। ঠিক একইভাবে বলা যায়, বাংলায় কর্মকর্তৃবাচ্য বা neuter voice বা impersonal voice বলেও কিছু নেই।

সাধারণত যেসব বাক্যবিন্যাসকে কর্মবাচ্য বলে এতকাল ব্যাকরণ-রচয়িতারা শিখিয়ে এসেছেন তেমনই কিছু বাক্য তুলে এনে মণীন্দ্রকুমার তাঁর বক্তব্য প্রতিপন্ন করেছেন।

'কনে দেখা হইয়াছে'

এই বাক্যটিকে ব্যাকরণগ্রন্থে কর্মবাচ্যের বাক্য বলেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 'কনে' প্রথমা বিভক্তির পদ অর্থাৎ কর্তাপদ বলে ধরে নেওয়া হয়। মণীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন যে, এখানে কনে পদটি আদৌ প্রথমা বিভক্তির পদ নয়, দ্বিতীয়া বিভক্তিরই পদ। উপরন্তু এটি 'হইয়াছে' ক্রিয়ার সঙ্গেও অন্বিত নয়। কনে পদটি ক্রিয়াপদকে নিয়ন্ত্রণও করছে না। অর্থাৎ কর্মপদ এখানে প্রধান্য পায়নি। অর্থের দিক থেকে যদিবা প্রাধান্য পেয়ে থাকে, 'বাক্যগঠনে প্রাধান্য লাভ করে নাই।' এর পরই মণীন্দ্রকুমার এক সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন: 'সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা গ্রহণ করিব, অথচ সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করিব না, এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় সংজ্ঞার কোন মূল্য থাকে না।' তাঁর মতে উপরের বাক্যটির বাচ্য ভাববাচ্য।

কর্মকর্তৃবাচ্য সম্বন্ধে আলোচনায়ও গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন মণীন্দ্রকুমার। সংস্কৃতে কর্ম নিজগুণেই স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে কর্তার অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাকেই কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হয়। এই প্রসঙ্গে কর্মকর্তার মূল লক্ষণ 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি' সূত্রটি তুলেছেন তিনি। এবং একথাও বলেছেন যে, বাংলা ব্যাকরণকারগণ ওই 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি 'কথাটি মনে রেখেই কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বিচারে :

'কাপড় ছিঁড়িয়াছে'

'শাঁখ বাজে'

'আম পাকে'

প্রভৃতি বাক্য কর্মকর্তৃবাচ্যেই উদাহরণ। মণীন্দ্রকুমার বলেন যে, 'স্বয়মেব প্রসিধ্যতি'-ই কর্মকর্তৃবাচ্যের একমাত্র লক্ষণ নয়। কর্মকর্তৃবাচ্যে যেহেতু কর্মই প্রধান, যেহেতু কর্মই কর্তা হয়ে বসে, তাই ক্রিয়াটিকেও সকর্মক হতে হবে। ঠিক এখানেই গোলমালের সূত্রপাত। ব্যাকরণকারগণ যেসব বাক্যের উদাহরণ দিয়ে কর্মকর্তৃবাচ্য দেখান সেইসব বাক্যের ক্রিয়া

অকর্মক। মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্য, অকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকা সম্ভব নয়। আর কর্ম না থাকলে কর্মকর্তা কে হবে? তিনি বলেন উপরের উদাহরণের সব বাক্যই কর্তৃবাচ্যের বাক্য।

একথা সর্বৈব স্বীকার্য যে, বাংলা বাচ্যের আলোচনায় মণীন্দ্রকুমার ঘোষ শুধু দীর্ঘস্থায়ী ভ্রান্তিই দূর করেননি, উপরন্তু ব্যাকরণের এই অধ্যায়ে নতুন মাত্রাও যোগ করেছেন। তবু তিনি মূলত ব্যাকরণগ্রন্থাদির ভ্রান্তি দূর করতেই বেশি সচেষ্ট ও মনোযোগী ছিলেন বলে বাংলা ভাববাচ্য ও কর্তৃবাচ্যের নানা বৈচিত্র্য আর নানা সংগঠন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। একটি চমৎকার নিবন্ধে পবিত্র সরকার তা ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এইরকম কয়েকটি বাক্য তুলেছেন

'এই জল খাওয়া যায়/চলে'

'চোরটাকে এখন ধরা যায়/চলে'

এইসব বিশেষ্যীকৃত (nominalized) বাক্যখণ্ডের সঙ্গে মণীন্দ্রকুমার প্রদর্শিত √হ্-ধাতুর বদলে √যা বা √চল্ ধাতু ব্যবহার করে যে অ-কর্তৃক বাক্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোও ভাববাচ্য, বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভিন্ন ধরনের ভাববাচ্য। এগুলোকে পবিত্র সরকার 'সম্ভাববাচ্য' বলতে চান। আবার আর এক ধরনের ভাববাচ্যের কথাও তিনি বলেছেন:

'তোমাকে এ কাজটা করতেই হবে'

'রবিনকে আজ কলকাতা ফিরতে হবে'

এই -'তে হবে/হল' ধরনের ভাববাচ্যকে 'অবশ্যম্ভাববাচ্য' বলেছেন। এই দুটি পারিভাষিক নাম পবিত্র সরকারই উদ্‌ভাবন করেছেন, অনুমান করি। এগুলি গৃহীত হতে পারে। পরিবর্তিত হতেও পারে। সে যাই হোক বাংলা বাচ্য সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমারের আলোচনার সঙ্গে পবিত্র সরকারের এই সংযোজন বাংলা বাচ্যের ধারণাটি নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট আকার দেবে।

খ. শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের প্রসঙ্গ

মণীন্দ্রকুমারের ব্যাকরণবোধকে নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা চলে না। তাঁর ব্যাকরণবোধ বস্তুত তাঁর ভাষামনীষারই অংশ। এবং সেইজন্যই শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ নিয়ে তাঁর আলোচনা আমাদের এই সমীক্ষার বহির্ভূত থাকতে পারে না। 'বাংলা বানান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্যের হট্টগোলে', একই গ্রন্থভুক্ত 'ব্যাকরণকূট', এবং 'সাময়িকী' গ্রন্থভুক্ত 'ভাষার অপপ্রয়োগ' এই তিনটি নিবন্ধে তিনি শব্দের বানানবিপর্যয় ও ভ্রান্ত প্রয়োগ নিয়ে এমনই গভীর আলোচনা করেছেন যাতে তাঁর ভাষাবোধ ও ব্যাকরণপ্রজ্ঞার অভ্রান্ত প্রমাণ চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

'ব্যাকরণকূট' নিবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদা এবং শ্রদ্ধাভাজনা, উদ্‌ এবং উৎ, পৃথিকীকৃত, চলচ্ছক্তি, সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার্থ, রুচিবান প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধ্যশুদ্ধি আলোচনা করেছেন তিনি। তিনি শ্রদ্ধাস্পদা এবং শ্রদ্ধাভাজনা এই দুটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে আর অশুদ্ধ বলে মনে করেন না একথা জানিয়েছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রয়োগ আছে। এবং সেই উদাহরণ অনুসরণ করে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে শ্রদ্ধাস্পদা ও শ্রদ্ধাভাজনা শব্দদুটিকে স্বীকার করেছেন। অতএব একথা বোঝা গেল যে, এই শব্দদুটি অসিদ্ধ নয়। বাংলায় এতাবৎ এদুটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তখন নতুন করে প্রচলিত হবে কি না বলা যায় না। কিন্তু সে ভিন্ন প্রশ্ন। মণীন্দ্রকুমারের মতে উদ্-ই প্রকৃতপক্ষে উপসর্গটির নাম। প্রয়োগে তার

পরিবর্তিত রূপ উৎ। তাঁর এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করার কারণ দেখি না। পৃথকীকৃত যতই প্রচলিত হোক না কেন এটি যে অসিদ্ধ তা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন তিনি। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি আরও কার্যকর ও অকাট্য। অতি-প্রচলিত চলচ্ছক্তি শব্দটি সম্বন্ধেও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ আছে ওই নিবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্যের হট্টগোলে 'এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে।' এখানেও তাঁর আলোচ্য কতকগুলো অতি-প্রচলিত শব্দ। সাফল্যের সঙ্গে, সাবধানতার সহিত ও সহানুভূতিসহকারে এই তিনটি প্রয়োগ এই নিবন্ধে তাঁর দ্বারা তিরস্কৃত। এগুলো যে বাস্তবিকপক্ষে অর্থহীন তা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া শানচ্ প্রত্যয়ান্ত যে-শব্দগুলি তাঁর ভর্ৎসনা লাভ করেছে সেগুলি হল মোহ্যমান, রুদ্যমান, ক্রন্দমান, মজ্জমান, প্রশংসমান, ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান, প্রবহমান, অপস্রিয়মান এবং অস্তমান।

বৈয়াকরণ ও ভাষাবিশেষজ্ঞ হিসাবে মণীন্দ্রকুমারের অসামান্যতা শুধু এইসব ভ্রমাত্মক শব্দের আলোচনাতেই নিহিত নয়। এইসব শব্দ কেন ভ্রমাত্মক তার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার জন্য তিনি নিশ্চয় স্মরণীয়। কিন্তু বৈয়াকরণ হিসাবে তাঁর অসামান্যতা বোধ করি সেখানেও নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য সমস্তরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। সচরাচর যে-কঠোর সূত্রানুবর্তিতা ও অনুশাসনপ্রিয়তা বৈয়াকরণগণের প্রধান লক্ষ্য বলে পরিজ্ঞাত, মণীন্দ্রকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তা যেন ঠিক মেলে না। ব্যাকরণের অনুশাসন অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু যে-কোনো সজীব ও চলমান ভাষায় প্রচলনের যুক্তিকে যে অস্বীকার করা যায় না একথা স্বীকার করার মতো উদারতা তিনি বারবার দেখিয়েছেন। 'ভাষার অপপ্রয়োগ' নামে তাঁর একটা উজ্জ্বল কিন্তু অধুনাবিস্মৃত নিবন্ধ থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলে তাঁর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে।

'পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাষার ব্যাকরণদোষ অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। বাংলা ভাষায় অসংখ্য ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ আছে, আজ তাহাদের বর্জন করার কথা চিন্তাই করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শব্দের উল্লেখ করি— 'সততা', বাংলা ভাষায় আর একটি শব্দ পাই না যার দ্বারা শব্দটির পূর্ণ অর্থ দ্যোতিত হয়।'

তবু একথাও স্মর্তব্য যে, কতকগুলো অতি-প্রচলিত ভ্রমকে তিনি গ্রহণ করতে চাননি। ওই নিবন্ধেই দেখি সক্ষম, সঠিক, সাবধানতা, নিরুদ্বিগ্ন প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধান্বিত। এমনকী বিশেষত, অন্তত, ক্রমশ প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য বিসর্গ বর্জনেও তাঁর আপত্তি ছিল। বাংলা ভাষায় নানা উৎস থেকে শব্দ আহৃত হয়েছে। তাই বানানকে একটি ছাঁচে ফেলা যাবে না। বহু শব্দ ক্রমাগত তৈরি হয়। কোনো-কোনোটির গঠনে সংস্কৃত রীতির আংশিক অনুসরণ দেখা যায়। তার ফলে সেইসব শব্দ পুরোপুরি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সিদ্ধ হয় না। এই ধরনের শব্দ সম্পর্কে মণীন্দ্রকুমার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন: 'যুগের প্রয়োজনে নূতন নূতন শব্দ-সৃষ্টি অনিবার্য।' তাঁর মতে শব্দ তৈরির সময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যাকরণের বিধান 'লক্ষ করিতে হইবেই।' নতুন শব্দ গঠনের সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারস্থ প্রায়ই হতে

হয়। কেননা সংস্কৃত ভাষায় শব্দ গঠনের নানান প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু প্রায়ই সংস্কৃত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় না। দেখা যায় যে, পরস্মৈপদী ধাতুতে শানচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হচ্ছে, ণিজন্ত ক্রিয়ার নিয়ম না মেনে শব্দ তৈরি হচ্ছে। আমাদের বিবেচনায় এই ধরনের 'ত্রুটিপূর্ণ' শব্দগঠন অস্বাভাবিক নয়। আর তারই ফলে ভ্রমমাণ, ভ্রাম্যমাণ, সকাতর, সক্ষম, সঠিক, আন্তর্জাতিক, অনস্বীকার্য প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। মণীন্দ্রকুমারেরই অন্যত্র-উদ্ধৃত বক্তব্য উল্লেখ করে বলা যায় যে, পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ভাষার ব্যাকরণদোষ অনেকসময় নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই যুক্তিতে আন্তর্জাতিক, সচল, সঠিক, সক্ষম, সমসাময়িক প্রভৃতি ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, এইসব শব্দ সম্পর্কে মণীন্দ্রকুমারের আপত্তি প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। ইতিমধ্যে এইসব শব্দের অনেকগুলিই ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে।

গ. বানান প্রসঙ্গে

বাংলা বানান সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার আলোচনা ও মতামত তাঁর ব্যাকরণ-ভাবনারই অংশ, বস্তুত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা বাংলা বানানসম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, ব্যাখ্যা ও নির্দেশাবলির ভিত্তিভূমিতে আছে ব্যাকরণসম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। মণীন্দ্রকুমারের বানানভাবনা বিধৃত আছে মূলত 'বাংলা বানান' নামের বইটিতে এবং তৎসহ 'র্য বনাম র্য্য', অ্যা-কার, বর্ণবিভ্রান্তি প্রভৃতি নিবন্ধে। ১৩৮৫ সালে তাঁর 'বাংলা বানান' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষামনস্ক বাঙালি পাঠকদের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার বাংলা বানান সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ও গভীর আলোচনা করেছেন ইতিপূর্বে। কিন্তু তাঁদের সেইসব আলোচনা অন্য আলোচনার সঙ্গে পাওয়া গেছে। শুধু বানানকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তাঁরা কোনো বই লেখেননি। একথা সত্য যে, ১৩৪৬ সালে দেবপ্রসাদ ঘোষের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দেবপ্রসাদের বক্তব্য যতটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল, ততটা যুক্তিসহ ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক প্রবণতাকেও ধরতে পারেননি। তা ছাড়া ওই বইটি দীর্ঘকাল বিস্মৃত। কাজে কাজেই মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান' সহজেই ভাষা-আলোচক ও বানান-সংস্কারকদের সশ্রদ্ধ অভিনিবেশ আকর্ষণ করল।

'বাংলা বানান' গ্রন্থধৃত ওই নামেরই সুদীর্ঘ নিবন্ধটির মধ্যে মণীন্দ্রকুমারের বানান-ভাবনার সারাৎসার পাওয়া যাবে। এই নিবন্ধটিতে মণীন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সমিতির প্রস্তাবিত বানান-সংস্কার (১৯৩৬) সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সমিতির প্রস্তাবগুলিই পরবর্তী দশকগুলিতে বানান সংস্কারের যাবতীয় প্রচেষ্টার ভিত্তি, সেইজন্য মণীন্দ্রকুমারের এই দীর্ঘ আলোচনার লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য দুইই সমিতির ওই প্রস্তাবগুলি। তিনি বলেছেন যে, সমিতিতে 'বিবুধমণ্ডলীর' সমাবেশ সত্ত্বেও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সমিতির প্রস্তাবে কাঙ্ক্ষিত দৃঢ়তা ও ঋজুতারও অভাব লক্ষ করেছেন তিনি। বিশেষত বহুক্ষেত্রে বানান-সমিতির বিকল্প বিধান সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। মণীন্দ্রকুমার অধিকাংশ বিকল্পেরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য স্মরণীয়: 'বিকল্পই যদি রক্ষিত হবে তবে নিয়ম-রচনার প্রয়োজন কী ছিল?'

মণীন্দ্রকুমার বানান-সমিতির বাইশটি প্রস্তাব নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, কার্যত সেখানে নিয়ম আছে কুড়িটি। দুটি নিয়ম বস্তুত আগে বর্ণিত অন্য দুটির অনুবৃত্তি। সমিতির প্রথম নিয়মের বিষয় হল তৎসম শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন। এই নিয়মটি সাধারণভাবে গ্রহণীয় হলেও মণীন্দ্রকুমার দুটি শব্দের দ্বিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী। তার একটি হল কার্তিক যা তাঁর মতে হওয়া উচিত কার্ত্তিক, যেহেতু এটি এসেছে কৃত্তিকা থেকে; এবং অন্যটি আচার্য। এক্ষেত্রে মণীন্দ্রকুমার সুনীতিকুমারের মতেরই সমর্থক। তাঁদের বক্তব্য অযৌক্তিক নয়, তবে এ বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা নিরর্থক, কেননা এই সমস্ত শব্দেই রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব সম্পূর্ণ বর্জিত হয়ে গেছে। এমনকী ওই দুটি শব্দেও।

বানান-সমিতির দ্বিতীয় নিয়ম ঙ্ ও ং-এর বিকল্প সম্বন্ধে। তাঁর মতে ওখানে বিকল্প বিধান শুধু যে বানানে সরলতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, এই বিকল্পের ফলে জটিলতা বেড়েছে। কেননা এরপর গংগা, সংগ, অংক প্রভৃতি বানান প্রচলিত হবার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর একটি নিয়মে তৎসম শব্দের শেষে হস্‌চিহ্ন বর্জনের কথা বলা হয়েছে। মণীন্দ্রকুমার এই বিধানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। শুধু শব্দের মধ্যে নয়, শব্দের অন্তেও হস্‌চিহ্ন বর্জন অনুচিত বলে তিনি মনে করেন। ব্যাকরণের অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করলে মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্য অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রবণতা অন্য কথা বলে। আমরা জানি সম্রাট, বিরাট, মহান প্রভৃতি শব্দের হস্‌চিহ্ন বর্জিত হয়ে গেছে। সেই চিহ্নকে ফিরিয়ে আনার কথা আর ভাবা যায় না।

হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ নিয়ে মণীন্দ্রকুমারের আলোচনা দীর্ঘতর। বহু শব্দের বানানে রবীন্দ্রনাথ সরলতা সম্পাদনের জন্য হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ প্রচলিত করেছেন অযৌক্তিকভাবে। এখানে মণীন্দ্রকুমারের সমালোচনার উপলক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এখানেই নীচ-নিচ এবং দায়ী-দায়ি-সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমারের বিদগ্ধ আলোচনা পাই। অর্ধতৎসম সংস্কৃতাগত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘর বিকল্পও তাঁর মতে একান্তই অনুচিত। সমিতির সপ্তম নিয়মের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, বরিষন পরান মানিক প্রভৃতি শব্দে ব্যুৎপত্তি-আনুগত্যের জন্য মূর্ধন্য-ণ বজায় রাখাই উচিত ছিল। জাউ, কাজ, জাঁতা, জোড়, জোড়া প্রভৃতি শব্দে বর্গীয়-জ তাঁর মনঃপূত নয়। শব্দান্তে বিসর্গবর্জনও অনুচিত সিদ্ধান্ত বলে তিনি মনে করেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের বিধানকে অগ্রাহ্য বা পরিবর্তন করায় মণীন্দ্রকুমারের অনীহা স্পষ্ট। তাঁর বানানভাবনার মূল কথা আমরা এভাবে দেখতে পারি: (১) তৎসম শব্দের বানানকে পরিবর্তন করা চলবে না। হস্‌চিহ্ন বা বিসর্গ বর্জন করাও তাঁর মতে তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তন করারই নামান্তর; (২) শব্দের দুটি বিকল্প বানান থাকলে, অধিকতর প্রচলিত বানানটাই গৃহীত হবে; (৩) অতৎসম সংস্কৃতমূল শব্দের বানান যতদূর সম্ভব ব্যুৎপত্তি-অনুগ হবে; (৪) কোনো শব্দের ভুল বানানও দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত থাকলে তাকে স্বীকার করা যেতে পারে; (৫) বিকল্প বিধান থাকবে না।

সাধারণভাবে এগুলিই মণীন্দ্রকুমারের বানানভাবনার মূল বক্তব্য হলেও সর্বত্র তিনি নিজেই এগুলির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করতে পারেননি। কানা ও মানিক শব্দে তিনি ব্যুৎপত্তি-অনুগ বানান চেয়েছেন, অথচ বাণান, কাণ, পাণ প্রভৃতি বানানকে সমর্থন করতে পারেননি। কিছু

ক্ষেত্রে কিছু অসংগতি ছিল সত্য। তাঁর অনেক নির্দেশ গৃহীতও হয়নি। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের সমসময়ে বাংলা বানানবিষয়ে তাঁর মতো বিচক্ষণতা ও সর্বাত্মক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। বাংলায় অ্যা-ধ্বনির জন্য একটি নতুন বর্ণের কথা বারবার বলেছেন তিনি। বাংলা ও ভারতীয় নামসমূহের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণও তাঁর সমীক্ষার বহির্ভূত ছিল না। বাংলা ভাষার সবচেয়ে সমস্যাসংকুল এলাকাটিতে তাঁর বিচরণ ও আলোকসম্পাত যে অত্যন্ত উপকারী তাতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রয়োগ ও বানাননীতি বিষয়ে মণীন্দ্রকুমার ভেবেছেন ছয় দশক ধরে। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও রাজশেখর বসুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা ও পত্রালাপ আজও আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। যেখানে তাঁর বিশ্বাস ও যুক্তি আঘাত পেয়েছে সেখানেই তিনি তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলেছেন। তাঁর মতামত ও বক্তব্যের কোনো-কোনো অংশ আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আবার তাঁর কোনো-কোনো বক্তব্য স্বীকৃতি পায়নি। তাঁর বক্তব্যে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃঢ়তা ও নমনীয়তার এক আশ্চর্য মিশ্রণ দেখি। একদিকে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে তারই ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন ও ভ্রম-নিরাকরণের প্রচেষ্টা তাঁকে ব্যাকরণ ও বানানের আলোচনায় অপরিহার্য করে তুলেছে। কোথাও তাঁকে দেখি গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করতে। যেমন দেখেছি ইন্-ভাগান্ত শব্দে প্রাতিপদিক রূপটিকে বাংলায় গ্রহণের জোরালো সুপারিশের ক্ষেত্রে। আবার কোথাও দেখি তিনি গতানুগতিক ও প্রথাগত আলোচনাকে পরিহার করছেন না। যেমন কারকের আলোচনায়। কোথাও বা তিনি অসামান্য মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন দেখেছি বাচ্য-আলোচনার ক্ষেত্রে। ব্যাকরণ, বানান ও ভাষাপ্রয়োগের বিবিধ প্রকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা এক অসামান্য বৈয়াকরণকে পাই যাঁর আলোচনায় মৌলিকতা আছে , গতানুগতিকতা আছে, এমনকী একটি-দুটি ক্ষেত্রে স্ববিরোধও নেই এমন নয়। তবু সব নিয়ে এবং সব সত্ত্বেও তিনি একালের এক শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ।

বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূত

অনুবাদ সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রয়াস পরিমাণে ও উৎকর্ষে রীতিমতো ঈর্ষণীয়। হ্যোল্ডার্লিন, বোদল্যের, অস্কার ওয়াইল্ড, পাস্তেরনাক ('ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের কবিতাবলি), রিলকে এবং কালিদাস রয়েছেন সেই তালিকায়। জীবনের শেষ পর্বে একটি জাপানি কাব্যও অনুবাদ করেছিলেন তিনি। তবে অনুবাদ তিনি শুরু করেছিলেন, অন্তত প্রকাশকালের নিরিখে, কালিদাসের 'মেঘদূত' দিয়ে। 'মেঘদূত' গভীর অভিনিবেশসহ পড়া, তার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করা এবং সর্বোপরি মন্দাক্রান্তা ছন্দের দাবি প্রায় সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাবে পালন করে মূলানুগ পদ্যানুবাদ করা যে কত দুরূহ কাজ তা অনুমান করা শক্ত নয়। বুদ্ধদেব নিজে অবশ্য 'কালিদাসের মেঘদূত'-এ 'অনুবাদকের বক্তব্য'-তে বলেছেন, এ-অনুবাদে তিনি হাত দিয়েছিলেন কিছুটা আকস্মিকভাবে এবং 'এর জন্য বিশেষ -কোনো প্রস্তুতি ছিল না'। তবু এও আমরা জানি যে, মেঘদূতের অনুবাদে হাত দেবার অনেক আগে থেকেই বুদ্ধদেব সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে, এবং বিশেষ করে কালিদাসে, মজেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে এর আভাস মেলে। অনুবাদের জন্য 'মেঘদূত'-এর নির্বাচন আকস্মিক হতেই পারে। তবে পূর্বপ্রস্তুতি বলতে যদি পঠন-অধ্যয়নকে বুঝি, তাহলে বলতেই হয় যে, একটা মানসিক প্রস্তুতি ওভাবেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় কথা, 'মেঘদূত'-এর নির্বাচন সময়ের বিচারে যদি-বা আকস্মিক হয়ও, সেই নির্বাচনের পিছনেও কি কোনো কারণ ছিল না? কেনই-বা সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিপুল সম্ভারের ভিতর তাঁর কেবল 'মেঘদূত'-এর কথাই মনে হল? কেন কালিদাসেরই অন্য কোনো কাব্য আমল পেল না তাঁর কাছে? রবীন্দ্রনাথ তো কত আগেই একটা কৈফিয়ত দিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্যে —

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে,
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘদূত শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
যখন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।।

মেঘদূত পৃথিবীর প্রথম বিরহকাব্য, কাব্যগুণে অতুলনীয়, নদ-নদী পর্বত-অরণ্য-শোভিত প্রকৃতির উন্মোচনে এবং মন্দাক্রান্তার বিষণ্ণগম্ভীর দ্রুতিহীন সংগীতে এক আশ্চর্যসুন্দর প্রেমকাব্য। 'রঘুবংশম্'-এর পুরাণেতিহাসসুলভ চরিত্র কিংবা 'কুমারসম্ভবম্'— এর 'সুউচ্চ

কল্পনা' 'মেঘদূতে' নেই একথা সত্য, কিন্তু 'মেঘদূতে' প্রেম ও বিরহের যে তীব্রগভীর বিধুরতা পাই তা 'কুমারসম্ভবম্' বা 'রঘুবংশম্' কেন, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসেই অলভ্য। এটাই তো বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' নির্বাচনের কারণ হবার পক্ষে যথেষ্ট।-

দুই

বুদ্ধদেব বসু 'কালিদাসের মেঘদূত'-এর ভূমিকায় বলেছেন যে, এই অনুবাদকর্ম তিনি সম্পন্ন করেছিলেন প্রায় এক বছরে। একশো আঠারোটি শ্লোক অনুবাদের পক্ষে হয়তো এক বছর কম সময় নয়। কিন্তু যদি মনে রাখি, তাঁকে করতে হয়েছে পদ্যানুবাদ, প্রস্তুত করতে হয়েছে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা, লিখতে হয়েছে একটি দীর্ঘ ভূমিকা, তাহলে ওই এক বছর সময়কে আর বেশি বা যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

'মেঘদূতম্'- এ মোট কতগুলো শ্লোক ছিল তা আজও বিতর্কের বিষয়। সুকুমার সেন অনুমান করেছেন শ্লোকসংখ্যা ছিল ১০৮, যদিও প্রাচীন টীকাকারদের কেউ বলেছেন ১১১, কেউ-বা ধরেছেন ১১৫টি। এই কাব্যে যে প্রক্ষেপ ঘটেছে, তা কেউই অস্বীকার করেন না। আজ পর্যন্ত 'মেঘদূত' কাব্যের যতগুলো অনুবাদ হয়েছে তার প্রায় সবকটিতেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বলে যেগুলো চিহ্নিত হয়েছে সেগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক নির্দেশ করার জন্য গবেষকগণ মূলত নির্ভর করেন টীকাকার মল্লিনাথের উপর। রাজশেখর বসু তাঁর অনুবাদগ্রন্থে ১২১ টি শ্লোক ধরেছেন। আর বুদ্ধদেব বসু নিয়েছেন ১১৮ টি। তবে রাজশেখর বা বুদ্ধদেব কেউই শ্লোকসংখ্যার কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

'মেঘদূতে'র বাংলা অনুবাদ হয়ে আসছে অনেক কাল ধরেই। এমনকী, পদ্যানুবাদের সংখ্যাও কম নয়। গত একশো-দেড়শো বছরে প্রকাশিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ, প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ, নরেন্দ্র দেব, বুদ্ধদেব বসু ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ। এবং আরও কিছু অনুবাদ। এগুলোর মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর 'কালিদাসের মেঘদূত'-ই নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্যারীমোহন, নরেন্দ্র দেব, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেবল অনুবাদই করেছেন। ওই কাব্য বিষয়ে আমাদের অন্য কোনো কৌতূহল তাঁরা মেটাননি। যেসব প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে আসে 'মেঘদূত' সম্বন্ধে কিংবা কালিদাস সম্বন্ধে, সে বিষয়ে নীরব তাঁরা। এজন্য অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করা উচিত হবে না, যেহেতু মেঘদূতের অনুবাদ করতে গিয়ে সংস্কৃত কাব্য বিষয়ে বিশ্লেষণ বা বিচার এবং বিশদ টীকারচনা তাঁদের উদ্দিষ্ট ছিল না। আবার ঠিক এই কারণেই বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ। অপর কোনো অনুবাদই এর সঙ্গে তুলনীয় নয়।

তিন

পদ্যানুবাদে কিছুটা স্বাধীনতা নিতেই হয় সাধারণত। দুটি ভাষার শৈলী ও শব্দসম্ভারের পার্থক্য অনিবার্যভাবে অনুবাদককে কিছুটা স্বাধীনতা নিতে বাধ্য করে, এমনকী, নীতিগতভাবে অনুবাদক যদি স্বাধীনতা নিতে অনিচ্ছুক হন, তবুও। বুদ্ধদেব বসু যে তাঁর অনুবাদে কোনো স্বাধীনতা নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন সেকথা তাঁর 'অনুবাদকের বক্তব্য'-তেই বলেছেন তিনি —

'আমাকে যথাসম্ভব মূলের অনুগামী থেকে, একশো আঠারো শ্লোক রচনা করতে হ'লো।' এর সাত লাইন পরেই লিখছেন — 'যে-কোনো অনুবাদেই আমি রূপকল্পগত অবিকল সাদৃশ্যের পক্ষপাতী।' এখানে 'যথাসম্ভব মূলের অনুগামী' এবং 'রূপকল্পগত অবিকল সাদৃশ্য' এই দুটি কথার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তত্ত্বগতভাবে, কোনো অনুবাদই সম্পূর্ণ মূলানুগ হতে পারে না। এমনকী, একই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি ভাষার মধ্যে অনুবাদেও তা সম্ভব নয়। আর কবিতায় তো তা আরও সুদূরপরাহত। তবু যখন আমরা অনুবাদ পড়ি তখন দেখে নিই মূলের স্বাদ কতদূর পর্যন্ত এসেছে অনুবাদে। কবিতার অনুবাদে একশো শতাংশ মূলানুগতা কোনো সহৃদয় পাঠকেরই দাবি হতে পারে না। তবু বুদ্ধদেব বসুর কথা মেনে নিয়ে আমরাও দাবি করতে পারি যে, মূলের রূপকল্প বা ভাবচ্ছবিগুলি অনুবাদেও উঠে আসুক, আর তাহলেই মূলের স্বাদ বহুদূর পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকা সম্ভব হবে।

মেঘদূতের পূর্বমেঘের প্রথম শ্লোকটি বহুশ্রুত ও বহুচর্চিত। সেটি দিয়েই আমরা বুদ্ধদেবের অনুবাদের একটা আন্দাজ নেবার চেষ্টা শুরু করতে পারি।

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামাগির্যাশ্রমেষু।।

'কাশ্চিৎ' শব্দটির অনুবাদে বুদ্ধদেব 'জনেক' কেন লিখলেন, তার পশ্চাৎকাহিনি নিশ্চয় অনেকেই জানেন। বুদ্ধদেব নিজেই তা জানিয়েছেন আমাদের। যখন নানাভাবে শব্দটির অনুবাদ করার কথা ভাবছেন, অথচ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, তখন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শে 'জনেক' শব্দটি ব্যবহার করতেই বাকি অংশ এসে গেল যেন আপনা-আপনি। সেই ১৯৫৫-৫৬ সালে যখন সুধীন্দ্রনাথ 'জনেক' শব্দটির কথা বলেন তখনও শব্দটি অভিধানে ছিল অলব্ধপ্রবেশ। কিন্তু বাংলা সন্ধির নিয়মে 'জনেক' সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং কার্যকারী । শতেক, বারেক, ক্ষণেক, তিলেক — এই সবই যে বাংলা সন্ধির নিয়মে তৈরি শব্দ তা সবসময় মনেই রাখি না আমরা। তাহলে ওই একই নিয়মে 'জনেক'-তে আপত্তি কোথায়? এই প্রসঙ্গে এর একশো বছর আগে ১৮৬০ সালে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদে ব্যবহৃত 'বর্ষেক' ও 'যতেক' শব্দদুটির প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেই একশো বছর আগের ওই প্রয়োগও সুধীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে থাকবে হয়তো। 'ভর্তুঃ' অর্থাৎ ভর্তার শাপে বিরহভারকাতর যক্ষ গমিতমহিমা হয়ে এক বর্ষকাল জনকতনয়া সীতার স্নানের দ্বারা পুণ্য জলযুক্ত স্নিগ্ধ ছায়াতরুসমন্বিত রামগিরি আশ্রমে বসতি করতে বাধ্য হল। বুদ্ধদেব কীভাবে শ্লোকটি অনুবাদ করেছিলেন তা দেখার আগে আমরা দেখে নেব কীভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ করেছিলেন। পাঠক লক্ষ করবেন, কালিদাসের চারটি চরণকে দ্বিজেন্দ্রনাথ দশটি পঙক্তিতে ভেঙে এনেছেন এইভাবে —

> কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
> কান্তা-সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম-কাজ।
> ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—

"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি!
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।

আমরা এও লক্ষ করি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলের ছন্দকে অনুসরণ করেননি, ভর্তা কুবেরকে একবার 'কুবের' বলেছেন, পরে করেছেন 'ধনপতি', এবং 'নাহি সে আকৃতি' কোনোভাবেই মূলানুগ নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগ নয় বটে, তবে মূল থেকে তার চ্যুতি অত্যন্ত বেশিও নয়। 'রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে' এই অংশ 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু' এই শব্দকল্পের অনুবাদ হিসেবে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাঁর কাব্যভাষা মধ্য-উনিশ শতকের ভাষাকে স্মরণ করায়। মন্দাক্রান্তাকে ছেড়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত চোদ্দো মাত্রায় পঙ্ক্তি বেঁধে দেবার ফলে অনুবাদে একটা সহজ স্পন্দন এসেছে।

পাশাপাশি এবার দেখব বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ —

জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু,
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল,
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

ভর্তাকে বুদ্ধদেব প্রভুতে রূপান্তরিত করেছেন। হয়তো 'স্বামী' কথাটিও ব্যবহার করা চলত, কিন্তু 'প্রভু'-ও নির্দোষ। রাজশেখর বসু তাঁর গদ্যানুবাদে 'প্রভু' না রাখলেও তাঁর টীকা অংশে 'প্রভু কুবের কর্তৃক প্রদত্ত' কথাগুলি দেখতে পাচ্ছি। নরেন্দ্র দেবও 'প্রভু'ই রেখেছেন। এই একটি শব্দকে যদি না ধরি, তবে বলতেই হবে যে, বুদ্ধদেবের অনুবাদে এই প্রথম শ্লোকটিতে মূলের অনুগামিতা নিঃসংশয়িত, এবং 'বসতিং চক্রে' অংশকে মান্য চলিত বাংলা ভাষার রীতিতে 'বাঁধলো বাসা' করে বুদ্ধদেব অনুবাদে নিশ্চিতভাবে সজীবতা সঞ্চার করেছেন। 'গমিতমহিমা' বিশেষণ, রাজশেখর বসুর অনুবাদে তা হয়েছে 'বিগতমহিমা', বুদ্ধদেব করলেন 'মহিমা অবসান'। বলে না দিলেও চলে, এ অনুবাদ সম্পূর্ণ আক্ষরিক না হলেও সম্পূর্ণ সার্থক।

এইখানে এসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনবাদের নমুনাও দেখে নেওয়া যেতে পারে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে, ১৯৯৮ সালে তার পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোয়। শক্তি মেঘদূতের কেবল ৫৩টি শ্লোক অনুবাদ করেছেন। এবং নিজেই তিনি বলেছেন তাঁর অনুবাদ মূলাননুগ নয়, মেঘদূতের ভাব অবলম্বন করে স্বতন্ত্র এক ধরনের রচনামাত্র। শক্তির ভাবানুবাদ নিঃসন্দেহে একালের কাব্যশৈলীর সঙ্গে মানানসই। তবে প্রথম দুটি শ্লোকের অনুবাদে তাঁর ভাষা মেঘদূতের পক্ষে মানানসই নয়। প্রথম শ্লোকটি তাঁর অনুবাদে—

কুবের-অভিশাপে মহিমা গেলো খোয়া বিরহভার হলো দুরূহ
যক্ষ একাকী সে না-কাজ ফলদোষে পেলেন গুরু এই শাস্তি
বসতি রামগিরি, যেখানে ছায়া দেয় নিবিড়নীল ওই তরুগণ
সেখানে ধারাজল পুণ্য হয়ে আছে জনকতনয়ার স্পর্শে।

'গমিতমহিমা'-র বাংলা রূপান্তর হিসেবে 'মহিমা গেলো খোয়া' অর্থের দিক থেকে নির্দোষ হলেও মেঘদূতের পক্ষে বেমানান। আবার 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'-র অনুবাদ হিসেবে 'না-কাজ ফলদোষ' উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। দ্বিতীয় শ্লোকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

হয়েছে কাঠিসার কান্তাবিরহিত খসেছে কঙ্কণ কনকের
অসহ কয়মাস কীভাবে কেটে গেলো কামুক অনুমানে বুঝে নাও —

এখানে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, এও উৎকৃষ্ট অনুবাদের নিদর্শন নয়। কিন্তু যদি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজেরই কৈফিয়তকে মনে রাখি তাহলে এর জন্য তাঁর প্রতি দোষারোপ অহেতুক। কেননা তিনি ভাবানুবাদ করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, যেকোনো পাঠকই অভ্যাসবশত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইবেন। যদি মূল মেঘদূতকে সরিয়ে রাখা যায় তবে শক্তির 'অনুবাদে' অনেকগুলি শ্লোকই উৎকৃষ্ট কবিতা বলে মনে হবে। যেমন তাঁর ১২ সংখ্যক শ্লোকটি —

এবং যেতে-যেতে জড়িয়ে ধ'রে বলো, বিদায় দাও ওগো বন্ধু —
তোমারি রামগিরি-মেখলা বরষায় পেয়েছে রঘুপতি-স্পর্শ
তোমাকে কাছে পায় কাতর বর্ষায় মোচন করে সুখ অশ্রু
দীরঘ বিরহের অকাল কেটে যায় তোমার মিলনের সঙ্গে।

কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মেঘদূতে যেহেতু মূল শ্লোক অনুপস্থিত, যেহেতু অনুবাদ মূল থেকে বহুদূরবর্তী এবং শ্লোকসংখ্যাও রাজশেখর বসু বা বুদ্ধদেব বসু বা নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে মেলে না, ফলে তাঁর শ্লোককে বহু ক্ষেত্রেই শনাক্ত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গ ছেড়ে এবারে যাওয়া যাক আমাদের মূল আলোচনায়, দেখা যাক পূর্বমেঘের নবম শ্লোকটি।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূ নমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।।

এর সরলার্থ এইরকম — অনুকূল পবন মেঘকে ধীরে-ধীরে নিয়ে যাচ্ছে এবং মেঘ দেখবে তার বাঁদিকে গর্বিত চাতক মধুর স্বরে ডাকছে; এবং গর্ভাধানের সময় অভ্যাসবশত আকাশে মালাবদ্ধ বলাকারা সুদর্শন মেঘকে সেবা করবে। এবারে দেখা যাক বুদ্ধদেবের অনুবাদে শ্লোকটির কী রূপান্তর দাঁড়াল—

যেমন অনুকূল পবন ধীরে-ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তোমাকে,
এবং বাম দিকে গরবী চাতকেরা ঐকতান তোলে মধুময়।
তেমনি নভতলে গর্ভধানকালে মালার মতো বাঁধা বলাকা

সহজ অভ্যাসে, হে প্রিয় দরশন, করবে আপনাকে সেবায় সুখী।।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করবেন, প্রথম পঙ্‌ক্তির তৃতীয় পর্বটি যেন একটু আলগাভাবে লেগে আছে দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে। 'ভাসিয়ে নিয়ে যায় তোমাকে' এই অংশ আমাদের তৃপ্ত করে না একথা ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গেই বলতে হয়। তবে শ্লোকটির বাকি অংশ নির্দোষ, নিখুঁত। শুধু পূর্বমেঘই নয়, উত্তরমেঘেরও বহু শ্লোক বুদ্ধদেবের অনুবাদে হয়ে উঠেছে আশ্চর্য রকমের ঋদ্ধ, উজ্জ্বল। উত্তরমেঘের চতুর্থ শ্লোক অর্থাৎ সমগ্র কাব্যের ৬৮ সংখ্যক শ্লোকটি আমরা এবার দেখব, যদিও বলে দেওয়া ভালো যে, টীকাকার মল্লিনাথ এটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। রাজশেখর বসু কিন্তু এই শ্লোকটিকে বাতিল করেননি, বাতিল করেননি বুদ্ধদেবও। আগে দেখে নিই শ্লোকটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে অনুবাদ করেছেন।

মূল শ্লোকটি এই —

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ -
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ —

হর্ষ বিনা অশ্রুধারা,জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ।

পাশাপাশি দেখব বুদ্ধদেবের অনুবাদ —

অন্য হেতু নেই— যেথায় যক্ষেরা অশ্রু ফেলে শুধু পুলকে,
অন্য তাপ নেই— কেবল কামজ্বর, দয়িত কাছে এলে কেটে যায়,
প্রণয়-অভিমান ব্যতীত অন্যত কখনো বিচ্ছেদ ঘটে না,
যেথায় যৌবন ব্যাপ্ত আজীবন, অন্য বয়সের দেখা নেই।

যদি রাজশেখর বসুর গদ্যানুবাদকে চোখের সামনে রাখা যায়, তাহলে বুদ্ধদেবের এই পদ্যানুবাদকে নিশ্চয় অনাক্রম্য বলে মনে হবে। রাজশেখর লিখছেন— 'যেখানে যক্ষগণের নয়নসলিল আনন্দের জন্যই নির্গত হয়, অন্য কারণে নয়; অন্য তাপ নেই, কেবল কুসুমশরজাত তাপ —যা প্রিয়সমাগমে নিবৃত্ত হয়; প্রণয়কলহ ভিন্ন অন্য কারণে বিচ্ছেদ ঘটে না; যৌবন ভিন্ন অন্য বয়সও নেই।' সংস্কৃত শব্দবন্ধের স্বাভাবিক ঝংকৃত ও অলংকারঋদ্ধ চলন বুদ্ধদেবের অনুবাদে নেই, কিন্তু তার বদলে যা আছে তাও কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়। বুদ্ধদেবের অনুবাদ মূলের অর্থকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে, মন্দক্রান্তা ছন্দের (যা বাংলা পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়) প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে, বাংলা কবিতার রস নিবেদনে সফল।

সবশেষে উত্তরমেঘের সেই অতিপরিচিত ৮৫ সংখ্যক (রাজশেখর বসুর হিসেবে ৮৮ সংখ্যক) শ্লোকটিকে আমরা বিবেচনায় আনব। শ্লোকটি এই —

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদে শ্লোকটির রূপান্তর দাঁড়িয়েছে এইরকম —

প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গা-ময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।
তনু তার কলেবর, কটি তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহন।
বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার
দেখিলে আকৃতি তার মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বা ধাতার।

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদটি মূলানুগ নয় পুরোপুরি, তবে কবিতা হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত, দ্রুতিসম্পন্ন। কিন্তু অনুবাদের সময় তিনি শ্যামা, নিম্ননাভি, শ্রোণীভারাৎ অলসগমনা এই শব্দবন্ধগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এগুলোকে বাদ দিলে শ্লোকটির আবেদন কতদূর পাঠকমনে সঞ্চারিত করা যায় তা সন্দেহের বিষয়। নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ সেদিক থেকে অনেক বেশি মূলানুগ—

তন্বী-তনু, বর্ণ শ্যামা,
দন্ত তুষার-শিখর হেন,
রক্ত-বরণ অধর দুটি
পক্ক রাঙা বিম্ব যেন!
ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি,
ত্রস্তা মৃগীর তুল্য দিঠি,
নিবিড় নিতম্বেরই ভারে
অলস মৃদু যার গতিটি
নিটোল দুটি স্তনের চাপে
ঈষৎ নত অঙ্গ তারি
বিধির আদি সৃষ্টি যেন—
সেই যুবতীই প্রথম নারী!

এই অনুবাদে মূলের আবেদন অনেকটাই রক্ষিত। তবে নরেন্দ্র দেব যেহেতু মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখেননি, তাই তাঁর কাজটা একটু সহজও ছিল। এইখানেই বুদ্ধদেবের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তাঁর অনুবাদে শ্লোকটির প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ ও শব্দবন্ধ মূলের রূপকল্পসহ উপস্থিত। উপরন্তু আমরা দেখলাম মন্দাক্রান্তা ছন্দের বন্ধনে থেকেও কীভাবে অনবদ্য বাংলা রূপান্তর সম্ভব হল —

তন্বী, শ্যামা, সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণ মধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

আমরা লক্ষ করি, পদ্যানুবাদগুলির মধ্যে নরেন্দ্র দেব ও বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে 'স্তোকনম্রা' কথাটার আক্ষরিক বাংলা রূপান্তর হয়েছে, যথাক্রমে 'ঈষৎ নত' ও 'ঈষৎ-নতা'। নরেন্দ্র দেবের অনুবাদে আছে একটা সহজ চলন, একটা স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু মন্দাক্রান্তার প্রতি বিশ্বস্ততা এবং মূলানুগতার কথা মাথায় রাখলে বুদ্ধদেবের অনুবাদকে এগিয়ে রাখতেই হয়।

চার

কবিতার অনুবাদ বিষয়ে বুদ্ধদেবের একটি বিশেষ ভাবনা ছিল। অন্য কোনো ভাষার প্রাচীন কোনো কবিতার সঙ্গে একালে আমাদের কিংবা বিদেশি কোনো প্রাচীন কবিতার সঙ্গে একালে আমাদের একটা ব্যবধান আছে, সেকথা মেনে নিয়েও সেই ব্যবধানকে 'অনতিক্রম্য' বলে স্বীকার করেননি তিনি। আর অনুবাদকে সেই ব্যবধান মোচনের অন্যতম উপায় বলে মানতেন তিনি — 'অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্ররোচনায় আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা নিষ্ফল ও বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা বাণিজ্যের যোগ্য ব'লেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' নাম দিয়েছি, এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা হারিয়ে যায় না। অর্থাৎ অনুবাদই সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে।'

দুটি ভাষার চরিত্রগত ব্যবধানের মধ্যে সেতুরচনা নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেবের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। শুধু তা-ই নয়। 'মেঘদূত' কাব্যের ছন্দের পর্ববিভাগ ও মাত্রাসংখ্যাকে অবিকল বাংলায় আনা যাবে কি না, কিংবা তার মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েও মন্দাক্রান্তার চলন বজায় রাখা যাবে কি না, তাঁর কাছে এও একটা বড়ো প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব দ্বিবিধ উপায়ে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলেন। প্রথমত, বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক হবে মনে করে মন্দাক্রান্তায় তিনি একটা 'গৌণ পরিবর্তন'করেন। তাঁর অনুবাদে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে আট-এর বদলে সাত মাত্রা, এবং শেষ পর্বে কোথাও পাঁচ, কোথাও চার, কোথাও-বা তিন মাত্রার বিভাগ রাখলেন। একে তিনি 'গৌণ পরিবর্তন' বললেন বটে, তবে এই পরিবর্তনই তাঁর অনুবাদে প্রবহমাণতা সঞ্চার করল, অনুবাদটি যে আদ্যন্ত বাংলা কবিতাও হয়ে উঠল, তাতে এই 'গৌণ পরিবর্তনে'র ভূমিকা কম নয়।

বুদ্ধদেবের অনুবাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নজর এড়ায় না। তাঁর অনুবাদের ভাষা নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা কবিতারই ভাষা। কিন্তু মূলের স্বাদও যাতে পাঠক পেতে পারেন, তার জন্য তিনি মূল শ্লোকে আছে এমন-কিছু সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন, যেগুলোর প্রয়োগ খুবই সীমিত বাংলায়। কিন্তু অনুবাদে যদি মূলের স্বাদ পেতে হয়, তাহলে এই প্রকরণটি যে অত্যন্ত কার্যকারী তাতে সন্দেহ করা চলে না। বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূত-অনুবাদের এও একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা সেইরকম কয়েকটা নমুনা এখানে দেখব এবার।

দেখা যাক ৮১- সংখ্যক (উত্তরমেঘ) শ্লোক ও তার বুদ্ধদেবকৃত অনুবাদ —

এক ঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ।।
হে মেঘ, সে তোমার সখির (sic) বাম পদ আমারই মতো করে অভিলাষ
অন্য জন তার দোহদ ছল ক'রে চায় যে বদনের মদিরা।

পাঠক মূলে এবং অনুবাদে 'দোহদ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করবেন।

৬৬-সংখ্যক শ্লোকেও আছে এমন প্রয়োগ।

হস্তে নীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।।

হস্তে ধৃত নীলকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসবের পরাগে হ'য়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,
এবং তুমি যাকে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন বধূদের।

খাঁটি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দবন্ধের মিশ্রণ কারো কারো যে ভালো লাগেনি, সেকথা বুদ্ধদেব নিজেই জানিয়েছেন আমাদের। কোনা-এক পাঠক গুরুচণ্ডালির অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। আমরা বরং বলি, এ যদি গুরুচণ্ডালি হয়, তবে অনুবাদে এমন গুরুচণ্ডালিকে আমরা পরিহার্য বলে মানব না। এই গুরুচণ্ডালির জন্যই বুদ্ধদেবের অনুবাদ যথার্থ অনুবাদ হয়েও যথার্থ বাংলা কবিতা হয়ে উঠেছে, এই সত্যটাকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'-কে নববর্ষার শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কখনো পূর্বমেঘে, কখনো উত্তরমেঘে কালিদাস আমাদের নিয়ে যান ঘরের বাইরে, মেঘের যাত্রাপথে আমরাও হয়ে পড়ি সঙ্গী। সেই যাত্রাপথে 'বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন।' এই সম্মিলন-সংঘটনে কালিদাসের প্রধান হাতিয়ার হল আলংকারিক ভাষা। 'মেঘদূতে' কালিদাসের অলংকারিকতার প্রচুরতা, পৌনঃপুনিকতা ও গভীরতা তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। 'মেঘদূতে'র আলংকারিকতা যান্ত্রিক নয়, বরং তা এতই চিত্তাকর্ষক, রহস্যময় ও সৃষ্টিশীল, যে আমাদের কাছে তার আবেদন অনিঃশেষ ও দুর্নিবার। বুদ্ধদেব কতদূর পর্যন্ত কালিদাসের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যটিকে তাঁর অনুবাদে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, তা দিয়েও তাঁর সাফল্য-অসাফল্যের বিচার করতে হবে। যেমন পূর্বমেঘে তেমনি উত্তরমেঘে কালিদাস অসামান্য চিত্র এঁকে বিরহী-বিরহিণীর অন্তর্বেদনাকে মূর্ত

করেছেন। আর সেই চিত্রাঙ্কনে তিনি সাহায্য নিয়েছেন বাক্‌প্রতিমার, রূপকের, উপমার। একটি-দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই দেখা যাক উত্তরমেঘের একটি শ্লোক —রাজশেখর বসুর হিসেবে ৯০-সংখ্যক, বুদ্ধদেবের হিসেবে ৮৭-সংখ্যক শ্লোক। এই শ্লোকের দুটি চরণ দেখব —

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।

প্রবল রোদনের ফলে দুই চোখ স্ফীত, উষ্ণ নিশ্বাসে অধরোষ্ঠ অন্য বর্ণ ধারণ করেছে, অর্থাৎ বিবর্ণ হয়েছে — এইভাবে কালিদাস যক্ষপ্রিয়াকে এঁকেছেন এক বিরহক্লিষ্টা নারীরূপে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

ব্যাকুল, অবিরল রোদনে রঞ্জিত বিস্ফারিত আঁখি প্রেয়সীর,
অধরশোণিমার বর্ণ অপগত, শীতল নয় ব'লে নিশ্বাস,

কয়েকটি শ্লোক পরে ৯৫-সংখ্যক শ্লোকে (বুদ্ধদেবের ৯২- সংখ্যক) কালিদাস আরও একবার যক্ষের প্রেয়সীর বর্ণনায় লিখলেন—

প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রাশেষাং হিমাংশোঃ

অর্থাৎ পূর্বাকাশের প্রান্তে ক্ষীণচন্দ্রের মতো (যে চাঁদের একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট রয়েছে) শীর্ণ তনু তার। বুদ্ধদেবের অনুবাদে তার রূপান্তর এইরকম —

বিরহশয্যায় শুয়েছে এক পাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,

আর একটি শ্লোকে (৯৬-সংখ্যক) কালিদাস লিখেছেন —

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।

সেই অবলা নারী তার নিরাভরণ দেহকে গভীর দুঃখে বার বার শয্যাতলে স্থাপন করছে। বুদ্ধদেবের অনুবাদে এইরকম —

অসহ বেদনায় কখনো উঠে বসে, এমনি বার-বার শয্যাতলে,
ভূষণবর্জিত পেলব তনু তার ন্যস্ত করে সেই অবলা,

এ সমস্তই বিরহী যক্ষের বয়ান, মেঘের প্রতি যক্ষের বয়ান। কালিদাস যক্ষের এবং যক্ষপ্রিয়ার যে সুতীব্র বেদনার চিত্র এঁকেছেন তাতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে রূপকল্পগুলি। অথচ রূপকল্পের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ সত্ত্বেও মেঘদূতের আলংকারিকতা কখনো মুদ্রাদোষে পর্যবসিত হয় না। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বেদনার তীব্রতা ও গভীরতা কি পুরোপুরি উপস্থিত? 'প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং'- এর আবেদন কি 'ব্যাকুল, অবিরল রোদনে স্ফীত'-তে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক ঠিক? কালিদাসের ওই শব্দবন্ধকে যদি আড়ালে রাখি, তাহলে বুদ্ধদেবের ওই বাক্যাংশকে নির্দোষ মনে হবে। কিন্তু পাশাপাশি দেখলে মনে হতেই পারে বাংলা রূপান্তরে একটু বোধ হয় ঘাটতি থেকে গেল। একই ভাবে 'শয্যা-উৎসঙ্গে দুঃখদুঃখেন অসকৃৎ নিহিতং সন্ন্যস্ত-আভরণং পেশলং গাত্রং ধারয়ন্তী' (গদ্য-অন্বয়) এর অনুবাদে বুদ্ধদেব যা লিখেছেন তা একটু-যেন অনাকর্ষক, অগভীর। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির ঝংকার ও ওজনের

কথা মাথায় রাখলে মন্দাক্রান্তাকে 'মেঘদূতে'র যোগ্য বাহন বলে মনে হবে। কিন্তু বুদ্ধদেবের সামগ্রিক সাফল্য সত্ত্বেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের অনুবাদকে যে কিছুটা অগভীর বা বৈচিত্র্যহীন মনে হয়, তার কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা ভাষার পক্ষে মন্দাক্রান্তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'মেঘদূতে'র অনুবাদে যে স্বাধীনতা নিয়েছেন, বুদ্ধদেব তা নিতে চাননি। আর তা চাননি বলেই তাঁর কাজটি ছিল সুকঠিন। বুদ্ধদেবকে প্রায় অসাধ্যসাধনের চেষ্টায় নামতে হয়েছিল। মূল 'মেঘদূতে'র রূপকল্প ও ভাবচ্ছবি তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও যে পুরোপুরি এবং সর্বত্র বাংলা অনুবাদে আনা যায়নি, তার জন্য অংশত দায়ী দুটি ভাষার বিস্তর পার্থক্য, এবং বুদ্ধদেবের মন্দাক্রান্তায় বাঁধা পড়া। তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর 'কালিদাসের মেঘদূত' অদ্যাবধি একটি পরমোজ্জ্বল অনুবাদকর্ম বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এই অনুবাদের শেষে বুদ্ধদেব যে বিশদ ও বিস্তৃত টীকা সংযোজন করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম। আর আমাদের উপরি-পাওনা হিসেবে আছে এ-বইয়ের ভূমিকাটি। বুদ্ধদেবের এই দীর্ঘ ভূমিকাটির জন্য বাঙালি-পাঠক চিরঋণী থাকবে তাঁর কাছে। কোথাও-কোথাও বুদ্ধদেবের একটি-দুটি মন্তব্যকে নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে একথা মেনে নিয়েই বলতে চাই যে, ভূমিকারূপী 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' নিবন্ধটি সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে বুদ্ধদেবের গভীর চিন্তনের নিদর্শন যেমন, তেমনি তাঁর গদ্যশৈলীর যা-কিছু বিশিষ্টতা অনন্যতা ও উদ্ভাস তারও নিদর্শন হয়ে আছে সেটি। ওই প্রারম্ভিক নিবন্ধটির সঙ্গে ভাবে-ভাষায়-বৈভবে তুলনীয় কেবল তাঁরই 'মহাভারতের কথা'।

বুদ্ধদেব বসুর বানাননীতি

যেকোনো লেখকের বেলায় যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি বুদ্ধদেব বসুরও বানানভাবনা ও বানাননীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বদলেছে। কিন্তু এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে আমাদের যে, বানানচিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। অল্প কয়েকজন বানান-সচেতন বাঙালি লেখকের অন্যতম তিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি পেরেছিলেন বানান বিষয়ে সর্বত্র সুস্থির থাকতে। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে আমরা দেখেছি দোলায়মান, দেখেছি নিজেরই কোনো বানানকে পরবর্তী কালে বদলে ফেলতে। অবশ্য এটাকে অস্বাভাবিক বা অনুচিত বলে মনে করি না আমরা। বাংলা বানান তাঁর সমগ্র জীবৎকালে একটা বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল ব্যাপার ছিল। মনে রাখতে হবে, তাঁর লেখকজীবন শুরু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের (১৯৩৬) অনেক আগে। আর তিনি যখন তাঁর লেখক জীবনের শেষ পর্বে, তখন নতুন নতুন বানান সমস্যায় বাংলা ভাষা বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বা আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাই তাঁকে বহু নিয়ম তৈরি করে নিতে হয়েছিল, এই বিষয়ে অন্য বহু লেখকের মতো নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্‌বেগে যা-মনে-হয় লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর মতো লেখকের পক্ষে। বারে বারে নিজেরই সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়েছে তাঁর, বারে বারেই দ্বারস্থ হয়েছেন রাজশেখর বসুর।

দুই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের নিয়মাবলি যখন (১৯৩৬) প্রকাশিত হয়, বুদ্ধদেবের বয়স তখন আঠাশ বছর। আর তখন তাঁর লেখা হয়ে গেছে 'সাড়া', 'লাল মেঘ' প্রভৃতি উপন্যাস, লেখা হয়ে গেছে 'মর্মবাণী, 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী'-র মতো কাব্যগ্রন্থ। সেই গোড়ার দিকের রচনাগুলিতেই যে তাঁর বানাননীতি সুনির্ধারিত হয়ে গেছে বা নিরূপিত হয়ে গেছে তা মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু তাঁর কয়েকটি বানান সেই প্রথম যুগেও বির্তকের ঝড় তুলেছিল। স্‌টেশান, স্‌টিমার-এর মতো বানান দেখে অনেকের ভ্রুকুটির কথা জানি আমরা। ১৯৪০-৪২ এর পর থেকে বুদ্ধদেবের বানাননীতি নির্দিষ্টতা পেতে শুরু করে। ১৯৬০-৬৫ তে তা পূর্ণরূপ নিয়ে নেয়। ১৯৩৫-৩৬ এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সরাসরি মন্তব্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু তিনি যে ওই সমিতির বহু প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি, একথা আমাদের সবারই জানা।

যে-সুপারিশে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল, যে সুপারিশ প্রস্তুত করেছিলেন রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিজ্ঞজন, তা কেন বুদ্ধদেব মানতে পারেননি, তা দেখা

দরকার। প্রথম কথা হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি জানালেও, তিনিও যে ওই সমিতির বানাননীতি পুরোপুরি মানতে প্রস্তুত ছিলেন এমন নয়। দ্বিতীয়ত, সুনীতিকুমার বা রাজশেখর বসুর প্রতি বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির সুপারিশকে তিনি নিশ্চয় পশ্চাৎমুখী বলে মনে করেছিলেন। আর সেই কারণেই সমিতির বানান তিনি সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। বানান বিষয়ে তাঁর অনেক সংশয় বা প্রশ্নের উত্তর বা নিরসনের জন্য বুদ্ধদেব রাজশেখর বসুর দ্বারস্থ হতেন, একথা তাঁর জবানিতেই জানতে পারি আমরা। কিন্তু সমিতির বানান সুপারিশে যে কিছু ত্রুটি ছিল সেকথাও তো অস্বীকার করা যায় না। অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসুও কতকগুলো ব্যাপারে ছিলেন স্বাধীনচেতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির প্রস্তাবের কিছু অংশ প্রস্তাব প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে যায়, প্রায় কোনো বিতর্ক ছাড়াই। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বলোপ তার অন্যতম। তৎসম শব্দের বানান অপরিবর্তিত রাখার ব্যাপারটা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না বটে, তবে সুরটা ছিল। সাধারণভাবে এই সুরটি সকলেই ধরে নিয়েছিলেন। অসংস্কৃত শব্দের বানানের বেলায় বানান সমিতিকে কোথাও-কোথাও দোলাচল বলে মনে হয়েছে। নানা ক্ষেত্রে বিকল্প বানান রাখার প্রস্তাবে সেই দোলাচল ভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। তা ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক বাংলা শব্দে হ্রস্ব-স্বরচিহ্নের ব্যবহার, ক্রিয়াপদে ও-কারের ব্যবহার প্রভৃতির জন্য রবীন্দ্রনাথের যে-সপক্ষতা, তা মেনে নেয়নি বানান সমিতি। আমরা বুদ্ধদেব বসুকেও দেখি মোটামুটিভাবে এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারী।

বুদ্ধদেবের বানাননীতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনার আগে বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি রচনার অংশ আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই।

এক.

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
(বন্দীর বন্দনা)

দুই.

কিন্তু বিষয়হিশেবে গণজীবনকে অবলম্বন
ক'রেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ, চলতি
মুহূর্তের উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ক্রোধ, কি ব্যক্তিগত দুঃখ; দুঃখটা
কখনো-কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি ক'রে বলা যে আমাদের মনে
প'ড়ে যায় .....

(সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য ঃ কবিতা আশ্বিন ১৩৫৪)

তিন.

স্বভাবতই সুস্বাদু একটা জীবকে প্রচুর মশলাসহযোগে যে-কোনোরকমে ভোগ্য

ক'রে তোলা যায়, কিন্তু ঐ খোশাটাকে সুখাদ্য ক'রে তোলা যার-তার কাজ নয়।

(সব-পেয়েছির দেশে, শ্রাবণ ১৩৪৮)

চার.

তা না-হ'লে যে আমার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠতার শেষ ঘোষণা হ'তো না।

(শেষ পাণ্ডুলিপি, ১৯৫৬)

পাঁচ.

আমি দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক মানুষ আমি দেখেছি, বহু সাহিত্যিক, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু আর-কেউ আমার মনে তেমনভাবে নাড়া দেয়নি, যেমন দিয়েছে বীরেশ্বর।

(শেষ পাণ্ডুলিপি, ১৯৫৬)

ছয়.

তার মানে ওটা না-হ'লেও চলতো, রীতির সৌষ্ঠববর্ধনের জন্যই তার প্রয়োগ।

(রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য, ১৯৫৫)

সাত.

ভালো না-বেসে তো উপায় নেই।

(শেষ পাণ্ডুলিপি, ১৯৫৬)

আট.

দুধের মতো শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দে সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে — মস্ত বড়ো নদীটা যেন দুলে, ফুলে, গর্জে উঠে আরো প্রকাণ্ড হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো —

(আমার ছেলেবেলা, ১৩৭৯)

নয়.

সর্বতোভাবে কবি— অবার সেই সঙ্গে এমন-কী আছে যা তিনি নন, সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়? নাট্যকার, গীতকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র-ভ্রমণ-কথোপকথনে কারুশিল্পী — এমনকি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক।

(কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য ১৯৫২)

দশ.

এই দুটি ধারা, সান্তরভাবে আর কখনো বা মিশ্রিতভাবে, বনবাসী রামের জীবনে প্রবহমান ঃ একটি বীরোচিত, অন্যটি প্রেমিকোচিত — দুটোই গৌরবজনক।

(মহাভারতের কথা, ১৯৭৪)

তিন

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিককার দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'বন্দীর বন্দনা' ও 'মর্মবাণী'। আর তাঁর শেষ প্রকাশিত রচনা 'মহাভারতের কথা'। আমরা কালপরম্পরাকে কিছুটা অবহেলা করে তাঁর সারাজীবনের রচনাবলির কয়েকটি বেছে নিয়ে তা থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে উদ্ধৃত করেছি। এইসব উদ্ধৃতি নেবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোতে বুদ্ধদেবের বানাননীতি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরের দশটি উদাহরণের ভিতরের এই শব্দগুলো পাঠককে লক্ষ করতে অনুরোধ করব —

১. কী, না-হয়, হ'য়ে;
২. ক'রেও, কি, ক'রে, প'ড়ে
৩. যে-কোনোরকমে, ক'রে, ঐ, খোশাটাকে;
৪. না-হ'লে, হ'তো;
৫. দু-একটি, আর-কেউ;
৬. না-হ'লেও চলতো;
৭. না-বেসে;
৮. মতো, শাদা, এলো, বড়ো, আরো, হ'য়ে, পড়লো;
৯. এমন-কী, এমনকী;
১০. কখনো, প্রবহমান।

একথা আমি নিশ্চয় বলব না যে, এই ছাব্বিশ-সাতাশটি শব্দ বা শব্দের বানানে বুদ্ধদেবের বানান ভাবনার পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের বানাননীতির একটা হদিশ এসব বানান থেকে নিশ্চয় পেয়ে যাই আমরা।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে যে 'কী' ও 'কি' শব্দদুটো রয়েছে তা থেকে বোঝা গেল যে, সেই ১৯২৯-৩০ সালেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অর্থভেদে কী-কি বানানভেদ মেনে নিয়েছিলেন। প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' আর প্রশ্নসূচক সর্বনাম 'কী'-র তফাত করার কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তা বলেছিলেন বিংশ শতকের গোড়াতেই। আর আমরা বুদ্ধদেব বসুকেও দেখি অর্থভেদে ওই দুই কি-কী লিখছেন তাঁর সূচনাপর্বের রচনাতেই।

ক্রিয়াপদের বানান লেখার বিষয়ে বুদ্ধদেব বরাবরই উচ্চারণকে মান্য করেছেন। একথা বললে বড়ো-কোনো ভুল হবে না বোধ হয় যে, সাধারণত কবিরা ক্রিয়াপদের বানানে কিছুটা উচ্চারণানুগ হতে পছন্দ করেন। সাধারণ বর্তমান, বর্তমান অনুজ্ঞা, সাধারণ অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেব শব্দান্তে ও-কার দিয়েছেন, আর তা দিয়েছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। উদাহৃত চার আর আট নম্বর উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ রয়েছে। এর আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পারি আমরা।

ফেলতো, ভুলতো, করতো, যেতো, গেলো,
খেলো, ছিলো (শেষ পাণ্ডুলিপি)
হ'লো, ছিলো, দাঁড়ালো, পারতো (ভূমিকা, কালিদাসের মেঘদূত)

গিয়েছিলো, হয়েছিলো, দেখবো, হ'লো
(রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য)
জমলো, গেলো, পারবো, লাগলো, গেলো
(আমার ছেলেবেলা)
পারলো, ছিলো, এসেছিলো, হ'লো, হ'তো
(মহাভারতের কথা)

কোনো-কোনো ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্বকমার প্রতি বুদ্ধদেবের পক্ষপাত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার নিয়ে দু-এক কথা বলতে হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখকজীবনের বেশির ভাগ সময়েই ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার ব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে এর কারণ উচ্চারণানুগতা। ক্রিয়াপদের শেষে ও-কারের প্রবণতা কবিদের একটা সাধারণ অভ্যাস এ-কথা আগেই বলেছি। শঙ্খ ঘোষের বিভিন্ন সময়ের লেখাতেও তা দেখতে পাই —

কিন্তু এই বৈপরীত্যের বুনন না থাকলে
শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় হতো না তাঁর কবিতা।
(নিঃশব্দের তর্জনী, ১৪০১)
ভিতরদিকের সূর্যমুখী এই চরিত্র হলো চিৎকারেরই
আরেক পিঠ —
(তদেব)
মাসিমার কাছে কারা এই অভিযোগ জানিয়েছে?
খেয়াল হলো তখন —
(অন্ধের স্পর্শের মতো, ২০০৭)

এখনকার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমিই বলি, কিংবা আনন্দবাজার পত্রিকাই বলি কিংবা সাহিত্য সংসদ — প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অনুজ্ঞা ছাড়া অন্য সমস্ত ক্রিয়াপদে ও-কার অনুচিত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। বুদ্ধদেব কোনোদিনই মানেননি এ সূত্র। আর এ-বিষয়ে তিনি মোটেই একা নন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বহু বহু রচনায় ক্রিয়াপদে ও-কার জ্বলজ্বল করছে।

বাংলা ভাষায় উচ্চারণানুগ বানান সর্বত্র সম্ভব নয়। তেমন বানান লেখা শুরু হলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে বই কমবে না। উচ্চারণানুগ বানান লেখার নীতি গ্রহণ করলে কেবল স্বরচিহ্নের বেলায় তা মানলে তো চলবে না, মানতে হবে ব্যঞ্জনচিহ্নের বেলাতেও। সম্ভব কি তা? উচিত কি তা? আমরা মনে করি, বানান সমতার স্বার্থে করত, করব, গেল, ছিল, যেত, বলব, হল, হত, এইরকম বানান লেখাই সংগত। তাতে উচ্চারণে বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তির কারণ নেই। নইলে, উচ্চারণানুগতার স্বার্থে হোতো, হোলো, কোরবো এমন বানানের দাবিও উঠবে।

এবারে ঊর্ধ্বকমার প্রসঙ্গ। বুদ্ধদেব লিখেছেন হ'য়ে, ক'রে, হ'তো, হ'লো ইত্যাদি। অথচ গেলো, করবো এসব শব্দে ঊর্ধ্বকমা নেই। কারণটা খুবই সহজ। যে শব্দে কোনো লুপ্ত স্বরের আভাস আছে, তাতে ঊর্ধ্বকমা দিয়ে সেই লুপ্ত স্বরটির অস্তিত্ব বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। হইতে > হ'তে, হইল >হ'ল; হইয়া > হ'য়ে ইত্যাদি। আবার বলব, এক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব একা

নন। স্বয়ং রাজশেখর বসু অনুরূপ বহু ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করেছেন—

ইনি জীর্ণ শাটীতে দেহ আবৃত ক'রে তাঁর তরুণী
ভার্যা ও বহু শিশুসন্তানদের নিয়ে .....
(বাল্মীকি-রামায়ণ। ১৯৪৬)

রামের রথ বহুদূর অতিক্রম ক'রে অন্যদেশে
উপস্থিত হ'লো।
(তদেব)

শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকলে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমার দরকার হতেও পারে। যেমন—

সে ওখানে কী করে?
তুমি কী ক'রে এলে?

এসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা ততটা দোষের নয়। যদিও বাক্য দেখলেই অর্থের তফাত করা যায়। আর তাছাড়া, লুপ্তস্বর বোঝাবার জন্যই যদি ঊর্ধ্বকমা দিতে হয়, তবে তো অনুরূপ সব ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত। রাজশেখর বা বুদ্ধদেব কেউই কিন্তু সরব, করব, মরব এসব শব্দে ঊর্ধ্বকমা দেননি। এসব শব্দেও তো লুপ্ত স্বর আছে—

সরিব> সরব, করিব > করব, মরিব >মরব। তাই ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার যত কম হবে ভাষায় জটিলতাও ততই কমবে। আবার বলি, শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকলে তবেই ঊর্ধ্বকমা দেওয়া যেতে পারে। সেসব অতীব সীমিত ক্ষেত্রে।

চার

বিদেশি শব্দের বানান লেখার সময়েও বুদ্ধদেব মোটামুটিভাবে উচ্চারণানুগতার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কোথাও আমাদের উচ্চারণের প্রবণতাকে মান্য করেছেন — যেমন গ্লাশ, শাদা, তামাশা, মজলিশ। আবার কোথাও বিদেশি শব্দের বিদেশি উচ্চারণ মেনেছেন— যেমন স্পীডোমিটার, য়োরোপ, জর্মনি,স্টর্জ মূঅর (১৩৪৬ এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে)। কিন্তু বিদেশি শব্দের বানান লেখায় বুদ্ধদেব সারাজীবন সুস্থির কোনো নীতি নিতে পারেননি। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বে তাঁকে আমরা ট্র্যাম, ট্রেইন, চেইন লিখতে দেখেছি। পরে তাঁর নিশ্চয় মনে হয়েছে এই শব্দগুলো বস্তুতপক্ষে বিদেশি শব্দ নয়, বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে ওগুলো। পরে তাই তাঁকে লিখতে দেখি ট্রাম, ট্রেন, চেন। তবে লাতিন বা গ্রিক নাম বা শব্দ লেখার বেলায় বুদ্ধদেবের দ্বিধা ছিল সারাজীবন। যে-দ্বিধায় আক্রান্ত হই আমরা সকলেই।

যদি ট্যাসিটাস-কে তাকিতুস (Tacitus) আর সক্রেটিসকে সোক্রাতেস লিখতে হয়, তবে সেই একই কারণে ফ্লোরেন্সকে ফিয়েরেন্ৎসে, ভেনিসকে ভেনেৎসিয়া লিখতে হয়। মিলানকে লিখতে হয় মিলানো, নেপেলিয়নকে লিখতে হয় নাপলেয়ঁ। কতকগুলো ক্ষেত্রে বিদেশি উচ্চারণ অনুসরণ করে বানান লিখব, আর কতকগুলো ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতিতে লিখব, এর মধ্যে একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বৈত রীতি আছে। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, এই দ্বৈত রীতি একরকম অপ্রতিরোধ্য। বুদ্ধদেবের মধ্যেও এ-নিয়ে ছিল দ্বিধা ও সংশয়। ১৯৬৭ সালে

প্রকাশিত হল নাটক 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ'। ১৯৭৪ এ 'মহাভারতের কথা-য় এই নাম বদলে গিয়ে দাঁড়াল এলেক্‌ত্রা। অন্যত্রও অসুবিধায় পড়তে দেখি তাঁকে। 'মহাভারতের কথা'র ভূমিকায় লিখেছেন —

> সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ
> ছিলো তুলনামূলক ইন্দো-য়োরোপীয় এপিক —
> একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্য দিকে
> মহাভারত ও রামায়ণ।

যদি সফ্‌ট কনসোন্যান্ট বলে অদিসি লিখতে হয়, তবে তো ইলিয়াদ আর ঈনীদও লিখতে হয়। অর্থাৎ এইরকম বহু ক্ষেত্রেই একটা সুনির্দিষ্ট বিধি মেনে চলা বড়োই কঠিন। এমনকী, বুদ্ধদেবের মতো ভাষাসচেতন ধীমান লেখকও পারেননি তা।

পাঁচ

একাধিক শব্দকে হাইফেন দিয়ে জুড়ে একটি শব্দ তৈরি বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। হাইফেন কোনো লেখক উদারভাবে ব্যবহার করেন, কোনো লেখক আবার হাইফেন ব্যবহারে কিছুটা যেন কুণ্ঠিত। বর্তমান লেখকের মতে হাইফেনের ব্যবহারে ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাস বিশেষ সক্রিয় হলেও হাইফেন যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনসাধক চিহ্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসু হাইফেন বোধহয় একটু বেশিই ব্যবহার করেছেন, অন্তত তাঁর পরিণত বয়সের লেখালেখিতে। হাইফেনের নানাবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে বুদ্ধদেবের লেখায়। আমরা তার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি প্রয়োগ এখানে দেখে নেব।

প্রথমত, দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে একটি বিশেষ্যবাচক শব্দ তৈরিতে হাইফেন —

১. আধ-পেটা-খাওয়া, মাইনে-না-দিয়ে-স্কুলের-নাম-কাটানো,
(শেষ পাণ্ডুলিপি, পৃ ৭১)

২. দুই বা তার বেশি শব্দ জুড়ে একটি বিশেষণবাচক শব্দ তৈরি করতে হাইফেন —
নয়ন-মন-ডোবানো (সব-পেয়েছির দেশে)
দম-বন্ধ-করা, ছেঁড়া-কাপড়-পরা (শেষ পাণ্ডুলিপি)
শুয়ে-থাকা প্রণয়ীযুগল (শেষ পাণ্ডুলিপি)

৩. একই শব্দের পুনরুক্তির ফলে যদি একটিই শব্দ তৈরি হয়—
মনে-মনে, কোটি-কোটি, লক্ষ-লক্ষ, নিতে-নিতে, আস্তে-আস্তে, (শেষ পাণ্ডুলিপি)
ধীরে-ধীরে, কোনো-কোনো (মহাভারতের কথা)

এ-ছাড়া কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, দেখতে-দেখতে, চলতে-চলতে, যেখানে-সেখানে এরকম অজস্র হাইফেন-যুক্ত শব্দ তাঁর রচনায় যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে।

৪. সর্বনামীয় বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য বা সর্বনামকে জুড়তে হাইফেন বুদ্ধদেব বসু অজস্রবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এগুলো পাওয়া যায়,—

যে-কেউ, যা-কিছু,যে-অবসর, এ-দেশে, সে-ভাষা, এ-ধরণের,যে-সব, আর-কেউ, এ-যুগে, এ-দুটো ইত্যাদি।

৫. ক্রিয়াপদকে নঞর্থক করতে তিনি অনেকসময় 'না' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়াকে জুড়েছেন হাইফেন দিয়ে—

না-লিখে উপায় নেই, না-পারাই স্বাভাবিক,না-ভেবে পারি না।

এইসব ক্ষেত্রে হাইফেন অনেকেই দেন না। কিন্তু ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ক্ষেত্রগুলিতে হাইফেনের ব্যবহার অযৌক্তিক নয়, বরং অনেকসময় তাতে বাক্যে ঋজুতা আসে, অর্থবোধ সুগম হয়। তবে অস্বীকার করা যায় না যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব হাইফেন দিয়েছেন অকারণে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

প্রাণ-রস (সব-পেয়েছির দেশে)

নিয়ম-মতো (শেষ পাণ্ডুলিপি)

প্রাণরস আর নিয়মমতো লেখাই সংগত হত।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বাঙালি লেখকরা অনেকদিন ধরেই কতকগুলি শব্দের নতুন বানান লিখছেন। সেইসব বানান সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মেনেও নিয়েছে। তার মধ্যে আছে— কখনো, কোনো, মতো, ভালো, বড়ো, ছোটো। তবে এখনো, তখনো, আরো, কারো সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারছেন না। বাংলা আকাদেমি এগুলো এখনও পর্যন্ত মেনে নেয়নি। এ-ধরনের সমস্ত শব্দেই বুদ্ধদেব ও-কার দিয়েছেন।

বুদ্ধদেবের তালব্য-শ -এর প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাতের কথা কারও অজানা নয়। তিনি মজলিশ, ফর্শা, বালিশ, খশড়া, তোশক, তামাশা, গ্লাশ তো লেখেনই, এমনকী শাদা-ও লিখতে কসুর করেননি তিনি। তাহলে সংগতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, কেন শাহেব, শাবান লেখা হবে না? আমরা কি শাঁড় (ষাঁড়), মাশি (মাসি), মোশ (মোষ) লিখতে পারব? পারব কি এভাবে এসব শব্দের চেহারা বদলে দিতে? উচিত হবে কি তা?

বানান-বিষয়ে যিনি এতটাই মনস্ক ও আধুনিক তাঁকেই আবার কিছু শব্দের পুরোনো ও প্রায় পরিত্যক্ত রূপ লিখতে দেখি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন —

তফাৎ, শহীদ, উল্টো, হাৎড়ে-হাৎড়ে গুণ্ডা।

এ-ছাড়া লিখেছেন অধুনা-বর্জিত কাহিনী, ব্যবসা, বৌ। এগুলো নিয়ে আমরা মনখারাপ করব না। কিন্তু দুঃখ পাই যখন দেখি তিনি মেনিয়া-কে ম্যানিয়া (mania), মনোমেনিয়া-কে মনোম্যানিয়া(monomania) আর সাইকায়াট্রি-কে (psychiatry) সাইকিয়াট্রি লেখেন। (দ্র কলকাতার ইলেক্‌ট্রা, ১৯৬৭, পৃ ৪৭)। তাঁর মতো বিদ্বান ও মনস্ক লেখকের এই স্খলন আমাদের পীড়িত করে, ব্যথিত করে।

সাত

যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের সাহিত্যিক-জীবনে কতকগুলি পর্যায় থাকতে বাধ্য। ভাষা ব্যবহারে পর্যায় থেকে পর্যায়ে কতকগুলি পরিবর্তন হওয়াও স্বাভাবিক। সেইরকম পরিবর্তন ছিল বুদ্ধদেবের বানাননীতিতেও। তাঁর 'সাড়া' উপন্যাসে বা 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে আমরা কিছু

পুরোনো বানান দেখেছি। বাড়ী, মজলিস, ইংলণ্ড থেকে ক্রমে বাড়ি, মজলিশ, ইংল্যান্ড হয়েছে। তবে য়োরোপ, ওয়ার্ডস্বার্থ, গ্রীক বানান তিনি তেমন বদলাননি। খৃষ্টান পরে হয়েছে খ্রিষ্টান (মহাভারতের কথা), উপলক্ষ হয়েছে উপলক্ষ্য। পাশ্চাত্য-র চেয়ে পাশ্চাত্ত্যকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরিশেষে যে-কথাটা না বললেই নয়, তা এই যে, Z ধ্বনির জন্য জ-এর নীচে বিন্দু দিয়ে জ় লেখার প্রচলন বুদ্ধদেবই করেন। আজ মোটামুটিভাবে তা সর্বস্বীকৃত হয়েছে। Advertise- কে আজ অবলীলায় অ্যাডভার্টাইজ় লিখি, blazer কে লিখি ব্লেজ়ার। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে measure শব্দের জন্য জ-এর নীচে দুটো বিন্দু দিচ্ছি আমরা, অন্তত অভিধানে তা মান্যতা পেয়েছে। এই সাহস তো বুদ্ধদেবই জুগিয়েছেন আমাদের। তাঁর কিছু বানান এখন মানা হয় না এ-কথা ঠিক। তবু বাংলা ভাষার বানানের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টান্ত অনুপেক্ষণীয়।

অরুণ মিত্র এবং কবিতার গদ্যভাষা

অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'প্রান্তরেখা', প্রকাশকাল, ১৩৫০। তার দুটি কবিতা 'হে হৃদয়', আর 'দোটানা'। 'হে হৃদয়' কবিতার কয়েকটা পঙ্‌ক্তি দেখব আমরা—

আমার কুঠুরী পরে এক টুক্‌রা নীলে
আহ্নিক চক্রান্ত চলে। দিবসের চাঁদে
নিশান্তে তারার সুর কখনো বা কাঁদে;
রথচক্র-রেশ লাগে মেঘের মিছিলে
তারপর; কল্পনায় হৃদয়ের মিলে
খুশী হয় হৈম দিন; সমূহ প্রমাদে
ক্ষণিকে বিস্রস্ত ঝরে জলশূন্য ছাদে।
অরক্ষিত ছায়াপথ ভরে তিলে তিলে।

এই কবিতায় পদ্যছন্দের দোলা খুবই স্পষ্ট। মিলের প্যাটার্নও পরিষ্কার। এবারে দেখব 'দোটানা' কবিতার কয়েকটা পঙ্‌ক্তি—

ঘৃণিত পতন আছে আশেপাশে যোজন-গভীরে,
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি,
দ্বিখণ্ডিত রশ্মি হায় নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

বঞ্চিত সে-দ্বিপ্রহর পুড়ে পুড়ে হয়েছে কি খাঁটি?
দীর্ঘশ্বাসে তীক্ষ্ণ ধার, কলঙ্ক পড়েছে সাদা চাঁদে;
ঊর্ধ্বরেখা হ্রস্বতর, হ্রস্বতর মনের কথাটি।

অরুণ মিত্রের এই দুটি কবিতা বেছে নিয়েছি এটাই দেখবার জন্য এবং দেখাবার জন্য যে, যে-কবি পরবর্তী সময়ে পদ্যছন্দ ও অন্ত্যমিল প্রায় বলতে গেলে পরিহারই করলেন, তিনি শুধু যে পদ্যছন্দ আর অন্ত্যমিলকে শিরোধার্য করেই যাত্রা শুরু করেছিলেন তা নয়, কিছুদূর পর্যন্ত ও-দুটিকে বর্জন করার কথা ভাবেননি। অথচ কে-না জানে অরুণ মিত্রের নাম অভ্রান্তভাবে এবং অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেছে গদ্যকবিতার সঙ্গে, এবং কখনো-কখনো 'গদ্যের ভাষায়' কবিতা-রচনার সঙ্গে।

দুই

এখানে স্মরণ করি, ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে কবিতা রচনার কথা বলেছিলেন। দেখা যাক কী বলেছিলেন তিনি— 'এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সংগত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কবিতা নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী।'

অরুণ মিত্রের সমসাময়িক কবিদের কেউ-কেউ গদ্যে কবিতা লিখেছেন একথা ঠিক। এখানে অনেকেরই মনে পড়বে সমর সেনের নাম। সমর সেন বেশকিছু গদ্যকবিতা লিখেছেন একথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু অরুণ মিত্র তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে'-র সময় থেকেই যে-ধরনের গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন তেমন টানা গদ্যে কবিতা আর কেই-বা লিখেছেন এমন? আমরা তাকাব তাঁর

'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' শীর্ষক কবিতাটির দিকে—

> আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার/ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের/চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা/কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায়/সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার।

এই কবিতায় তো তবু দাঁড়ি-কমার মতো বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেছেন কবি। এমন কবিতাও তো লিখেছেন তিনি, যেখানে বিরামচিহ্ন আদপেই নেই, যেমন 'প্রথম পলি শেষ পাথর' কাব্যের 'বিকেলবেলায়' কবিতায়—

> বিকেলবেলায় ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে বাচ্চাদের এপার ওপার দৌড়ো-/দৌড়ি মাঠটায় আবিরের ছোপ ধরলে ঘাসের ওপর থেকে লাফ দিয়ে লাফ/ দিয়ে আকাশে উঠে লাল নীল হলদে সবুজ বেলুনে উড়তে উড়তে উড়তে/ হঠাৎ থির আর ওড়া যায় না টানছে ভাঙা টিনের চালা খুদকুঁড়ো ব্যস/ নামো নামো খিদে পেয়েছে মা'রা এতক্ষণে ডোবা থেকে ফিরেছে নামো।।

তিন

এভাবে কবিতাকে গদ্যভাষার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে আসা অরুণ মিত্রের কবিতার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিরামচিহ্নহীন এই পঙ্‌ক্তিগুলো যে কবিতাই তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। বরং এখানে বিরামচিহ্নের ব্যাঘাত না থাকায় প্রবহমাণতা ক্ষুণ্ণ হয়নি একেবারেই। কিন্তু এখানে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যে-শৈলী তাঁর সমসাময়িক কবিরা সাধারণভাবে গ্রহণ করলেন না, অরুণ মিত্র কেন তাকে এভাবে আত্মস্থ করলেন? তাঁর

কবিতার এই গদ্যভাষা নির্মাণে তিনি যে সর্বৈব সফল, তাঁর সিদ্ধি যে প্রশ্নাতীত তা মেনে নিতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকেই যায়, কেন তিনি এই পথে এগোলেন?

অরুণ মিত্রের কাব্যভাষা বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন, তাও এখানে স্মরণ করতে চাই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অরুণ মিত্রের কবিতার গদ্যভাষার সিদ্ধির একটা বড়ো কারণ তাঁর কবিতায় আটপৌরে শব্দের ব্যবহার। কবিতায় আটপৌরে শব্দের ব্যবহার অন্য কোনো-কোনো কবিও করেছেন। কাজেই এতে অরুণ মিত্রের অনন্যতার প্রমাণ মেলে না। তবে অরুণ মিত্র যে-ধরনের গদ্যকবিতার শৈলী নির্মাণ করেছেন, তাতে আটপৌরে শব্দের প্রয়োগ সংগত ও স্বাভাবিক, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না।

'কাব্যে আধুনিকতা কী?' এই নামের একটি নিবন্ধে অরুণ মিত্র 'গদ্যপদ্যের বিভেদ' নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন। এই নিবন্ধে গদ্যপদ্যের বিভেদ সম্বন্ধে তিনি তাঁর ভাবনার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন আর, সেই কথাগুলোর মধ্যে আমরা তাঁর গদ্যকবিতার 'গদ্যভাষা'র চাবিকাঠি পেয়ে যাই। তিনি বলেছেন—'অনুভব এবং কল্পনাকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করা যদি আমার মূল লক্ষ্য হয় তাহলে শব্দের একটা বিশেষ বহিরঙ্গ বিন্যাস আমার পক্ষে আবশ্যিক হবে কেন? এমন গদ্যরচনা তো আছে যা পড়লে আমরা কবিতাপাঠের মতো অভিভূত হই, যেহেতু তাতে কবিতার ধর্মই প্রধান। কল্পনা ও অনুভবশক্তি হল কাব্যের প্রেরণাদাতা, এবং কাব্যের আঙ্গিক কবির ভাবনাকে চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলে। ব্যাকরণগত গদ্যের বাহনে তা প্রকাশ করলেও তা নিশ্চয়ই কবিতাই হবে।' ('কাব্যে আধুনিকতা কী'? দ্র জীবনের রঙে, ১৯৯৯ পৃ. ৮০)।

এখানে তাহলে তাঁর কবিতার গদ্যভাষা সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ত পেয়ে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু কেবল এটাই একমাত্র বিষয় নয়। অন্য প্রভাবও এর পিছনে থাকা সম্ভব। তারই খোঁজ করব এবার। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে সুজিত সরকার সম্পাদিত 'কবিকৃতি' পত্রিকায় অরুণ মিত্রের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে অরুণ মিত্র এমন কিছু কথা বলেছেন যা তাঁর টানা গদ্যে লেখা কবিতার পশ্চাৎপট বুঝতে বিশেষ সাহায্য করে। কথাগুলো তাঁর জবানিতেই শোনা যাক—

'ফরাসি কবিদের কাছ থেকে দুটো শিক্ষা নিয়েছি আমি। একটা হল, কবিতার কোনো ধরাবাঁধা ফর্ম নেই। আমার আত্মপ্রকাশই প্রধান কথা—গদ্য-পদ্য যাইই হোক না কেন, আমি কোনো ছকের মধ্যে বাঁধা থাকব না। তার ফলে ওদের গদ্যশৈলীকে আমি অনায়াসে ব্যবহার করতে পেরেছি। ছন্দে লিখলে যা পারতাম না, তা পেরেছি এইসব পড়াশোনার ফলেই।'

দ্বিতীয় শিক্ষাটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় বলে উল্লেখ করছি না। অরুণ মিত্র এই শিক্ষাটা রীতিমতো আত্মস্থ করেছিলেন। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা তিনি ছিলেন আদ্যন্ত সঞ্জীবিত। কাজেই তাঁর গদ্যভাষা যে ফরাসি প্রভাবচিহ্নিত তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তিনি বহুবার একথা নানা সূত্রে বলেছেন যে, ছন্দমিলই কবিতার প্রাণ নয়। গদ্যে রচিত কবিতায় যদি ব্যঞ্জনা থাকে, তবেই তা কবিতা, ছন্দমিল ব্যতিরেকেই কবিতা। 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

(১৯৮৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যাত্রাশুরু চলা' কবিতাটির প্রথম স্তবকটি দেখে নেব এবার।

> যাত্রাশুরু চলা—অক্ষরের ভিতর এত রক্তপাত ফুটফুট শিশির এত তাত/বাড়ন্ত ছায়া আকাশভরতি পাখি, হঠাৎ খোলা দরজা চৌকাঠের/ ফ্রেমে তোমার ছবি।

এই টানা গদ্যে লেখা কবিতাটিকে আমরা প্রথাগত পদ্যের মাপে আনতেই পারি, এইভাবে—

যাত্রাশুরু চলা—
অক্ষরের ভিতরে এত রক্তপাত
ফুটফুট শিশির এত তাত
বাড়ন্ত ছায়া আকাশ-ভরতি পাখি,
হঠাৎ খোলা দরজা
চৌকাঠের ফ্রেমে তোমার ছবি।

আমরা বলতে বাধ্য যে, টানা গদ্যে লাইনগুলোর মধ্যে যে-প্রবহমাণতার সঞ্চার সম্ভব হয়েছে, পদ্যছন্দে তা নেই। টানা গদ্যের ওই লাইনগুলোতে পদ্যছন্দ নেই বটে, তবে ছন্দ আছে নিশ্চয়, তা হল ভাবছন্দ, যাকে কবি পদ্যছন্দের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কাম্য বলে ভাবতেন। এবারে আরও একটা কথা বলার আছে। 'প্রথম পলি শেষ পাথর' কাব্যে 'পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। তাতে যেমন আছে পদ্যছন্দে লেখা অংশ, তেমনি টানা গদ্যে লেখা অংশও আছে। আমরা স্পষ্ট লক্ষ করি যে, পদ্যছন্দে লেখা অংশে কবির শব্দপ্রয়োগে যে পারিপাট্য আছে তা গদ্যে লেখা অংশে তত নেই। সেখানে বরং খোলামেলা আটপৌরে শব্দই বেশি। টানা গদ্যে লেখা কবিতার পক্ষে সেটাই মানানসই বলে মনে হয়। পাশাপাশি একই কবিতার দুটো অংশ দেখা যাক—

নয়ানজুলি ছাড়িয়ে গেল ভাঙন
পায়ের দাগে ক্রমেই মাটি খসায়,
কতই বা দূর জলঘূর্ণির লগন,
তোমার জাগা তেরাত্তিরের বাসায়।

এবারে একই কবিতার গদ্য অংশ—

> তোমার সঙ্গে দেখা হল। কই দেখা হল? আমাদের মুখ আমরা দেখতে/পেলাম না। চকচকে কাঁচে, চামড়ার জেল্লায় চোখ কেবলই পিছলে পায়ে/পায়ে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে এদিক যেমন লঙ্কা নাচে কিংবা/জন্তুর সামনে হটে স'রে ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ খোড়লে/ নামছে ওদিকটা কী কে জানে।...

এ-দুটি অংশের ভাষার তফাত কোনো পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। সে-তফাত স্বতঃপ্রকাশ। অন্য কবিরাও যে এই শৈলী গ্রহণ করেছেন তা নয়। তবে অরুণ মিত্রের কবিতার এই রীতি বা শৈলীও যে ফরাসি কবিতা থেকে আহৃত তা অনুমান করাও শক্ত নয়। 'প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য' প্রসঙ্গে তিনি যে-কথাগুলো বলেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। 'ফরাসি সাহিত্যের মতো অতিসভ্য সাহিত্যে পনেরো বছর আগে যেরকম লেখা হত এবং এখন যেরকম লেখা হয় তার মধ্যে পার্থক্য এতখানি যে একটা পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই লেখার তারিখ বোঝা যায়। .... লিখন-পদ্ধতির রূপান্তর হয়েছে এই রকম : লেখ্যভাষা থেকে শিথিলতা চিরাচরণ, ঘুরিয়ে কথা কওয়া (আমার বলতে লোভ হয় আগেকার ভাষার ভব্যতা) বাদ দেওয়া হয়েছে, পুরনো অলঙ্কার কাটছাঁট হয়েছে, চিন্তা বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শব্দগুলো আরো সোজাসুজি প্রয়োগ করা হয়েছে। ..... লিখন এখন আর পোশাক নয়, গায়ের চামড়া' (জীবনের রঙে, ১৯৯৯, পৃ. ৮৫)।

এই উদ্ধৃতিটি কিছুটা দীর্ঘ বটে। তবে অরুণ মিত্রের ছিমছাম, নির্মেদ শব্দপ্রয়োগের পশ্চাৎপটটি ভালোই তুলে ধরে। সেই কারণে এই উদ্ধৃতিটি নিশ্চয় পাঠকের পক্ষে অসহ হবে না।



বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ